জাগ গান

সুখবিলাস বর্মা

পরিবেশক
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

Jag Gan : Religeous, Sociological and musical analysis of Jag Gan, an ancient form of folksong of North Bengal by Sukhbilas Barma.

প্রকাশক

পরিতোষ দত্ত

আব্বাসউদ্দীন স্মরণ সমিতির পক্ষে

৪০, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ)

ফ্ল্যাট নম্বর ৩

কলকাতা-৭০০ ০৩১

মুদ্রক

লেটার সেটার

১০, বৃন্দাবন বোস লেন

কলকাতা ৭০০ ০০৬

চিত্রাঙ্কন :

উৎসর্গ

জাগ গান ও অন্যান্য পালাগানের
একনিষ্ঠ সাধক ও গিদাল
স্বর্গীয় কেশব বর্মনকে

প্রাক্‌কথন

'জাগ' অর্থাৎ জাগরণ-গান যে-বিশেষ উপলক্ষে উত্তর বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষেরা গেয়ে থাকেন, সেটি স্থানীয় একটা ধর্মাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও, সমস্ত ব্যাপারটির সঙ্গে জড়িয়ে আছে ওই বিশাল এলাকার আর্থ-সামাজিক কিছু অনুষঙ্গ ও। যে মদনকামপূজার সূত্রে জাগ-গানের প্রচলন, সেটি মদন বা প্রেমের দেবতার উপাসনা বলে গৃহীত হলেও, বস্তুত অতি প্রাচীন কয়েকটি ধর্মসংস্কারের সমন্বিত-বিবর্তন হিসেবেই বুঝতে হবে তাকে।

মদনদেবতাকে ওই অনুষ্ঠানে যে বাঁশের প্রতীকে পূজা করা হয়, এটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর কারণ ওই বাঁশপূজার মাধ্যমে আদিম বৃক্ষোপাসনা, যৌনপ্রতীক অর্চনা, অশুভ অলৌকিক শক্তিকে প্রতিরোধ করা এবং রোগব্যাধি দূর করা ইত্যাদি অনেক কিছু সংস্কারেরই সমাপতন ঘটেছে বলে মনে করা যেতে পারে। পূর্ব-হিমালয়ের দক্ষিণে যে-পাহাড়ী অঞ্চল বহুশত মাইল ধরে বিস্তৃত হয়ে আছে, সেখানে অজস্র প্রজাতির বাঁশ জন্মায়, যা ওইসব এলাকার অধিবাসীদের জীবিকা এবং অর্থনৈতিক-পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গেও ওতঃপ্রোতভাবেই জড়িয়ে আছে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব না-থাকলে, প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও ধর্মীয় বিশ্বাস বা সংস্কার কিংবা আচারই গড়ে যে উঠতে পারেনা, সেই গুরুত্বপূর্ণ কথাটিও এখানে কিন্তু অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা যত ধরনের বা প্রজাতির বাঁশের সন্ধান পেয়েছেন, তার একটা বড় অংশই ঐ এলাকায় পাওয়া যায়। প্রায় দেড়শ বছর আগেই স্যার জোসেফ ডি. হুকার তাঁর 'হিমালয়ান জার্নাল : নোটস অব এ ন্যাচারালিস্ট'-এর মধ্যে (১৮৪৭-১৮৫৪) পূর্ব-হিমালয়ের দক্ষিণাঞ্চলে অন্তত বারোটি প্রজাতির বাঁশের উল্লেখ করেছেন—সমতলের ৪,০০০ ফিট ওপর থেকে শুরু করে ১২,০০০ ফিট উচ্চতার মধ্যে। 'পাও', 'পাইয়ং', 'প্রেয়ং' প্রভৃতি নানান্ নামে এগুলি লেপচা-প্রমুখ অধিজাতিদের কাছে পরিচিত। বাড়ি তৈরি, সংসারের তৈজসপত্র বানানো, কচি বাঁশের কোঁড়ার তরকারি রেঁধে খাওয়া-ইত্যাদি হাজারো-ভাবে বাঁশের ব্যবহার করেন তাঁরা এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর মানুষজন ও (পৃঃ ১০৭-১০৯) জলপাইগুড়ির গ্রামাঞ্চলের বহু মানুষই বাঁশের দেওয়াল গড়ে এবং বাঁশ পাতার ছাউনি দিয়ে ঘর তৈরি করেন। বড় মাপের বাঁশের পার কেটে জলের পাত্র বানানো, চৌকির মতো বাঁশের 'মাচাং' বানিয়ে ঘর-এ রাখা, বাঁশের বীজ-শিকড় ইত্যাদি দিয়ে উগ্র পানীয় প্রস্তুত করা ইত্যাদি অজস্র ব্যাপার সেখানে অত্যন্ত প্রচলিত। কোচবিহার জেলাতেও বাঁশের ব্যবহার সমানভাবে প্রচলিত। ১৮৮৩ সালে প্রকাশিত, ভগবতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'কোচবিহারের ইতিহাস' বইতে এ সম্পর্কে চমৎকার কিছু

তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, "বাঁশবাগান এদেশীয় প্রজার বিলক্ষণ আয়ের সম্পত্তি। বাঁশ কোচবিহারবাসিগণের বহুল প্রয়োজন সাধন করে। বাড়ী-ঘর, শয়নের খাট, বসিবার চৌকি, দ্রব্যাদি বহনের টুকরি, বিছানার দরমা, তৈল ও অন্যান্য জলীয় বস্তু রাখিবার ভাণ্ড, পাকের কাষ্ঠ ও যষ্ঠি, একমাত্র বাঁশের সাহাযেই প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখানকার মাকলা বাঁশের প্রধান গুণ এই যে তাহাতে ঘুণ ধরেনা। ... অন্যান্য প্রকার বাঁশও এখানে পাওয়া যায়। মফস্বলে মাকলা বাঁশ গড়ে শতকরা তিনটাকা এবং রাজধানীতে ৫৷৷ হইতে ৬্ দরে বিক্রয় হয়।" (পৃঃ ১০)

বাঁশ দিয়ে ঘর তৈরি সে আমলে প্রচলিত ছিল। বকতিয়ার খিলজীকে ঘিরে ধরেছিল কামরূপের সৈন্যরা। তারা বাঁশ কেটে চোখা করে গেড়ে দেয় চারদিকে-ফলে ঘোড়ার পিঠে চড়েও বকতিয়ারেরা নিস্তার পাননি-একেবারে শেষ হয়ে যান-পরাস্ত হন এবং পালিয়ে যান।

ভিয়েৎনামের লড়াইতেও এই বাঁশ কেটে চোলা করে ইয়াঙ্কিদের পথ আটকিয়েছে সংগ্রামী ভিয়েতনামীরা। বঁশের উপর কাপড় টাঙ্গানো সমতল থেকে পাহাড়ে নানান সামাজিক ব্যবস্থায় দেখা যায়। রাভা, মেচ, বোড়ো, লেপচা, খামতি, মিংতো, খাসি, নাগা, মিজো এবং সিকিম-পশ্চিম বাংলার উত্তরাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির অধিবাসীদের মধ্যে বাঁশের এইভাবেই বহু বিচিত্র ব্যবহার ওই বিশাল এলাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে বিরাট একটি অভিঘাতের সৃষ্টি করে আসছে সুপ্রাচীন কাল থেকেই। কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি, এই দুই জেলার রাজবংশী সমাজের আর্থ-সাংস্কৃতিক জীবনে বাঁশের গুরুত্ব স্বভাবতই অপরিসীম। বড় বাঁশ, মাক্‌লা, নল, ঝাঁড়, বিরু, জাউটা, চকোয়া (বা ককেয়া) কীচ মুলি-প্রভৃতি নানা প্রজাতির বাঁশ তাঁদের নিত্য দিনের কাজের উপকরণ। বড় বাঁশের কোঁড়া দিয়ে হাঁসের মাংস রেঁধে খাওয়া ওই অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়। এর স্থায়িত্ব দীর্ঘকালীন বলে ঘরের খুঁটি গাড়া কিংবা ফালা কেটে ছ্যাঁচাবেড়া বানানো ওখানে ব্যাপকভাবে প্রচলিত। মাকলা বাঁশেরও ছ্যাঁচাবেড়া এবং 'কাইম' (বা ঘরের দেয়াল এবং ছাদের বাতা) তৈরি হয় বহুক্ষেত্রে। এটাও বেশ শক্তপোক্ত বাঁশ। নলবাঁশে ছাতার বাঁট, ঘন গিঁটওয়ালা জাউটা বাঁশে লাঠি, ককেয়া (বা চকোয়া) বাঁশ খুব মোটা হয় বলে তার পাব্ ধরে-ধরে কেটে চোষা বানিয়ে জলপাত্র, তেলের পাত্র ইত্যাদি তৈরি করা স্থানীয়ভাবে এক ধরনের কুটিরশিল্পই বলা যেতে পারে। বাণেশ্বরের মন্দিরের কাছে গদাধর নদীর পাশে ঝিক্ (অর্থাৎ পাব্) ভর্তি কাঁটাওয়ালা বিরু বাঁশ দিয়ে বাড়ির উঠোনের বেড়া দেওয়ার রীতি ওখানে আছে। মুলি বাঁশের তৈরি বেড়াও যার অন্যনাম ওখানে ('চেকার') চলন যথেষ্ট। কফি কীচক বাঁশের ব্যবহারও নানাবিধ। আর বাড়ির পিছনে ঝাড়বাঁশ লাগিয়ে শুধু আব্রুরক্ষাই নয়, ঘরেরও সৌন্দর্যবিধান

করা হয়। এই প্রসঙ্গে, ওই এলাকায় চালু একটি ছিল্‌কা' (অর্থাৎ লৌকিক ছড়া) স্মরণযোগ্য :

"উত্তরে বাঁশ,
দক্ষিণে হাঁস,
পশ্চিমে গুয়া,
পুবে ধুয়া।"

অর্থাৎ কি-না, উত্তরের বাঁশ ঝাড় একই সঙ্গে বাড়ির অন্দরমহলের আব্রু রাখবে, শীতের হাওয়া (ওরফে 'দুন' বা ঝড়ের ঝাপ্‌টা) ঠেকাবে এবং বাড়ির বাহার বাড়াবে ; দক্ষিণের দিকে থাকবে পুকুর, সেখানে পোষা হাঁস সাঁতরাবে গরমের দিনে, আসবে ঠান্ডা হাওয়া, পশ্চিমের সুপুরি (গুয়া) গাছের সারি পড়ন্ত রোদ ঝড় আটকাবে এবং পূর্বে থাকবে চায়ের জমি বা 'ধুয়া'।

সমগ্র অঞ্চলের মানুষের জীবনচর্যার নানা পর্যায়েই বাঁশের প্রয়োজনীয়তা যে কতখানি ব্যাপক, সেটা ওখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং জনজীবনের সঙ্গে পরিচিত মানুষেরা সবাই জানেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ওখানে বাঁশ তাঁদের ধর্মবিশ্বাস ও আচার-সংস্কারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। মদনকাম উৎসব এবং তারই অনুষঙ্গ হিশেবে জাগ গানেরও প্রচলন সেই সূত্রেই ঘটেছে সুদীর্ঘকালব্যাপ্ত কিছু বিশ্বাস, কিছু সংস্কারের ধারাবাহী হয়ে। মদনকাম দেবতাকে জলপাইগুড়ি-কোচবিহারে বাঁশের প্রতীকে পূজা করা হয় যে, তার তাৎপর্যটুকুও এখানে বলে নেওয়া উচিত সম্ভবত। সমাজ-মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে গাছ, বাঁশ, পর্বতচূড়া, স্তম্ভ বা ওই-রকমের সমুন্নত, সটান খাড়া কোনও কিছুকে আদিম মানুষেরা পুরুষত্বের প্রতীক বলে ভেবেছিলেন, এবং সেই ভাবনা ছিল বিশ্বজনীন। ঠিক একইভাবে গুহা, গহ্বর, হ্রদ, নদী ইত্যাদি গভীরত্ব সম্পন্ন যত কিছু জিনিস, তাঁদের কাছে প্রতীতি পেয়েছে নারীত্বসূচক প্রতীক রূপে। সুতরাং সেই অনুসূত্রেই, মদনও (অর্থাৎ, কামনার দেবতা) এ-অঞ্চলে বাঁশের মাধ্যমে উপাস্য হয়ে উঠেছেন। মদনকামপূজাও আসলে সুপ্রাচীন যৌনোৎসব পালনের বিশ্বজনীন ধারা অনুসরণ করেই গড়ে উঠেছে।

এ ধরনের উৎসবই হলো 'হোলি'। পরবর্তীকালে তার উপর বৈষ্ণবীয় ধর্মানুষঙ্গ আরোপিত হয়েছে। অন্তত ষোড়শ কিংবা শপ্তদশ শতকের আগে উত্তর ভারতের নানা অংশে বসন্তকালে মদন বা কামদেবতাকে উপলক্ষ করে এক ধরনের যৌনতাভিত্তিক উৎসব পালন করা হতো এবং সেটাই কালক্রমে হোলি-উৎসবে বিবর্তিত হয়েছে বলে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস' (১৯৫০) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন", প্রচুর নৃত্যগীতবাদ্য, জুগুপ্সিত উক্তি, যৌন অঙ্গভঙ্গি বা ব্যঞ্জনা প্রভৃতি ছিল এই উৎসবের অঙ্গ এবং পূজাটি হইত মদন ও রতির। ...মনে হয় ষোড়শ শতকের পর

কোন সময়ে চৈত্রীয় বসন্ত বা মদন বা কামোৎসব ফাল্গু হোলা বা হোলি উৎসবের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া যায়।"

উত্তর বঙ্গের মদনকাম উৎসব স্পষ্টতই হোলির প্রত্নপ্রতিম চরিত্র এবং রূপটি বজায় রেখেছে এবং বাঁশকে পুরুষচিহ্নের প্রতিভূ হিশেবে সাব্যস্ত করে, তাকেই মদনদেবতা-ওরফে-কামপ্রতীক ধার্য করে আরাধনা করার ব্যাপারটিও প্রচলিত হয়েছে। সেই আরাধনারই অনুষঙ্গ কামনা-জাগরণের গান, ওরফে জাগ-গান। চৈত্রমাসের মদন-চতুর্দশীতে ওই গানের মাধ্যমেই উৎসব শুরু হয় এবং সেই উৎসবের সংক্ষিপ্তসার শ্রদ্ধেয় নীহাররঞ্জন যা লিখেছেন, তার মধ্যেই সুন্দরভাবে মেলে।

এই পূজার বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর লেখা 'দা রাজবংশীজ অব নর্থ বেঙ্গল' (১৯৬৫) বইতে ঃ "...ধান কেটে গোলায় তোলা সারা হলে রাজবংশী যুবকেরা মদন-চতুর্দশী তিথিতে 'বাঁশ পূজা' বা 'বাঁশজাগাও' অনুষ্ঠানের উদ্‌যাপন করে। একেই বলা হয় 'মদনকাম পূজা'। সাতটি বাশকে রঙিন্ কাপড় দিয়ে জড়িয়ে, প্রত্যেকটির গায়ে একটি করে 'চ্যাঁহার' অর্থাৎ, চমরী গাইয়ের লেজ দিয়ে তৈরি চামর বাঁধা হয়। এগুলিকে বলা হয় (যথাক্রমে) ১. শালসিরি মহারাজা , ২. গরাম , ৩. সন্ন্যাসী ; ৪. কালি , ৫. তিস্তা বুড়ি ; ৬ বিষহরি ; ৭. মাদার পীর। একজন রাজবংশী 'দেওসী' এই পূজার পুরোহিত হন। একটা মেটে কলসি চাল এবং ভর্তি ফুলে করে তিনি সঙ্গে করে আনেন। পূজোর (বা, 'খেলা'-র) প্রথম দিনটিকে বলা হয় 'বাঁশ জাগাও' ; ঐ দিন ছেলেরা কেউ-কেউ মেয়ে সাজে, কেউ আবার বিচিত্র সব পোশাক-টোশাক পরে সাজে খেয়ালখুশি মাফিক। দলের মধ্যে কয়েকজন ঐ বাঁশগুলিকে বয়ে নিয়ে আসে এবং সেই সাজগোজকরা ছেলেরা ঢাক এবং পাহাড়ী-অঞ্চলে ব্যবহৃত কাঁসর বাজিয়ে নাচগান করে।

এইভাবে গ্রামের কোনও একটি বাড়িতে পৌঁছনোর পর সব ক-টি বাঁশকে একটা কাপড়ের ওপরে শুইয়ে রেখে সবাই মিলে নাচতে গাইতে শুরু করে। ঐ দিন বিকেলে মাঠের মধ্যে কালীপূজা ওরফে, 'বোসানি'-পূজাও করা হয়। এই উপলক্ষে পাঁঠা, খাসি পায়রা-ইত্যাদি বলি দেওয়া হয়। তবে এটার সংখ্যা নির্ভর করে চাঁদা ওঠার পরিমাণের ওপর। এরপরে, উপস্থিত সকলকে দুধ-মুড়ি-মুড়কি-কলা খাইয়ে সন্ধ্যের আগেই পূজার পাঠ সেরে দেওয়া হয়। এই পূজার পিছনে একটা বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে : মহামারীর হাত থেকে গ্রামকে বাঁচানো। এই এলাকায় পানবসন্ত রোগের প্রতিরোধে শীতলা ঠাকরুনের বদলে কালীরই আরাধনা করা হয়। পূজা সাঙ্গ হলে বাঁশজড়ানো কাপড় এবং চমরীর লেজের 'চ্যাহর'গুলি খুলে নিয়ে সবগুলো বাঁশ সবাই মিলে জলে ফেলে দেয়।" (পৃঃ ১৩৮, অনুবাদ বর্তমান লেখকের)। এসব তথ্য সান্যালকে দিয়েছিলেন রাজবংশী গবেষক প্রয়াত উপেন্দ্রনাথ বর্মন মহাশয়। এই পূজোর মধ্যে

বিষহরির সঙ্গে মুসলিম মাদার পীরের অবস্থানে এটা যে হিন্দুমুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পূজো বা উৎসব তা প্রমাণিত হয়। চারুবাবুর এই বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে তিস্তা-সন্নিহিত অঞ্চলের বাঁশপূজা-তথা মদনকাম পূজার মাধ্যমে নির্দিষ্ট একটি কারণ বা তাৎপর্যকে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু বস্তুতপক্ষে, এই উৎসবের তাৎপর্য আরও অনেক বেশি। প্রথমত ফসল গোলায় ওঠার পরে যে এই অনুষ্ঠান করা হয়, তার থেকেই এর সঙ্গে শস্য উৎপাদনের একটা অলক্ষিত সম্পর্ক নির্দেশ করা যায়। অর্থাৎ মূলত এটি উর্বরতাকেন্দ্রিত ধর্মধারা বা ফার্টিলিটি কাল্টের সঙ্গেই সম্পর্কিত। আর সেই জন্যেই বাঁশকে কামদেবতার প্রতীক গণ্য করে পূজো চালু হয়েছে।

এই ব্যাপারটি পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায়। দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে ইঁদপূজার কথা তো এখানে বলাই যায়। উত্তর বঙ্গের জনজীবনে বাঁশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় বলে সেখানে দেবপ্রতীক হিশেবে তাব স্বীকৃতি মিলেছে। আর মেদিনীপুর পুরুলিয়া-বাঁকুড়া-বীরভূম-প্রভৃতি অঞ্চলে বাঁশের বদলে প্রায় একই অভীপ্সা শালগাছকে ইন্দ্রধ্বজ (ওরফে ইঁদ ঠাকুর) রূপে গণ্য করে পূজা করার মধ্যে নিহিত। প্রাচীন কালের শক্রোত্থান-উৎসবই ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে এসেছে ইঁদ-পরবে। এ ধরনের উৎসবের পিছনে যে যৌনপ্রতীকোপাসনার মানসিকতা আছে তা তো ইঁদের সূত্রেই বোঝা যায়। মুণ্ডা সমাজে বহুল প্রচলিত যে 'ইন্দি' দেবতার পূজা আছে, তিনি তো আবার শস্যের পাহারাদার বলে গণ্য হন তাঁদের কাছে। আর ইঁদের ক্ষেত্রে যৌনতার ব্যাপারটা প্রত্যক্ষতর। 'ইঁদ ডাং' যেটির নাম, সেই গাছটি 'পুরুষ' এবং তার বাড়তি ডালপালাগুলো কেটে সরাসরি একটি 'ফ্যালিক সিম্বল' হিসেবে সাজিয়ে তোলা হয়। আর পাশের গাছ যার স্থানীয় নাম 'মাসি'—সেটিকে 'নারী' বলে ধার্য করে, গায়ে ত্রিকোণাকার খাঁজ কেটে দেওয়াটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এছাড়া, মেয়ে গাছের মাথায় চাপানো 'ঝুড়ি'-র নাম 'শাঁখা', পূজোর আগের দিনের নাম অধিবাস, গাছদুটির চারপাশে সাতপাক ঘোরা, পূজোয় নরসুন্দরের বাধ্যতামূলক হাজিরা-ইত্যাদি ব্যাপার অবশ্যই এক রকমের প্রতীকী বিবাহাচারের সংকেত আনে। পূজোর কদিন চাষের কোনও কাজ নিষিদ্ধ থাকা এবং পূজার শেষে ইঁদকুড়িতে (অর্থাৎ, সরায় , সংস্কৃতি বিজ্ঞানে যাকে 'গার্ডেন অব অ্যাডোনিস' বলে) বীজে ছড়ানোটা তো গর্ভাধানের প্রতীকী কৃত্যবিশেষ। যৌনতা এবং শস্যাকাঙ্ক্ষা—এই দুই বিষয় সেখানে ওতঃপ্রোতভাবে মিলে গেছে বলে সেটি উর্বরতাকেন্দ্রিত ধর্মধারার নিদর্শ। ঠিক একই কথা বলা চলে 'মদনকাম' উপাসনা সম্পর্কেও।

পূর্বভারতে যা 'দোল', উত্তরভারতে তাই 'হোলি' বা 'হোরি', পশ্চিমে সেটাই হলো 'শিমাগা' এবং দ্রাবিড় বলয়ে তার নাম 'মদন-দহন' বা 'কামায়ন', এই বসন্তোৎসবও আসলে মদনোৎসব ছিল : এখন এই উৎসব উপলক্ষে নারী-পুরুষের মেলামেশার অবাধ ছাড়পত্র যা মেলে সেটাই এ কথার প্রমাণ। এগুলোও একই সঙ্গে ছিল শস্যোৎসব এবং যৌনোৎসব। ইউরোপের 'মে ফেয়ার', 'ফ্লাওয়ার ডে

ফেস্টিভ্যাল', ব্যাকানালিয়া কিংবা বড়দিনের 'কিসিং আণ্ডার দ্য মিস্‌লটো', প্রাচীন ভারতে প্রচলিত 'শাবরোৎসব' ইত্যাদি উপলক্ষও ঠিক একই ব্যঞ্জনা বহন করে। তামিল মহাকাব্য 'শিলপ্পাদিকরণ' এবং 'মণিমেখলাই'তে দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত অনুরূপ একটি উৎসবের একাধিক বর্ণনা। উত্তর আমেরিকার হোপি, নাভাজো, সেনেকা এবং আরও অনেক গোষ্ঠীর আদিবাসীদের মধ্যেও এ-ধরনের উৎসবের খোঁজ মেলে। জাপানের চেরীফুল উৎসব অথবা পশ্চিম অফ্রিকার আশান্টিদের অনুরূপ উৎসব-ইত্যাদির কথাও উদাহরণত বলতে পারি। উল্লেখযোগ্য যে, সর্বত্রই প্রত্যক্ষে-বা পরোক্ষে একটা-বা-একাধিক যৌন প্রতীক অনবির্যভাবে এসে গেছে। হোলি উপলক্ষে মাঠের মধ্যে একটি লম্বাটে ঘর বানানো এবং পরে সেটি পোড়ানো, পোড়ানোর পর জমা ছাইয়ের ওপর আঙুল বুলিয়ে গৌরীপট্ট (অর্থাৎ, যোনিচিহ্ন) আঁকা, শাবরোৎসবে গাছের দুপাশ থেকে এসে নারী-পুরুষের মিলন ঘটা, ব্যাকানালিয়ায় ছুঁচলো-মাথা টুপি পরে মেয়েদেরকে তাড়া করার ভাণ করা, ফ্লাওয়ার ডে ফেস্টিভ্যাল বা চেরীফুল উৎসবে ফুলন্ত গাছকে ঘিরে নারী-পুরুষের হাতধরাধরি করে 'কিসিং আণ্ডার দ্য মিস্‌লটা'-তে বড়দিনের বিশেষ আকৃতির নকল গাছের তলায় তরুণ-তরুণী নাচতে নাচতে এসে পড়লে চুম্বন-বিনিময় করা-ইত্যাদি বিষয় সন্দেহাতীতভাবে মূলত এগুলি যৌনতাভিত্তিক উৎসবই যে ছিল তার প্রমাণ দেয়। অন্যান্য উল্লেখগুলির ক্ষেত্রেও ওই প্রতীকী ব্যাপারটা থাকেই অপরিহার্য হয়ে। এবং নতুন ফুল-ফল-শস্যের আগমনী সূচিতও করে এদের সবগুলিই। কাজে কাজেই সবটা মিলিয়ে উর্বরতাকেন্দ্রিত ধর্মধারা হিশেবেই এদের মূল্য নিরূপণ করতে হবে।

মদনকাম-তথা-বাঁশপূজাও এই বিশ্বব্যাপ্ত ধারারই একটি আঞ্চলিক রূপায়ণ। 'জাগ' গানও তাই এধরনের উপলক্ষে যত রকমের গানের প্রচলন আছে দুনিয়া জুড়ে, তারই রকমফের। মদনভস্মের পর তাঁর পুনর্জাগরণ ঘটে বলে যে পৌরাণিক কাহিনী গড়ে উঠেছিল সেটা তো বস্তুতপক্ষে, শীতের শেষে বসন্তের আবির্ভাবের নেচার মীথেরই পরিশীলিত রূপ। উত্তর বঙ্গের জনজীবনে সেটাই আবার লোকায়ত স্তরে পুনরাবর্তিত হয়েছে পৌরাণিক নামটুকু সঙ্গে নিয়ে। সেভাবে বিচার করলে কালচারাল কনটিনুয়ামের অসাধারণ নিদর্শ হিশেবে এটি গণ্য হতে পারে। এখানেই এর আসল গুরুত্ব। এখন এই উৎসব এবং এই গানের প্রচলন স্তিমিত হয়ে এসেছে। তাই এই পরিপ্রেক্ষিতে, এটি নিয়ে চিন্তাভাবনার প্রয়োজন ঘটছে যে, সংস্কৃতি-বিজ্ঞানের ছাত্ররা সবাই সেটা মানবেন। বন্ধুবর সুখবিলাস বর্মার লিখিত এই সংকলন সেই প্রয়োজন অনেকখানিই মেটাবে, পরিশেষে বক্তব্য এটাই শুধু ॥

পল্লব সেনগুপ্ত

ভূমিকা

শ্রীসুখবিলাস বর্মা আমার কাছে এক বিস্ময়কর মানুষ। আই এ এস পরীক্ষায় কৃতিত্বের সূত্রে ও কর্মদক্ষতায় তিনি বিশেষ উচ্চতায় আসীন, আবার একেবারে মাটির গন্ধ নিয়ে উঠে আসা ভাওয়াইয়া গানের এক প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। এরকম দুই পৃথিবীর বাসিন্দা খুব বেশি পাওয়া যায় না। এই দুই পৃথিবীর মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধ আজকের পণ্যজীবী পৃথিবীতে তৈরি হতেই পারে। বাবু বুরোক্রাসিতে এ নিয়ে তাঁর নানা সমস্যা-সংকট-অস্বস্তি হওয়াও বিচিত্র নয়। কিন্তু সামাজিক ভূমিকার মাপে কাট ছাঁট হওয়া মানুষের তুলনায় সাধারণত এসব মানুষেরা অনেক বেশি ধনী হয়। এই ধন অবশ্য সাংসারিক ঐশ্বর্য নয়।

উত্তরবঙ্গের 'জাগ' গানের উপর তাঁর এই বইটি পড়ে আমি অবাক হয়েছি। এর আগে, কবি রতিরাম দাস রচিত জাগ গান সংগ্রহ ও সংকলিত ক'রে যাদবেশ্বর তর্করত্ন "রঙ্গপুরের জাগের গান" প্রবন্ধ লিখেছিলেন। টীকা যোগ করে রাজবংশী সমাজের নবজাগরণের প্রধান হোতা পঞ্চানন সরকার বা ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা রংপুর শাখা সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশ করেন, ১৩১৫ সালের দ্বিতীয় সংখ্যায়। যাদবেশ্বর তর্করত্ন, যিনি তথাকথিত "অশ্লীলতা দুষ্ট" এই গান ও পালাগুলিকে লোকসংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ হিসেবে গণ্য করেছিলেন এবং সংগ্রহ করতে দ্বিধা করেন নি ; ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা, যিনি উপযুক্ত টীকা যোগ করে এ গানগুলির সামাজিক-সাংস্কৃতিক-ঐতিহাসিক প্রতিবেশকে স্পষ্ট করে তুলেছিলেন ; এবং সর্বোপরি শ্রীবর্মা, যিনি এই গানের পাঠ ও পটভূমিকা—সবই গ্রথিত করে গ্রন্থের আকারে তা আমাদের এবং স্থানকালনির্বিশেষে বাঙালি পাঠকদের জন্য সাজিয়ে দিয়েছেন, আমাদের কৃতজ্ঞতা সকলের কাছেই। আব্বাসউদ্দিন স্মরণ সমিতিকেও ধন্যবাদ, তাঁরা এ বইটি প্রকাশ করছেন বলে।

এই গানগুলির মধ্যে নানা ভাগ আছে। প্রথম অংশটিতে সংকলিত হয়েছে কামদেবের জন্মগীত ও বাঁশ সৃজন ইত্যাদি সংক্রান্ত গান। এসব গানের মূল বিষয় মদন বা কামদেব। মদনকামদেবের পূজায় ভয়ভক্তির চেয়ে মানবিক প্রেমের প্রাধান্য হওয়াই স্বাভাবিক এবং যখন তার সঙ্গে তান্ত্রিক ও শৈব ধর্মীয় সামাজিক প্রতিবেশের ভাং খাওয়া, সন্তানধারণ ইত্যাদির অনুষঙ্গ মিশে যায় সেখানে উদ্দাম জৈবিক বাসনা-কামনার প্রকাশ ঘটবেই। আবার যেখানে শোষক শ্রেণীকে প্রত্যক্ষ আক্রমণ ও প্রতিবাদের সুযোগ না থাকায় গানের মধ্য দিয়ে তাদের আক্রমণ করা হয় তখন তাতেও তথাকথিত "অশ্লীলতা" আসতেই পারে। আক্রমণের উপলক্ষ্য না থাকলেও, অনেক সময়, নিছক মজার জন্যই এই ধরনের

"অশ্লীলতা" আসতে পারে—-কুলিদের "মারো জোয়ান হেঁইয়ো" গোছের হাঁকডাকে যেমন। এগুলি সমাজের কোনো এক শ্রেণীর স্বাভাবিক ভাষা, বলতে পারি উপলক্ষ্য-প্ররোচিত 'স্বাভাবিক' ভাষা। এতে কোনো আত্মসচেতনতা নেই, ব্রোনিস্লাভ্ ম্যালিনোওস্কি-র পরিভাষা ধার করে বলতে পারি বিশেষ প্রতিবেশ বা কনটেক্সট্-এ এই ধরনের টেক্সট্-ই প্রত্যাশিত।

আর এক শ্রেণীর গানের বিষয় রাধা ও কৃষ্ণ। এ গানগুলিও বিস্ময়কর। এগুলি থেকেই বোঝা যায় পৌরাণিক বা ভাগবতীয় কৃষ্ণ এবং পরবর্তী নানা নব্য পুরাণের রাধার একটি সমান্তরাল, রাখালিয়া ধারা বাংলার নানা অঞ্চলেই বেশ ব্যাপক ও প্রবল ছিল, যেখানে রাধাকৃষ্ণ মূলত জৈবিক প্রেমের প্রতীক, তার বেশি কিছু নয়। রবীন্দ্রনাথ 'লোকসাহিত্য' (১৯০৯) বইয়ের "গ্রাম্যসাহিত্য" প্রবন্ধে এ ধরনের কিছু গানের ইঙ্গিত দিয়েছেন, কিন্তু তাঁর সংগ্রহে শুধু সেইসব গানই ধরা পড়েছে যেগুলি প্রায় বৈষ্ণব পদাবলির সগোত্র। এ ধরনের জাগের গান দেখলে তাঁর লেখনি সম্ভবত কম্পিত হত। তাঁর "হরগৌরীর গান সমাজের গান এবং রাধাকৃষ্ণের গান সৌন্দর্যের গান"—এ জাতীয় সিদ্ধান্ত জাগের গানগুলির পরিপ্রেক্ষিতে অসম্পূর্ণ ও বিভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয় তাতে সন্দেহ নেই। সমস্ত রাধাকৃষ্ণের গান কখনোই তাঁর ওই "সৌন্দর্যের গান" নয়। বলা বাহুল্য, সৌন্দর্যসৃষ্টি সে সব গানের একমাত্র লক্ষ্যও নয়। এসব গান থেকেই বোঝা যায়, বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', প্রথম দিকে পুরাণের সামান্য পালিশ সত্ত্বেও, কোন্ যথার্থ লৌকিক পটভূমিকা থেকে জন্ম নিয়েছে। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর রাঢ় অঞ্চলের উৎস-ভূমি সম্বন্ধে নানা আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এই জাগের গান বা পালাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে তার একটি উত্তরবঙ্গীয় ঐতিহ্যেরও অনুসন্ধান করলে গবেষকরা লাভবান হবেন বলেই মনে হয়। তার অর্থ এই নয় যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর উদ্ভব অন্য কোনো অঞ্চলে এমন দাবি নিঃসংশয়ে করা যায়। কিন্তু তার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটটি যে রাঢ় অঞ্চলের বাইরেও অনেকটা প্রসারিত ছিল তা ভাবাই যেতে পারে। প্রয়াত ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'লোকসঙ্গীত রত্নাকর' (১৩৭৩) গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে অল্প কিছু এধরনের গান সংগ্রহ করেছিলেন, কিন্তু এগুলি সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করার অবকাশ তিনি নেননি।

আর একটি অংশে পাই কবি রতিরাম দাসের আত্মবিবরণ, যেখানে কোচ রাজ্যের ইতিহাসের এক খণ্ড চিত্রিত করে সেখানকার রাজাদের অত্যাচার, শঠতা এবং রায়ত প্রজাদের নিদারুণ দুঃখদুর্দশা গভীর মমতায় বর্ণনা করেছেন তিনি। রায়ত প্রজারা—"থাকে খাড়া হৈয়া। হাত জুড়ি চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইয়া।। পেটে নাই অন্ন তাদের

পৈরানে নাই বাস। চামে ঢাকা হাড় কয়খান করি উপবাস।।" এই ছবি থেকে শ্রী পরিতোষ দত্ত যথার্থ ভাবেই জাগ গান নিয়ে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধে রতিরামকে "একজন শ্রেষ্ঠ প্রতিবাদী লোককবি" আখ্যা দিয়েছেন। এই অংশও এ সংকলনের এক অমূল্য সম্পদ।

শ্রীবর্মা এই গানগুলির ঐতিহাসিক ও সামাজিক পটভূমিকে এ গ্রন্থে আরও বিস্তারিত করেছেন এবং আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের আলোকে এ গানগুলিকে বিচার করার প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর পরিশ্রমী গবেষণায় গানগুলির ওই টেক্সট ও কনটেক্সট দুইই আমাদের কাছে পরিষ্কার ধরা দিয়েছে। তিনি অশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে আঞ্চলিক ও অপরিচিত শব্দের অর্থ দিয়েছেন, একটি চমৎকার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ খাড়া করে এ গানগুলিতে ব্যবহৃত কামরূপী উপভাষার একটি মানচিত্র নির্মাণ করেছেন। তিনি সংগতভাবেই বলেছেন, "বাংলা ভাষাব যে উপভাষাটি রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা তার নাম রাজবংশী বা কামরূপী। এই ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য যে এতে প্রাচীন ও মধ্য বাংলাব বেশ কিছু উপাদান বর্তমান।" এরকম হওয়াই স্বাভাবিক, কাবণ মান্য উপভাষা থেকে দূববর্তী প্রান্তিক উপভাষাগুলি উচ্চারণ, ব্যাকরণ ও শব্দভাণ্ডার সবদিক থেকেই একটু বক্ষণশীল হয় এবং তাতে মান্য ভাষায় লুপ্ত অনেক উপাদানই বর্তমান থাকে। এ ছাড়া এ ভাষা সীমান্তবর্তী উপভাষা হওয়ায়, অসমিয়া বা উত্তর বিহারের মগহি ভাষার উপাদান, এমনকী অন-আর্য অন্যান্য নৃগোষ্ঠীর ভাষার উপাদানও এতে অপ্রত্যাশিত নয়। ফলে রাজবংশী বা কামরূপী উপভাষা বাংলা ও অন্যান্য প্রতিবেশী ভাষার ইতিহাস রচনায় অমূল্য উপাদান সঞ্চিত করে রেখেছে। তবে এক জায়গায় শ্রীবর্মা বলেছেন, সম্ভবত ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের উদ্ধৃতির সূত্র ধরে, যে এতে রূপতত্ত্বে "চলিত বাংলার রূপের বিকৃতিই প্রধান।" আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে "বিকৃতি"-র ধারণাটি গ্রাহ্য নয়, পরিবর্তন-এর ধারণাটিই গ্রাহ্য। "বিকৃতি"-কথাটির মধ্যে একটি অবজ্ঞার ভাব আছে। আমরা জানি, ভাষার কোনো রূপই অবজ্ঞেয় নয়, যদিও তার কোনোটি আঞ্চলিক, কোনোটি শ্রেণী বা গোষ্ঠীবদ্ধ, কোনোটি উপলক্ষ্য-নির্দিষ্ট। যাই হোক, একদিক থেকে দেখতে গেলে মান্য বা ষ্ট্যান্ডার্ড উপভাষাই সবচেয়ে "বিকৃত" উপভাষা, কারণ তাতেই ধ্বনিগত ও অন্যান্য পরিবর্তন সবচেয়ে বেশি ঘটে। ফলে "বিকৃতি" কামরূপীতে যত, আমাদের চলিত বাংলায় তার চেয়ে অনেক বেশি। এই লেখকের কাছে কামরূপ উপভাষা অত্যন্ত শ্রুতিমধুর লাগে, যদিও জানি শ্রুতিমধুরতা বিষয়টি প্রায়ই ব্যক্তিগত ও মন্ময়।

আমি শ্রীবর্মার এই গ্রন্থ ও সংকলনকে বাংলা লোকসাহিত্য গবেষণার অঙ্গনে স্বাগত জানাচ্ছি। এর আগে উত্তরবঙ্গ বা কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি-সাহিত্য সম্বন্ধে যে-সব বই বেরিয়েছে তাতে জাগের গান তেমনভাবে স্থান পায়নি। ফলে বাংলা লোকসাহিত্য গবেষণায় এ এক লুপ্ত রত্নোদ্ধার হল। লোকসংস্কৃতির অনুরাগী পাঠকবৃন্দ এ গ্রন্থকে সংবর্ধিত করবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উচ্চশিক্ষা সংসদ
১৫ অক্টোবর, ১৯৯৭

পবিত্র সরকার

লেখকের কথা

জীবনের ষোলটি বছর (শৈশব থেকে কৈশোর) কাটে জন্মভূমি কৃষ্ণপুর গ্রামে। আমাদের এই গ্রামটি আব্বাসউদ্দিন সাহেবের জন্ম ও কর্মভূমি বলরামপুর থেকে প্রায় ৫ কি.মি. পুবদিকে। এক কালে বলরামপুরের মতো কৃষ্ণপুরকেও বন্দর বলা হত। অর্থাৎ গ্রামটি তৎকালীন মাপকাঠিতে মোটামুটি বর্ধিত গ্রাম হিসেবে পরিচিত ছিল। কৃষ্ণপুর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামে সারা বছর বিভিন্ন গ্রামীণ উৎসব মেলা ইত্যাদি লেগেই থাকত। সেই কারণে ছোটবেলা থেকেই উৎসব এবং তৎ-সংক্রান্ত আচার অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়েছিল। গ্রামের দেনন্দিন হরিকীর্তন ছাড়াও দোতোরা, কুশান, বিষহরা প্রভৃতি পালাগান, কৃষ্ণলীলা (কৃষ্ণযাত্রা) গ্রামের পূজা পার্বণে লেগে থাকত এবং দেখার সুযোগও হয়েছিল অনেকবার। কাতি পূজা ও যাইটোল পূজা এবং তৎ-সংক্রান্ত গান শোনার সুযোগ হয়েছিল। একেবারে ছোটবেলায় হুদুম অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়েছিল এক আবোর (দিদিমার) সাহায্যে। তিনি নিয়ে গিয়েছিলেন নাচ-গানের সঙ্গে টিন (ভাঙা কেরোসিন টিন) বাজিয়ে তাল দেওয়ার জন্য। গ্রামের ভঙর, সোনারায়, কান্দেবের (কামদেবের) মাগন অনুষ্ঠান দেখেছি অনেকবার। 'ভঙর' অনুষ্ঠানটি হত রোগ শোক প্রতিকারের নিমিত্ত। গ্রামের অতি সাধারণ চিকিৎসা ব্যবস্থা কবিরাজ, হাতুড়ে ডাক্তার, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, ঝাড়ফুঁকের ওঝা ইত্যাদির সাহায্যে রোগ না সারলে ভঙরিয়ার শরণ নেওয়া হত। 'ভঙরিয়া' এক গুনিন যার মধ্যে কোনও দেবদেবী ভর করে। সাধারণত গ্রামের কোনও জাগ্রত দেবী কালী, চণ্ডী মাতৃকাদেবী ইত্যাদি গুনিনের শরীরে ভর করে রোগ নিরাময়ের প্রতিকার জানায়। ভঙরিয়ার 'ভঙর' অনুষ্ঠানটি নিম্নরূপ। বাড়ির উঠোনে তুলসী তলায় নেউজ পাতার (কচি কলাপাতা মাথার দিকের শিরা সহ) উপরে এক থাকি ষোলটিয়া কলা (১৬টি মানিক কলার ছরা) রেখে তার গোড়ায় ভেজানো আতপ চাল, দুধ, কলা ইত্যাদি দেওয়া হয়। কলাপাতার মাথায় এবং কলাগুলির মাথায় সিন্দুরের ফোঁটা লাগানো হয়। এর পরে এই পাতার সামনে দই-চিরা-আটিয়া (বীচি) কলার নৈবেদ্য সাজানো হয়। ভঙরিয়া এবারে কপালে সিন্দুরের ফোঁটা লাগিয়ে ধ্যানের ভঙ্গিতে বসে কিছু একটা মন্ত্র জপ করতে থাকে। সঙ্গে চলে ঢোলের বাজনা, প্রথমে বিলম্বিত লয়ে যা ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। বাজনার তালে তালে মাথা দুলতে থাকে এবং পর্যায় ক্রমে সেই দুলুনি বাড়তে বাড়তে এক সময়ে ভঙরিয়া উঠে দাঁড়িয়ে নাচতে থাকে। 'ভঙর'-এর ঢোলের বাজনা শুনলেই আমরা পাড়ার ছেলেমেয়েরা দৌড়ে যেতাম সেখানে। ভঙরিয়ার মাথার দুলুনি, নাচ, নাচের তালে তালে মাঝে

মাঝে সরু বেতের সাহায্যে নিজের পিঠে বেত্রাঘাত দেখার এবং ভঙরের শেষে দই-চিরা প্রসাদ খাওয়ার আকর্ষণ ছিল দুর্দমনীয়। আমার কাছে অতিরিক্ত আকর্ষণ ছিল ঢোলের বাজনা। আমাদের বাড়িতে সংগীতের পরিবেশ ছিল। বাবা কীর্তন করতেন, এখনও করেন। ছোট ভাই কীর্তন করে। বাড়িতে ঢোল, খোল, মন্দিরা বাদ্য যন্ত্র ছিল। 'ভঙর' দেখে এসে ঢোলে সেই বাজনা চর্চার চেষ্টা থেকে ক্রমে ক্রমে ঢোল বাজনা আয়ত্তে আসে। একইভাবে খোল বাজানোতে ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হই এবং গ্রামে কীর্তনের দলে খোল বাদক হিসেবে পরিচিতি আসে। তবে এই গান বাজনা নিয়ে পুরোপুরি মেতে থাকার উপায় ছিল না। অবশ্যই অভিভাবকদের চোখ এড়িয়ে, শাসনের কড়া বাঁধনের মধ্যে গান বাজনায় অংশ নেওয়া, পালাগান শোনা ইত্যাদির আকর্ষণ ও মজাই ছিল আলাদা।

অন্যদিকে কৃষি কার্যের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কাজ—হাল চাষ, ধান-পাট নিড়ানো, ধান-পাট কাটা ইত্যাদিতে অংশ নেওয়ার সুযোগে সহকর্মীদের সাথে কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিষহরা দোতোরা কুশানের ধুয়া গাওয়া ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বর্ষাকালে রিম ঝিম বৃষ্টিতে হাল চালাতে চালাতে হয়ত্ কেউ গান ধরল—"দ্যাওয়ায় কইরছে ম্যাঘ ম্যাঘালি তলাইল পুবাল বাও" সঙ্গে সঙ্গে তার সাথী হালুয়া (হাল চালক) গলা মিলিয়ে গান শুরু করল। এভাবেই গানের তালিম শুরু। সন্ধ্যাকালীন কীর্তন, কৃষিকাজের ফাঁকে ফাঁকে বা অবসরে ধুয়া গান (যা ভাওয়াইয়া চটকা নামে পরিচিত) চর্চা গ্রামের আর পাঁচজন যুবকের মতো আমার কাছেও ছিল অতি সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার। জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ে এই প্রাথমিক বাহিরানা শিক্ষা কাজে লাগিয়ে ভাওয়াইয়া চট্‌কার চর্চার দিকে ঝুঁকে পড়ি।

গ্রামের বিভিন্ন উৎসব মেলার মধ্যে একটি ছিল বাঁশ পূজা এবং সেই উপলক্ষে কান্দেব (কামদেব) মাগনের নাচ গান, বাঁশের 'থলা'য় অনুষ্ঠিত জাগ গান ও কান্দেবের গান। বাঁশের 'থলা' হল কোনও মাঠ যেখানে গ্রামের সব বাড়ি থেকে পূজা করা বাঁশ নিয়ে এসে যৌথভাবে পূজা করা হয় নাচ গান সহ। এখানেই চলে জাগ গান। এই জাগ গান আমার শৈশবকালেই অর্থাৎ পঞ্চাশের দশকেই একটি ক্ষয়িষ্ণু অনুষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে শুরু করেছিল। যাহোক দু'একটি অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ হয়েছিল। আমাদের বাড়ির দুই মাইল দূরে একটি মরা নদীর ধারে উন্মুক্ত মাঠ "সেবার কুঠী"তে এই 'থলা' বসত। এই 'থলা'তে কান্দেবের নাচ গান, বাঁশ হাতে নিয়ে বিভিন্ন দলের নাচ গান দেখেছি। কিন্তু জাগ গান শুনতে পাইনি। কারণ এই বয়সের কোনও ছেলেকে অভিভাবকরা জাগ গান শুনতে দেবে না। এই জাগ গান ও বাঁশের 'থলা' এখন প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বর্তমানে সারা কোচবিহার জেলায়

মাত্র দুটি বা তিনটি জায়গায় এই 'থলা' বসে। তারমধ্যে তুফানগঞ্জ মহকুমার বারোকোদালি গ্রামে "ভারেয়ার ডাবরি'র অনুষ্ঠানটি উল্লেখযোগ্য। "ডাবরি" কথার অর্থ উন্মুক্ত খোলা মাঠ। এই বছরের চৈত্র মাসেও সেখানে বিশাল মেলা জমে উঠেছিল—বারোকোদালি ও আশপাশের গ্রাম থেকে অনেক বাঁশ এসেছিল এই "থলায়" এবং ৮/১০টি কান্দেবের দলও এসেছিল। জাগ গান নিয়ে কেউ আরো গভীর গবেষণা করতে চাইলে বারোকোদালি ও আশপাশ গ্রামে এখনও কিছু তথ্য পাওয়া যেতে পারে।

ভাওয়াইয়া চটকা শৈলীর একজন শিল্পী হিসেবে ভাওয়াইয়া চটকার সাথে সাথে অন্যান্য লোকসংগীতের চর্চায় গত কিছুদিন থেকে নিয়োযিত আছি। এই সুবাদেই লোক সংগীত নিয়ে, ভাওয়াইয়া চটকা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনামূলক লেখা বিভিন্ন ক্ষুদ্র পত্রপত্রিকায় ছাপানোর প্রয়াস লাভ করেছি। "ভাওয়াইয়া কথা ও সুর" এই নামে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক হিসেবে বেশ কিছু নতুন তথ্য ও গান সংগ্রহ করতে পেরেছি। এই সব তথ্য থেকে ভাওয়াইয়া চটকার বিশ্লেষণমূলক আলোচনাসহ একটি পুস্তক প্রকাশ করার পরিকল্পনাও রয়েছে। কিন্তু ভাওয়াইয়া শৈলীর প্রায় নিশ্চিহ্ন গান 'জাগ গান' নিয়ে কখনো কোনো পুস্তক প্রকাশ করা যেতে পারে একথা স্বপ্নেও ভাবিনি। এই বিষয়ে সামান্যতম চিন্তা ভাবনা থাকলেও ইতিমধ্যে আরও কিছু তথ্য, আরও গান এবং অনুষ্ঠান ও নাচগান নিয়ে ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ করার চেষ্টা করা যেত। যা হোক, সব কাজ বোধ হয় পুরোপুরি পরিকল্পনা মতো চলে না। মাস কয়েক আগে আব্বাসউদ্দিন স্মরণ সমিতির একটি সভায় সমিতির সহ-সভাপতি শ্রদ্ধেয় পরিতোষ দা (পরিতোষ দত্ত) প্রস্তাব রাখলেন যে আব্বাসউদ্দিন স্মরণ সমিতির প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে জাগ গান নিয়ে কোনো পুস্তক প্রকাশ সম্ভব কি না? আলোচনার পর দায়িত্ব পড়ল আমার উপর। এরপর আমরা অনেকবার বসেছি, বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি আমার কাছে যে তথ্য রয়েছে তাকে ব্যবহার করে কিভাবে সুসংহতভাবে বিষয়টিকে তুলে ধরা যেতে পারে সে নিয়ে সকলের পরামর্শ নিয়েছি। ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকার সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শ্রী দিব্যজ্যোতি মজুমদার আমাদের অনুরোধে পুস্তকটি প্রকাশে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আমাদের সব আলোচনায় তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন। পুস্তকটির ছাপানোর তদারকি, পরিকল্পনা, সম্পাদনা ইত্যাদির পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে তিনি আমাদেরকে বাধিত করেছেন। পুস্তকটি আব্বাসউদ্দিন স্মরণ সমিতি প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়ায় সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধেয় কালি দাশগুপ্ত সহ প্রত্যেক সদস্যের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

পুস্তকে উদ্ধৃত গানগুলির কিছু কিছু নেওয়া হয়েছে রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা থেকে। ১৯৭১ সালে ধুবরী মহকুমা পরিষদের পক্ষে স্বর্গীয় শিবানন্দ শর্মার সম্পাদনায় প্রকাশিত গোয়ালপাড়া জিলা সংস্কৃতি সংরক্ষণ স্মৃতিগ্রন্থে গোয়ালপাড়া জিলার ঝাপুসাবাড়ি গ্রামের স্বর্গীয় আদ্যনাথ রায়ের কাছ থেকে সংগৃহীত "বাঁশ পূজার গীত আরু নাচ" থেকে পাওয়া গেছে আরও কিছু গান। পুস্তকখানি দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রদ্ধেয় পরিতোষ দা। বাকি গানগুলি সংগৃহীত হয়েছে "ভাওয়াইয়া-কথা ও সুর" প্রকল্পের প্রকল্প সহায়িকা শ্রীমতী শমিতা গোস্বামী ও শ্রীমতী মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যর মাধ্যমে। গান সংগ্রহে কোচবিহার জেলাপরিষদের সভাধিপতি শ্রী মনীন্দ্রনারায়ণ অধিকারী এবং কোচবিহারের বিশিষ্ট লাকসংগীত সংগ্রাহক স্বর্গীয় হরিশ চন্দ্র পালের সুযোগ্য পুত্র বন্ধুবর চন্দন পালের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য।

পুস্তকখানিতে জাগ গানের নমুনা দেওয়ার জন্য কয়েকটি গানের স্বরলিপি সংযোজিত হয়েছে। একথা সত্য যে স্বরলিপির মাধ্যমে লোকসংগীতের পূর্ণ রূপ প্রকাশ সম্ভব নয়। স্বরের সঙ্গে বিভিন্ন শ্রুতির সূক্ষ্ম ব্যবহার, লোক সংগীতের কথার উচ্চারণ বাক্‌ভঙ্গির প্রকাশ স্বরলিপির মাধ্যমে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। তৎসত্ত্বেও সংগীত ধারাটির মোটামুটি একটি রূপ স্বরলিপির মাধ্যমে পাওয়া নিতান্ত অসম্ভব নয়। তাই এই প্রচেষ্টা। স্বরলিপি তৈরিতে সাহায্য করেছেন আমার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী হুগলি সরকারি শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সংগীত বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রী নিখিল চক্রবর্তী। তাকে জানাই আমার সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন। লোকসংস্কৃতিবিদ্ রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাসাগর অধ্যাপক ও বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত এবং রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য, ভাযাতত্ত্ববিদ ও লোকসংস্কৃতিবিদ ডঃ পবিত্র সরকার এই পুস্তকের প্রাক্-কথন ও ভূমিকা লিখে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। এভাবে শুভানুধ্যায়ী সকলের উৎসাহে উদ্দীপনায় আমার এই প্রথম প্রচেষ্টা জাগ গানের মত একটি কঠিন বিষয়ে পুস্তক প্রকাশ। তবে এই প্রয়াসে যাঁদের অবদান সবচেয়ে বেশি তাঁরা হলেন শ্রদ্ধেয় শ্রীপরিতোষ দত্ত, শ্রীচন্দন চক্রবর্তী, শ্রী দিব্যজ্যোতি মজুমদার ও শ্রী বিকাশ সরকার। তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনা, পরমার্শ ছাড়া একাজ কিছুতেই সম্ভব ছিল না। সর্বশেষে যাদের কথা না বললে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকবে, তারা আমার স্ত্রী শ্রীমতী দীপ্তি বর্মা এবং আমার কন্যাদ্বয় টিনা ও পমি! লোকসংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এদের উৎসাহ ও সমর্থন আমাকে এ পথে অবিচল থাকতে সাহায্য করেছে।

সুখবিলাস বর্মা

বর্তমান অসম, বাংলাদেশ ও উত্তরবঙ্গের এক বিশিষ্ট অংশ নিয়ে প্রাচীন 'কামরূপ' ভারতের ইতিহাসে বিখ্যাত জনপদ হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছিল। এই বিরাট রাজ্যের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় রামায়ণে যেখানে এরাজ্য 'প্রাগ্‌জ্যোতিষ' নামে উল্লিখিত। রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে প্রাগ্‌জ্যোতিষের অবস্থানাদির বর্ণনা—

যোজনানি চতুঃষষ্টি বরাহো নাম পর্ব্বতঃ
সুবর্ণশৃঙ্গ সুমহানগাধে বরুণালয়ে ॥
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্ ।
তস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকোনাম দানবঃ ॥

অর্থাৎ প্রাগ্‌জ্যোতিষ ছিল নরক, দানবের দ্বারা অধিকৃত প্রকৃতিদত্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত এক নগর। রামায়ণোক্ত এই বরাহ ও কামপর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে অপুনর্ভবক্ষেত্র ও অপুনর্ভব নামক সরোবরের কথা যোগিনীতন্ত্রের ৭ম ও ৮ম পটলে উল্লিখিত হয়েছে। এই বরাহ পর্বতের রমণীয় সানুদেশ ও বিশাল গুহাদিতে রাবণ কর্তৃক অপহৃতা সীতাকে অনুসন্ধান করার জন্য বীরবর সুগ্রীব তাঁর অনুচরবর্গকে উপদেশ দিয়েছিলেন।

মহাভারতেও প্রাগ্‌জ্যোতিষ নিয়ে অনেক কথা রয়েছে। নরকপুত্র ভগদত্ত ছিলেন প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি। তবে রামায়ণোক্ত চতুঃষষ্টি যোজন বিস্তৃত বিরাট প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্য মহাভারতের সময়ে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়েছিল। এখানে প্রাগ্‌জ্যোতিষ ব্যতীত তৎসন্নিহিত শোণিতপুর বর্তমান তেজপুর, হিড়িম্ব বর্তমান কাছাড়, জয়ন্ত বর্তমান জয়ন্তিয়া, কৌণ্ডিল্য বর্তমান সাদিয়া এবং মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যের নাম পাওয়া যায়। তবে এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি যে কখনও কখনও প্রাগ্‌জ্যোতিষের অন্তর্ভুক্ত ও অধীনে ছিল সে সম্পর্কে অনুমান করা হয়। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন খাণ্ডবপ্রস্থ থেকে দিগ্বিজয়ার্থে উত্তরাভিমুখে এসে যখন প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্তের রাজ্যে উপনীত হন তখন তিনি কিরাত, চীন এবং অন্যান্য বহুসংখ্যক যোদ্ধার সঙ্গে সমবেত ছিলেন। রাজসূয়পর্বে ভগদত্তের বর্ণনায় আছে—

"প্রাগ্‌জ্যোতিষশ্চ নৃপতির্ভগোদত্তোমহারথ ঃ
স তু সর্বৈঃ সহ ম্লেচ্ছৈ ঃ সাগরানুপবাসিভিঃ ॥

অর্থাৎ ভগদত্ত যুধিষ্ঠির আয়োজিত রাজসূয় যজ্ঞে জলপ্রধান দেশস্থ সমস্ত ম্লেচ্ছগণের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন। রামায়ণ মহাভারতে প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের সীমা নির্দেশিত হয়নি। কিন্তু পুরাণতন্ত্রাদিতে এই রাজ্যের সীমা

যথাযথভাবে নির্দেশিত হয়েছে। কালিকাপুরাণের ৩৮/১২১ অধ্যায়ে নির্দেশিত সীমা অনুসারে—

করতোয়া সত্যগঙ্গা পূর্বভাগাবধিশ্রিতা ।
যাবল্ললিতকান্তাস্তি তাবদ্দেশং পুরং তদা ॥

সত্যগঙ্গা করতোয়া থেকে পূর্বদিকে ললিতকান্তা পর্যন্ত এই পুর (নগর) বিস্তৃত।

যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের চতুঃসীমা এইরূপে বর্ণিত হয়েছে—

নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রিং ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমম্ ।
করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিকরবাসিনীম্ ॥
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াতু পশ্চিমে ।
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্বস্যাং গিরিকন্যাকে ॥
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়া সঙ্গমাবধি ।
কামরূপ ইতি খ্যাতঃ সর্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ ॥
ত্রিংশৎ যোজনং বিস্তীর্ণং দীর্ঘেণ শতযোজনম্ ।
কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকারমুত্তমম্ ॥

করতোয়া থেকে দিক্করবাসিনী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ কামরূপ, ইহার উত্তরে কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়া নদী, পূর্বসীমায় তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ ও লাক্ষা নদীর সঙ্গমস্থল। এই ক্ষেত্র ত্রিকোণাকার বিশিষ্ট এবং দৈর্ঘ্য শতযোজন (৮ মাইল × ১০০ = ৮০০ মাইল) এবং প্রস্থ ত্রিশ যোজন (৮ মাইল × ৩০ = ২৪০ মাইল)।

পুরাণতন্ত্র ছাড়াও কালিদাসের রঘুবংশে উল্লেখ পাওয়া যায় যে প্রাগ্‌জ্যোতিষ ও কামরূপ একই রাজ্য। বাণভট্টের হর্ষচরিতে উল্লেখ আছে যে কুমার ভাস্করবর্মা হর্ষদেবের নিকট দূত পাঠিয়ে সেই নরকাসুরের সময়ের শ্বেতছত্র উপহার দেন। চীনদেশীয় পরিব্রাজক হুয়েন শাঙ এই ভাস্করবর্মার সময়ের কামরূপের সভ্যতা বর্ণনা করেছেন। তাঁর বিবরণে কামরূপের বেষ্টনী ১০০০০ লী অর্থাৎ ১৬৬৭ মাইল বলে উল্লিখিত। এর সঙ্গে যোগিনীতন্ত্রে উল্লিখিত কামরূপের বেষ্টনী ১৭০০ মাইল সামঞ্জস্যপূর্ণ।

গেইটের আসামের ইতিহাস-এ উদ্ধৃত অংশ থেকে জানা যায় যে, ব্রহ্মপুত্রনদের তীরবর্তী ভূভাগ, ভোটানরাজ্য, রঙ্গপুর ও কোচবিহার এই কামরূপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। গুণাভিরাম বড়ুয়ার আসাম বুরুঞ্জী থেকেও দেখা যায় যে ব্রহ্মপুত্রনদের তীরভূমি, রঙ্গপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি সম্পূর্ণরূপে প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত ছিল। কমরূপের সীমারেখা নির্দ্ধারণে প্রধান দুই নদি ব্রহ্মপুত্র ও করতোয়া বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মপুত্র নিয়ে কোন সংশয় নেই। ব্রহ্মপুত্র আজও অসম তথা সমগ্র ভারতের বৃহৎ নদনদীগুলির মধ্যে একটি। করতোয়া কিন্তু আজ প্রায় অস্তিত্ব বিহীন অতি শীর্ণকায়া একটি জলধারা মাত্র। কিন্তু কামরূপের গৌরবময় দিনে করতোয়া ছিল অতি গুরুত্বপূর্ণ নদী। ভৌগোলিক, রাজনৈতিক এবং বাণিজিক বহু বিষয়ে ছিল করতোয়ার বিশেষ ভূমিকা। অতীতযুগে করতোয়া পবিত্রতায়, গমনক্ষিপ্রতায় ভাগীরথীর চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বেদে এই নদী "সদানীরা" এবং পুরাণে "করতোয়া" নামে প্রসিদ্ধ। করতোয়া মাহাত্ম্যে ৬৩ শ্লোকে বর্ণিত হয়েছে—

করতোয়ে সদানীরে সরিৎশ্রেষ্ঠে সুবিশ্রুতে।
পৌণ্ড্রান্ প্লাবয়তে নিত্যং পাপং হর করোদ্ভবে ॥

১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে রঙ্গপুরের নদীর বিবরণ দিতে গিয়ে ফ্রান্সিস্ বুকাননও করতোয়ার উচ্ছ্বসিত বর্ণনা দেন এবং এই নদীর গুরুত্ব আলোচনা করেন।

করতোয়া সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য—

"The Karotoya, which at the commencement of the degenerate age (Kaliyuga) formed the boundary between the dominions of Bhagadatta and those of Virat, now forms part of the boundary between this district (Rangpur) and that of Dinajpur."

প্রাচীনতম এই প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের কামরূপ আখ্যা সর্বপ্রথম পাওয়া যায় পুরাণতন্ত্রাদিতে। গরুড়পুরাণের বক্তব্য—"কামরূপং মহাতীর্থং কামাক্ষা তত্র তিষ্ঠতি"। মৎস্যপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, কালিকাপুরাণ প্রভৃতিতে কামরূপের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। প্রাচীনতম এই রাজ্যের "কামরূপ" নামকরণের কারণ ও বৈশিষ্ট্য কি? এই নামকরণের কারণ পাওয়া যায় কালিকাপুরাণে। হরকোপাননে ভস্মীভূত কামদেব এই স্থানে পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হন বলে এই স্থানের নাম হয় কামরূপ। উক্ত পুরাণের ৩৭ অধ্যায়ে আছে যে, কামরূপে অবস্থান করেই ব্রহ্মা নক্ষত্র সৃষ্টি করেছিলেন বলে তার প্রাচীন নাম হয় প্রাগ্‌জ্যোতিষ।

সুতরাং দেখা যায় যে পুরাণকারদের মতে কামদেব থেকেই কামরূপ। এ সম্পর্কে এই অঞ্চলে প্রচলিত জনমত ও বিশ্বাস এই যে সতীর দেহত্যাগের পর শোকাতুর শিব নীলাচল পাহাড়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন। তাঁর ধ্যান ভাঙ্গাবার জন্য দেবতারা চেষ্টা করে চলেছেন। শিবের মনে কামনা উদ্রেক করার জন্য প্রেমের দেবতা কাম বা মদনকে পাঠানো হল। কামের উপস্থিতিতে ধ্যানমগ্ন শিব বিরক্তি বোধ করলেন এবং ক্রুদ্ধ শিব এক সময়ে মদনকে ভস্ম করে ফেললেন। মদন ভস্ম হয়ে যাবার পর স্বামী বিরহিণী রতি স্বামীর জীবন ফিরে পাবার জন্য শিবের স্তুতি শুরু করলেন। রতির আরাধনায় শিব সন্তুষ্ট হলেন। মদনের পুনর্জন্ম ঘটল। সেই পূর্বের রূপই ফিরে

পেলেন তিনি। সেই থেকেই এই স্থানের নাম হল কামরূপ। এই প্রচলিত জনশ্রুতির উপর এই অঞ্চলের মানুষের অগাধ বিশ্বাস।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে শিব এই অঞ্চলের মানুষের প্রধান উপাস্য দেবতা। এখানকার রাজপরিবার শৈব। শুধু তাই নয়, কোচ রাজবংশের প্রথম রাজার জন্ম শিবের ঔরসে বলেও কিংবদন্তি প্রচলিত। এখানে সাধারণ গৃহস্থেরা কোনও শুভকর্ম শুরু ও শেষ করেন শিবপূজায়। শিব সম্পর্কিত সবচেয়ে জনপ্রিয় কাহিনী মদন ভস্ম ও মদনের পুনর্জন্ম এই অঞ্চলে জনশ্রুতি লাভ করবে এ বিষয়ে তাই কোন সন্দেহ নেই। তৎকালীন কামরূপের সর্বত্র শিবমন্দিরের ছড়াছড়ি। এই অঞ্চলের শিবমন্দিরগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বাণেশ্বর, জল্পেশ্বর, ষণ্ডেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, হরিহর, দামেশ্বর, হিরণ্যগর্ভ শিব, অনাথনাথ শিব, জয়ন্তীর মহাকাল শিব ইত্যাদি। উপরন্তু এই জনশ্রুতির ভিত্তিকে দৃঢ় করেছে ব্রহ্মপুত্র সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমুহ, বিশেষ করে গৌহাটির অনতিদূরে অবস্থিত মদনকামদেব। প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে মদনকামদেবকে অসমের খাজুরাহো বলা হয়।

মদনকামদেবের দূরত্ব গৌহাটি থেকে মাত্র ৪০ কিমি। ছোট টিলার পেছনে উন্নত শিখর সবুজ পাহাড়। আর এখানেই রয়েছে অজানা শিল্পীর পাথরে খোদিত অনন্য শিল্প। রয়েছে সিংহের মূর্তি, বিদ্যাধরী, নৃত্যরতা পরী, বিভিন্ন দেবদেবী, জন্তুজনোয়ার ইত্যাদি মূর্তির অপূর্ব সমারোহ। কিন্তু শিল্পীগণ এখানেই থেমে থাকেননি। পাথরের বুকে ছেনি চালিয়ে তাঁরা তৈরি করেছেন ছয় মস্তক বিশিষ্ট ভৈরবের মূর্তি, চতুর্ভুজ শিব, বিকট দর্শন রাক্ষস, বিচিত্র অথচ বর্ণময় বিষধর ভুজঙ্গ, নরনারী ও পশু পাখী। শুধু তাই নয় তৈরি করেছেন রতিক্রিয়ারত অসংখ্য নরনারীর মূর্তি যা একমাত্র খাজুরাহোকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। মূর্তিগুলিতে দেখা যায় মানুষের চিত্ত দৌর্বল্যের বিভিন্ন দিক। প্রতিটি মূর্তিতে ধরা পড়েছে ভয়, সন্দেহ, ঈর্ষা, প্রেম ও ভালবাসা। এরই নাম মদনকামদেব। এই মদন কামদেব বহুদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। ১৮৫৫ সালে ক্যাপ্টেন ড্যালটন এই মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের কথা উল্লেখ করেন মাত্র। পরবর্তীকালে বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রদ্ধেয় তারিণী কান্ত শর্মা মদন কামদেব মন্দিরের প্রতি বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং রাজ্য সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক মন্দির ধ্বসে পড়েছে—অনেক মূর্তি নষ্ট হয়েছে ও চুরি হয়ে গেছে। অনুমান করা হয় যে দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে মন্দিরগুলি নির্মাণ করা হয়। কামরূপে তখন রাজত্ব করতেন পাল বংশীয় রাজা। এক সময় প্রায় কুড়িটি শিব মন্দির ছিল এই চত্বরে।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে পাথরের বুকে এমন মিথুনলীলার প্রকাশের এবং মানুষের জৈবিক প্রকরণের উজ্জ্বল ছবি রচনার প্রেরণা কোথা থেকে এসেছে? এই প্রশ্নের উত্তর

পাওয়া কঠিন। শুধু অনুমান করা যেতে পারে যে মহাদেবের শিব ও রুদ্র রূপ প্রকাশের সবচেয়ে সুন্দর অবতারণা মদন ভস্ম ও মদনের পুনর্জন্ম—অর্থাৎ কামরূপ এই জনপদের অধিবাসীদের কাছে ছিল অতি প্রিয় আখ্যান এবং তারই প্রকাশ ঘটেছে মদন-কামদেব মন্দিরের গায়ে গায়ে। মদন কামদেবের প্রভাব এখানে এতই প্রবল ও ব্যাপক ছিল যে এই জনপদের সর্বত্র এক সময়ে মদন কামদেবের পূজা এবং সেই পূজা উপলক্ষ্যে কামদেবের গান (যাকে সাধারণ জনগণের উচ্চারণে শোনাত কান্দেবের গান) ছিল ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

১৩১৫ বঙ্গাব্দে রংপুরের সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় কামদেবের পূজার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ। চৈত্রমাসের শুক্লাত্রয়োদশী তিথিতে কামদেবের পূজা করিবার ব্যবস্থা আছে। পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের মূলে কামদেবের পূজা করিতে ও তাঁহাকে চামর বা ব্যজন দ্বারা ব্যজন করিতে হয় ; শাস্ত্রের এই ব্যবস্থা। তর্করত্ন মহাশয় এই পূজা শুধু রঙ্গপুরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা বলেছেন। রঙ্গপুর ছাড়াও কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, গোয়ালপাড়া, কামরূপ প্রভৃতি অঞ্চলেও এই গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক পঞ্চানন সরকার যিনি পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সামাজিক রাজনৈতিক জননেতা রূপে রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা নামে পরিচিত হন, তাঁর অভিমত—"জাগ গান শুধু রঙ্গপুরের নহে। রঙ্গপুর, ধুবরী, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি প্রভৃতিতে শুনা যায়। মদন চতুর্দ্দশী উৎসব উপলক্ষেই জাগ গান রচিত। জাগের গান রঙ্গপুরাদি স্থানের অথবা কামতাবিহারী ভাষার গান। কামতাবিহারী ভাষার উচ্চারণ অপর স্থানের উচ্চারণ হইতে অল্পবিস্তর পৃথক। অথচ বর্ণমালা এক। সুতরাং বর্ণমালার উচ্চারণ দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন।"

বাঁশ পূজার গান বা মদনকামের গান বা জাগ গান ঃ পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নের বর্ণনা ও ক্ষেত্রসমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী রাজবংশী অধ্যুষিত এই অঞ্চলে বসন্তকালে ব্যাপকভাবে বাঁশ পুজো করা হত। এখনও এই পূজোর রেশ চলে আসছে। সঙ্গতি সম্পন্ন প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়িতে তুলসীতলা এই অঞ্চলের সংস্কৃতির অঙ্গ। চৈত্র মাসের মদন চতুর্দশী তিথিতে রতির দেবতা মদনকাম পূজা উপলক্ষে লম্বা লম্বা (২০ ফুট থেকে ২৫ ফুট) বাঁশের মাথায় চামর বেঁধে বাঁশগুলোকে লাল শালু কাপড়ে মুড়িয়ে তুলসী তলায় দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। কোথাও বা বাড়ির বাইরের উঠোনে এই বাঁশ প্রোথিত করে পূজা হয়। দুপুর ও সন্ধ্যা দুবেলা চালের গুড়া ও দুধ সহযোগে নাড়ু তৈরি করে পূজো দেওয়া হয়। অনেক সময়ে নাড়ুতে ভাঙ মেশানো হয়। সাধারণত সন্ধ্যাবেলা সব গৃহস্থের বাড়ি থেকে বাঁশ নিয়ে যাওয়া হয় গ্রামের কোনও নির্দিষ্ট জলাশয়ে। বাঁশের মাথায় বাঁধা চামর ভিজিয়ে বাঁশ ঠাকুরকে জল পান করানো হয়। তারপর সেখানে চলে বাঁশ হাতে নিয়ে নৃত্যগীত। প্রসঙ্গত

উল্লেখ্য যে, মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড় অঞ্চলেও বাঁশ গীত নামে এক প্রকার গান প্রচলিত আছে। লম্বা সরু বাঁশের বাঁশি সহযোগে রাউত গোয়ালা সম্প্রদায়ের মধ্যে এই গান প্রচলিত। তবে এই বাঁশ গীতে বাঁশ পূজার কোনও উল্লেখ নেই।

যাঁরা এই বাঁশ হাতে নিয়ে জলাশয়ে যান বা নৃত্যগীত করেন তাঁরা সকলেই নিরামিষ আহার করে সাত্ত্বিক নিয়ম নীতি পালন করেন। কোমরে কাপড় বেঁধে বাঁশ হাতে নিয়ে দল বেঁধে বাড়ি বাড়ি মাগন করার রীতিও প্রচলিত রয়েছে কোনও কোনও অঞ্চলে। ঢাক, ঢোল, করকা, শানাই ও কাঁসি সহযোগে বাজনার সঙ্গে মদনকামের গান ও নাচের জন্য প্রয়োজন পূর্ণ যৌবনের শক্তি। বাঁশ হাতে নিয়ে অথবা খালি হাতে ভক্ত্যারা ঢোল, করকা, শানাই কাঁশির বাজনার সঙ্গে নাচ করে। ৮/১০ জন ভক্ত্যার সঙ্গে থাকে এক দু'জন দোয়ারি। একজনের হাতে থাকে বেল কাঠের শিব লিঙ্গ একটি বাঁশখণ্ডের ভেতরে। পুজোর পরে বিসর্জনের ব্যবস্থা। পূর্ণিমার দিন অনেক গৃহস্থের বাড়ি থেকে বাঁশ নেওয়া হয় গ্রামের কোনও নির্দিষ্ট স্থানে যাকে বলা হয় বাঁশের 'থলা'। 'থলা'তে চলে বাঁশ নিয়ে নাচ গান-বরং বলা যেতে পারে নাচ-গানের প্রতিযোগিতা বিভিন্ন দলের মধ্যে। এই গানের মূল গায়ক হাতে চামর নিয়ে গান করে এবং বাকিরা দোহার ধরে। পদ্মপুরাণ, কুশান, দোতবা প্রভৃতি গানে দোয়ারি বা বৈরাগির মত জাগ গানেও একজন প্রধান দোহার থাকে ; কবিত্ব গুণ ও হাস্যরস পরিবেশন গুণ সম্পন্ন তাকে বলা হয় মতিহারি। মতিহারির এক হাতে একটি কাষ্ঠখণ্ড ও অন্য হাতে থাকে একটি কাঠের হাতুড়ি। গানের মধ্যে মধ্যে মতিহারি ঐ কাষ্ঠখণ্ড বা ডাস্কালিতে আঘাত করে নানা ধরনের শোল্লোক বলে। দলে মেয়ের বেশধারী ছোকরা মতিহারির সঙ্গে শোল্লোকের লড়াই করে। এই শোল্লোক অধিকাংশ সময়ে অশ্লীল কথায় ভরা থাকে। সাধারণতঃ বসতি অঞ্চল থেকে দূরে এই থলার আয়োজন করা হয় কারণ গানের মধ্যে অনেক অশালীন কামোদ্দীপক কথা ও নাচের মধ্যে তদ্রূপ অঙ্গভঙ্গি এই অনুষ্ঠানের বিশেষ অঙ্গ। কামকে জাগানোর কথা ও অঙ্গভঙ্গি জড়িত বলেই বোধ হয় এই গানের নাম জাগ গান। গানে ঘট সৃজন, মৃত্তিকা সৃজন, কামদেব সৃজন আদি বিবরণ আছে। বাঁশের জন্ম-কথা, কার্পাস খেতি, কার্পাস থেকে কাপড় তৈরি ইত্যাদির আদি কথাও গাওয়া হয় বাঁশ পূজার গানে। অশালীনতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে এই গানকে 'মোটা জাগ ও সরু জাগ' এই দুভাগে ভাগ করা হয়।

মধ্যপ্রদেশের ছত্তিশগড় অঞ্চলে ডালখাই নামক হোলি অনুষ্ঠান-ভিত্তিক গানের ক্ষেত্রেও এই একই মনোভাব লক্ষণীয়। ৮ বছর থেকে ১৪ বছর বয়স্কা দশ-বারো জন আদিবাসী মেয়ে জনবসতির থেকে দূরে ফাঁকা মাঠে সারাদিন ধরে ডালখাই গীত ও নৃত্যের মাধ্যমে এই উৎসব পালন করত। ঢোল ও সানাই বাজানোর ও গানের জন্য জনা তিন/চার সহশিল্পী ছাড়া অন্য কোনও পুরুষের অংশ গ্রহণে অনুমতি নেই।

এই গীতে কিছু কিছু কথা এবং নাচে কিছু ভঙ্গি ব্যবহৃত যা তথাকথিত অশ্লীল পর্যায়ের। এবং এই কারণে ডালখাই গীত এখন অবলুপ্তির পথে। কারণ স্বল্প ও অর্ধশিক্ষিত অনাদিবাসী গ্রাম্য নেতারা এই উৎসব ও গীত বন্ধ করে দিয়েছে অশ্লীলতার অভিযোগে।

এই গানের নাম জাগ গান হল কেন এ বিষয়ে কোচবিহার জেলার ধুমপুর গ্রাম নিবাসী শ্রী নিত্যানন্দ অধিকারীর কাছ থেকে একটি কাহিনী পাওয়া গেছে। শ্রী অধিকারী এই কাহিনীটি শুনেছিলেন দীর্ঘদিন পূর্বে মুকুন্দ মালাকার নামে এক বৃদ্ধ ওস্তাদের কাছ থেকে। কাহিনীটি নিম্নরূপ ঃ—

দেবাদিদেব মহাদেব এক সময়ে নটরাজ মূর্তি ধারণ করে দেব সমাজে নবরাগের নাট্যাভিনয় করেছিলেন। নায়ক স্বয়ং মহাদেব—নায়িকা মাতা চণ্ডী। উপনায়ক মদনদেব এবং উপনায়িকা কামপত্নী রতি। শান্ত, বীর, শৃঙ্গার, হাস্য, ভয়ানক, করুণ, বীভৎস, রৌদ্র, চিন্তা—এই নবরসের মধ্যে মহাদেব প্রথমে শান্ত রসে নৃত্য শুরু করলেন—চণ্ডী নৃত্যে যোগদান করলেন। এক সময়ে কামদেবের আদেশে রতি শৃঙ্গার রসের নৃত্য আরম্ভ করলেন। মদনদেব সবাইকে কামনার শর নিক্ষেপ করলেন। তাতে মহাদেব কামে উত্তেজিত হয়ে দিগ্‌বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়লেন—রৌদ্ররসের আবির্ভাব হল। তাঁর ত্রিনয়নে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হল এবং সেই আগুনে কামদেব ভস্মীভূত হলেন। তখন কাম পত্নী রতি দেবতাদের নিকট স্বামীর প্রাণভিক্ষা করলেন। কাম নিন্দনীয় হলেও কাম-শূন্য পৃথিবী কল্পনা করা সম্ভব নয়। উক্ত মদন চতুর্দশীতে দেবতাগণ সকলে মিলে মহাদেবের কাছে মদন কাম দেবের প্রাণ ভিক্ষা মাগেন এবং সারারাত জেগে ভস্মীভূত মদনকে পুনঃ জাগ্রত করেন। এই কাহিনী থেকেই পূর্বকালের পল্লী কবিরা জাগ গান রচনা করেছিলেন। জাগ অর্থ জাগরণ অর্থাৎ কাম জাগরণী শব্দ থেকে জাগ গানের সৃষ্টি।

সরু জাগের মধ্যে "কানাই ধামালী" বা "লীলা জাগ" বিশেষ রূপে খ্যাত। এগুলি সম্পূর্ণ অশ্লীলতা দোষ-বর্জিত না হলেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংযত ভাষায় রচিত। এই 'কানাই ধামালী' বা 'লীলা জাগ' আবার অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পালায় বিভক্ত। এক একটি পালায় শ্রী কৃষ্ণের বিশেষ বিশেষ লীলার বর্ণনা আছে। তবে কৃষ্ণ আখ্যান এখানে নিরক্ষর গ্রাম্য কবির কল্পিত রচনা-পুরাণ বা মহাভারতের কৃষ্ণ নয়। এই পালাগুলির নায়ক কৃষ্ণ উত্তরবঙ্গের গ্রামের সাধারণ যুবকের প্রতিনিধি বললে অত্যুক্তি হবে না।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ভাওয়াইয়া শৈলীর গানের সংগ্রহ ও সংকলনে প্রথম স্থান পেয়েছে জাগ গান। ১৯০৮ সালে (বাংলা ১৩১৫ সালে) পণ্ডিতরাজ যাদবেশ্বর তর্করত্ন রংপুরের জাগ গান সংগ্রহ করে রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশ

করেন। তাঁর সংগৃহীত এবং সংকলিত জাগ গানের রচয়িতার নামও তিনি পেয়েছেন রচনার ভণিতা থেকে। রংপুর জেলার ইটাকুমারী গ্রামের রতিরাম দাস। পূর্ণ রচনাটিকে তর্করত্ন মশাই কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন আখ্যানগুলির উপর ভিত্তি করে—(১) রাধার শাক তোলা (২) কৃষ্ণের ধোরে মাছ মারা (৩) কৃষ্ণের বড়শীতে মাছ ধরা (৪) রাস। 'রাস' আখ্যান ভাগে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বর্ণনার শেষে নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে রচয়িতা রতিরাম দাস তার গ্রামের ভৌগোলিক; অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থা অতি নিপুণভাবে বর্ণনা করেছেন। এই জাগের গানে ১৭৮৩ সালে রংপুর কালেক্টর নিযুক্ত অত্যাচারী ইজারাদার দেবী সিংহের প্রজাপীড়ন ও তার বিরুদ্ধে প্রজা বিদ্রোহের নিপুণ ছবি পাওয়া যায়।

রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় ১৩১৬ বঙ্গাব্দে সংকলিত হয়েছে পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ কর্তৃক সংগৃহীত নাম না জানা কোনো গ্রাম্য কবির রচিত আর একটি জাগ গান—"কৃষ্ণের বংশী সৃজন" যাতে রয়েছে শ্রীরাধাকে বশ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে বাঁশির সৃষ্টি করেন তার নিখুঁত বর্ণনা।

বিশ্বনাথ দাস সম্পাদিত কোচবিহারের প্রাচীন কথা গ্রন্থে কোচবিহারের লেখক জনাব ফয়েজ উদ্দিন আহমদ্-এর লেখা 'সেকালের পল্লীসমাজ' প্রবন্ধ থেকে তৎকালীন রাজবংশী সমাজে প্রচলিত মদন কাম পূজা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তাঁর জবানিতে "এখানে হিন্দুদিগের মধ্যে মদন পূজার বড় ধুম। মুসলমানের 'শয়তান' আর এই 'মদন' প্রায় একই স্বভাব বিশিষ্ট। উভয়েই মানসকে অসৎকর্মে প্রবৃত্তি দেয়, সাধারণের ইহাই বিশ্বাস। শয়তান মুসলমান ঘৃণিত। শিক্ষিত হিন্দুগণও মদনকে ঘৃণা করেন। কিন্তু কুচবিহারবাসী হিন্দুগণ মদনের বড়ই ভক্ত। .... চৈত্রমাসে এই মদন বা কামদেবের পূজা হইয়া থাকে। যেমন দেবতা, পূজাও তেমনি অদ্ভুত, অশ্লীল। ঐ উৎসবের কয়েক দিবস কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবক সকলেই নেংটি পরিয়া গায়ে কালি মাখিয়া পুরণো বস্তা, কন্থা প্রভৃতি কোমরে বাঁধিয়া অশ্লীল অশ্রাব্য গানে দশদিক মুখরিত করিয়া দলবদ্ধ হইয়া গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। স্থানীয় হাটে বহু দল একত্র হইয়া বিকট ভঙ্গীতে নৃত্য করিয়া গ্রামের গুপ্ত-ব্যভিচার কাহিনী ছন্দে গান করিয়া প্রকৃতির শ্রোতৃমণ্ডলীর আনন্দোৎপাদন করিয়া থাকে। এই সময়ে ভদ্র ও পবিত্রচেতা পল্লীবাসীগণ হাট হইতে দ্রুত গৃহে চলিয়া যায়। বাড়ীর নিকটেও কোন কোন গ্রামে এইরূপ মিছিল হইয়া থাকে। তখন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেক লোক দল বাঁধিয়া এই সকল উন্মত্ত লোককে আক্রমণ করিতে আসেন। আমি নিজ চক্ষে এই বৎসর এইরূপ একটি তুমুল বিবাদ দেখিয়াছি। আমি বালক সুলভ চপলতা হেতু নির্লজ্জের ন্যায় কোন বৎসর ঐ সকল মিছিল দেখিতে যাই। এই উৎসবের ফলে অল্প বয়সের ছেলেগুলিও অশ্লীল কথা ও ঘৃণিত কার্য শিখিবার সুযোগ পায়। এই উৎসবের প্রতিহার এযুগে নিতান্ত আবশ্যক।"

উপরের বর্ণনা থেকে একথা পরিষ্কার যে লেখক এখানে মদনকাম বা বাঁশ পূজা উপলক্ষ্যে বাঁশ পূজার ভক্ত্যারা নাচ গান করে যেভাবে বাড়ি বাড়ি মাগন করে বেড়ায় তার উল্লেখ করেছেন। মূল গানের ফাঁকে ফাঁকে হাস্যরস পরিবেশনের জন্য অথবা গ্রামের কোনও ব্যক্তির (সম্ভ্রান্ত বা দরিদ্র কৃষক, শ্রমিক যাই-ই হোন না কেন) অপকীর্তি, কেচ্ছা বর্ণনা করতে গিয়ে নানা ধরণের অশ্লীল কথা ব্যবহার করে, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গিতে নাচ গান করে। উচ্চকোটির তথাকথিত শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিতদের মাপকাঠিতে অশ্লীলতা দোষে দুষ্ট বলে "শিক্ষিত হিন্দুগণ মদনকে ঘৃণা করেন"। এই শিক্ষিত হিন্দুগণ বলতে লেখক বোধ হয় বোঝাতে চেয়েছেন রাজবংশী জনগোষ্ঠীর বাইরের তথাকথিত বহিরাগত মানুষদের। কেননা পরের বাক্যেই তিনি লিখেছেন "কিন্তু কুচবিহারবাসী হিন্দুগণ মদনের বড় ভক্ত।" মাগনকারী ভক্ত্যাদের বেশভূষার বর্ণনা অনেকটাই নিখুঁত। ধুলো কাদা বালিতে হেঁটে হেঁটে গ্রাম গ্রামান্তরে মাগন করে বেড়াতে হয় : শুধু তাই নয় ধুলো বালির উঠোনে মাটিতে বসে শুয়ে, গড়াগড়ি দিয়ে নাচগান করতে হয় ; তাই ভালো পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। তাছাড়া এই মানুষগুলোর অধিকাংশই নৃত্যগীত প্রিয় খেটে খাওয়া অতি দরিদ্র কৃষক-শ্রমিক। নেংটি বা গামছা ছাড়া তাদের নেই কিছু। তাদের এই অসামর্থ্যের সঙ্গে যুক্ত মদনকাম পূজার মানসিক আবেগ। মদনকাম পূজার সঙ্গে শিব ভোলানাথের সম্পর্ক হেতু ভক্ত্যারা নিজেদেরকে শিবের ভক্ত-ভূত, প্রেত ইত্যাদির সমতুল্য করে ধুলো, বালি, কালি মেখে, জরাজীর্ণ বস্ত্রাদি, ছেঁড়া বস্তা, ছেঁড়া মাছ ধরার জল ইত্যাদি পরে মাগন করে বেড়ায়।

প্রবন্ধকার জনাব আহমদ তাঁর স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা একটা ঘটনার উল্লেখ করেছেন যেখানে সম্ভ্রান্ত পরিবারের অনেকে দল বেঁধে নৃত্য গীত রত এই ভক্ত্যাদের আক্রমণ করেছিল। আমার ধারণা প্রবন্ধকার অত্যুক্তি করেছেন। এবং সেটা খুবই পরিষ্কার মদনকামের নৃত্য গীত সম্পর্কে তাঁর এই মন্তব্য থেকে—"এই উৎসবের ফলে অল্প বয়সের ছেলেগুলিও অশ্লীল কথা ও ঘৃণিত কার্য্য শিখিবার সুযোগ পায়। এই উৎসবের প্রতিহার এ যুগে নিতান্ত আবশ্যক।" সুস্পষ্টতই প্রবন্ধকার তথাকথিত শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীর প্রভুত্বকারী নন্দনতত্ত্বের আদর্শের শিকার। তাঁর মত সম্ভ্রান্ত পরিবারের সৌন্দর্যবোধের দৃষ্টিতে তিনি এই সংগীত নৃত্যের, যাতে ঘটেছে রাজবংশী মানসিকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতিফলন তার মূল্যায়ন করেছেন। সাধারণ্যের শিল্পসৌন্দর্যবোধ কিন্তু এই উৎসবকে উপলক্ষ করে যে সঙ্গীত নৃত্য তাকে কখনো ঘৃণা ভরে দেখে নি—বরং তারা এতে প্রভূত আনন্দলাভ করেছে। এই উৎসব সাধারণ্যের কাছে এতই প্রিয় ও মহত্ত্বপূর্ণ যে রাজবংশী হিন্দু ছাড়া রাজবংশী সংস্কৃতির বাতাবরণে লালিত পালিত এই অঞ্চলের মুসলমানগণও এই উৎসবে অংশ গ্রহণ করত। জনাব আহমদ নিজেই সে কথার উল্লেখ করেছেন।

পূজা এবং তৎ-সংক্রান্ত আনন্দোৎসব ছাড়াও এই আঙ্গিকের লোকসংগীত ও নৃত্য আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। লোক সংস্কৃতির একটি বড় ভূমিকা সংযোগ (Communication) মাধ্যম হিসেবে কাজ করা। গ্রামে সারা বছর কী ধরনের ঘটনা ঘটেছে-কোন্ "মহাপুরুষ" কী অপকর্ম করেছেন-অর্থাৎ ভালো মন্দ ঘটণার উল্লেখ ও বিবরণ কবিত্বগুণ সম্পন্ন শিল্পীরা মুখে মুখে রচনা করে তাতে সুর সংযোজন করে এই উৎসবে পরিবেশন করে। জনাব আহমদের উদ্ধৃতি থেকে একথা পরিষ্কার যে নাচ গানের ফাঁকে ফাঁকে এই ধরনের কেচ্ছা/ঘটনা পরিবেশন মদনকাম উৎসবের একটা অঙ্গ। বলার অপেক্ষা রাখে না যে অতি দরিদ্র সমাজের একেবারে নীচুতলার এই শিল্পীদের কাছে সেখানকার তথাকথিত অভিজাত শ্রেণীর কোনও জমিদার/জোতদার-সম্পর্কিত মুখরোচক কেচ্ছাই ছিল প্রিয় বিষয় যা নিয়ে তারা গান বেঁধে সোল্লাসে গাইত এই অনুষ্ঠান গুলিতে। স্বাভাবিক কারণেই এই কেচ্ছার বিবরণে বাড়াবাড়ি ঘটলে অভিজাত শ্রেণীর পক্ষে তা সহ্য করা কঠিন হয়ে পড়ত এবং তার ফল হত বিবাদ বিসম্বাদ, কথা কাটাকাটি মন কষাকষি ইত্যাদি। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই সব জোতদার জমিদারদের অধিকাংশই ছিলেন চরিত্রদোষে দুষ্ট এবং স্বভাবতই তাদের প্রজা শোষণ বা নারীঘটিত কেচ্ছার অভাব ছিল না।

এই প্রসঙ্গে লোকসংস্কৃতির সৌন্দর্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। নন্দনতত্ত্বের সার্বজনীন সত্য এই যে মানবজাতির কোনো অখণ্ড বা নির্বিশেষ নন্দনতত্ব নেই। সৌন্দর্যের বোধ কোনো অখণ্ড, সার্বভূমিক, শ্রেণী উত্তীর্ণ নির্বিশেষ ধারণা নয় বরং তা শ্রেণীতে শ্রেণীতে, গোষ্ঠীতে-গোষ্ঠীতে সমাজে-সমাজে-এমনকি ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কমবেশি পৃথক। একজনের কাছে সুন্দর অপরজনের কাছে সুন্দর নাও হতে পারে। সারা পৃথিবীর নাগরিক, মধ্য ও উচ্চবিত্ত লেখাপড়া-করা মানবসমাজ যে সৌন্দর্যতত্ত্ব গড়ে তুলেছে সেই নন্দনতত্ত্বের সঙ্গে গ্রামীণ নিরক্ষরের নন্দনতত্ত্ব এক হতে পারে না, শ্রমিকের নন্দনতত্ত্ব ও মালিকের নন্দনতত্ত্ব এক হবে না। অথচ ভদ্রলোকের অর্থাৎ সমাজের উচ্চ এবং প্রধানত অবসরভোগী শ্রেণীর রুচি-যে রুচি শ্লীল-অশ্লীল, গ্রাম্য-অগ্রাম্য ইত্যাদি প্রশ্নকে তার নিজের মতো বিচার করে, সেই রুচির নন্দনতত্ত্বের সূত্র আরোপিত আদর্শের সঙ্গে যা মিলবে না তা খারাপ এবং দরকার হলে ওই খারাপ গুলির উপর হাত চালিয়ে (intervention-এর দ্বারা) সেগুলিকে গৃহীত নন্দনতত্ত্বের অনুমোদিত চেহারা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। তাঁর ফলে অপ্রধান নন্দনতত্ত্ব, অর্থাৎ আদিবাসী দলিত গ্রামীন জনগোষ্ঠীর নন্দনতত্ত্ব আমাদের কাছে অপূর্ণ, অপরিণত, অনুকম্পাযোগ্য বা অবজ্ঞেয় মনে হয়। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন শৈলীর সৌন্দর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে তাতে ছন্দ মিল আছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অলংকার আছে, বিশেষত উপমা মেটাফর ইত্যাদি আছে, কিন্তু নন্দনতাত্ত্বিক সমালোচনার প্রয়োজনীয় মানবরস বা ভিতরকার সৌন্দর্য্য



বাঁশ পূজা

তাতে সর্বদা খুঁজে পাওয়া কঠিন। তার কারণ স্রষ্টাদের কোন পরিকল্পনাই ছিল না এগুলোকে শিল্প করে তোলার, প্রভুত্বকারী নন্দনতত্ত্বের আদলে ফেলে এগুলোকে সুন্দর রূপ দেওয়ার। এখানে ছন্দ মিল এসেছে কখনও খেলার তালে, কখনও স্মৃতিসহায়ক উপায় (memoric device) হিসেবে, কখনও মানুষের ভাষার স্বাভাবিক সৌন্দর্যসৃষ্টির তাগিদে। লোক সংস্কৃতির নিজস্ব একটি নন্দনতত্ত্ব আছে। এই নন্দনতত্ত্ব ভদ্রশ্রেণীর নন্দনতত্ত্ব থেকে স্বতন্ত্র (Autonomous)। অর্থাৎ তার সুন্দর-অসুন্দরকে সমাজের উচ্চশ্রেণীর সুন্দর-অসুন্দরের ছাঁচে ফেলে বিচার করলে লোকসংস্কৃতির উপর অবিচার করা হবে। লোকসংস্কৃতি যে জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘ হাজার বছর ধরে তৃপ্তি দিয়ে এসেছে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মবৃত্তে সন্তুষ্ট। লোকসমাজের ভালোমন্দের বিচার তার নিজের মতো। ভদ্রশ্রেণীর নন্দনতত্ত্বের মুখাপেক্ষী না থেকে সে নিজের নন্দনতত্ত্ব নির্মাণ করেছে যা অপেক্ষাকৃত অনেক উদার।

লোকসাহিত্যের উদারতার একটি লক্ষণ হল তথাকথিত ভদ্রসমাজে গ্রহণযোগ্য নয় এমন শব্দেরও ব্যবহার। এই সব রচনায় গ্রাম্য শব্দ, ব্যাকরণে অগ্রহণ যোগ্য অর্থাৎ ব্যাকরণ দুষ্ট শব্দ, ভদ্রসমাজের রুচির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় এমন সব শব্দ বা প্রতীক প্রয়োগের অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। গ্রামীণ মানুষের স্বাভাবিক ভাষার এই সব শব্দ ভদ্রশ্রেণীর মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে সে সম্বন্ধে রচয়িতা আদৌ সচেতন নয়—নাগরিক নন্দনতত্ত্বের জন্য কোনো সমীক্ষাও এসব রচনায় নেই। যেমন "চোদন" শব্দটির ব্যবহার। উত্তরবঙ্গের গ্রামে প্রচণ্ড ধমক-বকুনি অর্থে এই শব্দটির ব্যবহার বহুল পরিমাণে দেখা যায়। "তোর বাবা কতখান্ থাকি ড্যাকের ধইরছে। যা চোদন-খান্ খাবু এ্যালায়।" অথবা "ঘাটাত্ নাগাল পায়য়া উঁওায় এমন চোদন দিছে"......ইত্যাদি। ব্যাকরণগত অসম্পূর্ণতা, ছন্দমিলের অসমানতা, ভদ্রশ্রেণীর প্রকাশ্য রুচিতে অগ্রহণযোগ্য নানা শব্দের ব্যবহার, নাগরিক রুচিতে অগ্রহণযোগ্য রূপক ও প্রতীক প্রভৃতি লোক সংগীতে অতি স্বাভাবিক ব্যাপার।

এই প্রসঙ্গে ডঃ পবিত্র সরকার রংপুর অঞ্চলের বিয়ের গানের উল্লেখ করে সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন।

একেতো মুসুরি কালাইর আগা ডলমল করে রে
হায়রে মজার ডলন কে ডলিতে পারে রে।
কইনার মাক্ বান্ধিয়া থুনু আড়িয়া গরুর মাঝেরে
চপুরাইতে আড়িয়া শালা হিক্‌রিশ মারিয়া থাকেরে।
কইনার বোইনক্ বান্ধিয়া থুইচোং
ঘোড়াশালের মাঝেরে

চপুরাইতে ঘোড়া শালা চ্যেহে চ্যেহে করে রে।
কইনার মাসিক্ বান্ধিয়া থুইচোং
পাঁঠা ঘরের মাঝেরে
চপুরাইতে পাঠাশালা ম্যাল ম্যালেয়া থাকে রে।

এই গানে যৌবনবতী তরুণীর স্তনকে "মুসুরী কালাইর আগা ডলমল" অর্থাৎ মসুর ডালের লতার অগ্রভাগের মত উচ্ছল বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তার সম্ভাব্য ব্যবহার বিষয়ে সোল্লাসে গাওয়া হচ্ছে এবং অন্তঃপুরিকা মহিলারাই গাইছে এই জীবনোল্লাসের গান—। এমন যে স্তনদ্বয় তার উপযুক্ত পরিচর্যা সম্ভব সেই যৌবনবতীর স্বামীর হাতের চাপে। তার বর্ণনা হয়েছে এভাবে—"হায়রে মজার ডলন কে ডলিতে পারে রে।" গানের পরবর্তী পংক্তিগুলি তথাকথিত ভদ্ররুচির মানদণ্ডে আরও আপত্তিকর। কইনার অর্থাৎ বিয়ের কনের মা, বোন, মাসিকে যথাক্রমে এঁড়ে গরু, ঘোড়া ও পাঁঠা ছাগলের ঘরে বেঁধে রাখা ও তাদের দেখে সেই সব জন্তুর সারা রাত ধরে শৃঙ্গার-স্পৃহার বর্ণনা সোল্লাশে গাওয়া হয়ে থাকে। বরপক্ষের মহিলারা কন্যা পক্ষের মহিলাদের উদ্দেশ্যে এই গান গায়। এই গান কখনো কখনো উদ্দাম আক্রমণাত্মক বর্ণনার রূপ নেয়। যেমন

"বিন্দা নাল কি নাল রে
কইনার মায়ের থোবরা থুবরী বাল
কি বিন্দা নাল কি বিন্দা নাল রে
তাকে দিয়া ছান দেমো বড়ো ঘরের চাল রে।"

এই গানটিতে বলা হয়েছে যে কনের মায়ের দীর্ঘ ও কুঞ্চিত (থোবরাথুবরী) গোপনাঙ্গের কেশ দিয়ে বড়ো ঘরের (অর্থাৎ উত্তরের ঘরের) চাল ছাওয়া হবে। [রাজবংশী সমাজের গৃহস্থের বাড়ীর চারদিকে চারটি ঘর যার মধ্যখানে থাকে একটি উঠোন। বাড়ীর উত্তরের দিকের ঘরে থাকে বাস্তু দেবী বা দেবতার ভিত—সাধারণতঃ মনসা, শ্রীহরি, নারায়ণ প্রভৃতির ভিত। তাই উত্তরের এই ঘরকে বলা হয় বড়ো ঘর]।

উত্তরবঙ্গের লোক সংগীত ভাওয়াইয়া শৈলীর গানে [এই সমাজে প্রচলিত বিধবা বিবাহ যাকে সাঙানি বা কাইন প্রথা বলা হত এবং সেই প্রথায় বিবাহিত স্বামীকে সাঙনা বলা হত] সাঙ্নাকে নিয়ে বেশ কিছু গান পাওয়া যায়। এ ধরনের একটি গানে আছে—

"অকি, ওরে সাঙ্না মারিলু ক্যানে।
ভাতের দুক্খে ওরে সাঙ্না কাইনত্ বসিনু মুই
আজি কোন্ দোষোতে দুয়োর বান্ধি মারলু মোকে তুই
রে সাঙ্না মারিলু ক্যানে।

এই ধরনের বিধবা বিবাহ বা উপ-বিবাহ প্রথা সমাজে স্বীকৃত কিন্তু মোটেই আদৃত নয় বরং নিন্দিত প্রথা। রাজবংশী সমাজের উচ্চ-মহলে অর্থাৎ সঙ্গতিপূর্ণ পবিবারে এই প্রথা বহুলভাবে নিন্দিত ; কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই প্রথা দীর্ঘদিন ধরে এই সমাজে চলে আসছিল। এর কারণ এই গানটির প্রথম পংক্তিতেই আছে। "ভাতের দুক্‌খে ওরে সাঙ্‌না কাইনত্‌ বসিনু মুই"—পেটের জ্বালায়—নিছক জীবনধারণের প্রয়োজনে কাইনে বসেছে অর্থাৎ তার সাঙ্‌নার সঙ্গে স্বামী স্ত্রী হিসাবে বাস করায় সম্মত হয়েছে এই নারী, এই বাল-বিধবা। একটি সন্তান নিয়েই সে এসেছে তার নতুন স্বামীর সঙ্গে ঘর করতে কিন্তু তার সেই সাঙ্‌না যখন তখন যে কোনো অছিলায় তাকে ধরে মারধোর করছে, তার সন্তানকে মারছে। মনের দুঃখে তাই সে অনেক কথাই বলছে। সেও তার সাঙ্‌নাকে শিক্ষা দিয়ে ছাড়বে। চরম শিক্ষা হিসেবে যে শাস্তির কথা সে বলছে তা ভদ্র সমাজের নন্দনতত্ত্বে মোটেই রুচিকর হিসেবে গণ্য হবে না—অথচ এই গান স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে শিল্পীরা অকপটে গেয়ে যান কোনও সৌন্দর্যতত্ত্বের পরোয়া না করেই। গানের শেষ পংক্তিতে আছে—

"রাইতত্‌ এ্যালা তামসা দেকাইম্‌ বিছিনাত্‌ থাকিতে
নিত্যি-পূজার ঠাকুর আজি তোর উপাসে থাকিবে
রে সাঙ্‌না মারলু ক্যানে।"

রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার করে এই গানের স্রষ্টা যা বলতে চেয়েছে তা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে না। তার নিজের সন্তানের প্রতি দুর্ব্যবহারের শাস্তি হিসাবে সে বলছে যে রাতে তাঁর সাঙ্‌নার নিত্যি-পূজার ঠাকুরকে উপোস করে থাকতে হবে অর্থাৎ আজ রাতে সে যৌনসম্ভোগে সম্মতি দেবে না।

এইভাবে বিভিন্ন গানের উল্লেখ করে দেখানো সম্ভব যে শহুরে ভদ্রলোকের রুচির বিচারে নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যায়ন ও লোক সংস্কৃতির নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যায়ন এক নয়—দুয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক।

তবে এই নন্দনতত্ত্বের স্বরূপ যা-ই হোক না কেন সৌন্দর্যসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা লোক সংগীত সৃষ্টিতে লোক মানসে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা থেকে প্রাপ্ত উপরোক্ত জাগ গান গুলি ছাড়াও আমরা বিভিন্নসূত্র থেকে আরও কিছুগান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছি। কোচবিহার অঞ্চলের দু'একজন প্রবীণ ব্যক্তি জাগ গানের সঙ্গে যাদের যোগাযোগ ছিল তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। কোচবিহার খাগরাবাড়ী গ্রামের শ্রী পানিয়া দাস এক সময়ে জাগ গানের দলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

শ্রী দাসের কাছ থেকে "মোটা জাগ'-এর কিছু নমুনা শুনেছি। এখানে তার-দু'একটি উল্লেখ করার সুযোগ থাকছে। বাঁশ পূজা ও গান নিয়ে আমার পিতৃদেবের সঙ্গেও আলোচনা করেছি।

এই গান গুলিতে পাওয়া যায় রাজবংশী গোষ্ঠীর সামাজিক রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থার কিছু ছবি। এই গানগুলি এখানকার আঞ্চলিক ভাষায় রচিত। গানগুলি বিশ্লেষণ করতে গেলে তাই রাজবংশী বা কামরূপী উপভাষার ব্যাকরণ ও উচ্চারণ পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন।

বাংলাভাষার যে উপভাষাটি রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মুখের ভাষা তার নাম রাজবংশী বা কামরূপী। এই ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য যে এতে প্রাচীন ও মধ্যবাংলার বেশ কিছু উপাদান বিদ্যমান। এই ভাষার বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণেও তাই বিশিষ্টতা রয়েছে। এই ভাষার উচ্চারণ সঙ্কট সম্বন্ধে রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চাননের (পঞ্চানন বর্মা) বক্তব্য অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক: "কিন্তু সর্বত্রই একটি ভয়ানক সঙ্কট—অক্ষর দ্বারা উচ্চারণ প্রকাশ করা। বর্ণমালায় যে কয়টি বর্ণ আছে তাহা ঐ বর্ণগুলির আবিষ্কার সময়ের উচ্চারণ বুঝাইবার নিমিত্ত। বৈদিক সময়েও বর্ণমালার অক্ষরগুলি ব্যতীত অন্যান্য সঙ্কেত দ্বারা শব্দের প্রকৃত উচ্চারণ বুঝান হইত। এক একটি বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ প্রকটিত হইত। কিন্তু কালে বৈদিক সঙ্কেতগুলি লোপ পাইল। পুরাণাদির হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ ভিন্ন অন্য ভেদ রহিল না। তৎপর এখন সে ভেদটুকুও বড় নাই। এখন আর পাঠের সময় হ্রস্ব দীর্ঘ ভেদ করিয়া পাঠ করা হয় না। সুতরাং বলিবার সময় উচ্চারণের যে ভেদ থাকে লিখিবার সময় সে ভেদ রাখা বড় কঠিন। উচ্চারণগুলি যিনি অবগত আছেন তিনি লিখন দেখিয়া বুঝিয়া লইতে পারেন। উচ্চারণানভিজ্ঞ লিখন দেখিয়া উচ্চারণ বুঝিতে সমর্থ হইয়া উঠেন না। এই জন্যই ভিন্নপ্রদেশবাসী যাহারা লিখন দেখিয়া সংস্কৃত, বাঙালা, আসামী, হিন্দুস্থানী বা মারাঠী ভাষা বুঝিতে পারেন, তাঁহারাও আসামী, হিন্দুস্থানি বা মারাঠী উচ্চারণ বুঝিতে পারেন না। অর্থাৎ কথার প্রকৃত উচ্চারণ করিতে হইলে, বর্ণবিন্যাস দেখিয়া অভ্যাসের সাহায্যে উচ্চারণ করিতে হয়। এই জন্যই কথ্য ভাষার উচ্চারণ বর্ণবিন্যাস দ্বারা যথাযথভাবে প্রতিবর্ণিত হয় না।

জাগের গান রংপুরাদি স্থানের অথবা কামতাবিহারী ভাষার গান। কামতাবিহারী ভাষার উচ্চারণ অপর স্থানের উচ্চারণ হইতে অল্প বিস্তর পৃথক। অথচ বর্ণমালা এক। সুতরাং বর্ণমালার অক্ষর দ্বারা উচ্চারণ বুঝাইয়া দেওয়া কঠিন। তজ্জন্য প্রকৃত উচ্চারণ বুঝাইতে হইলে কতকগুলি সঙ্কেতের দরকার। সঙ্কেতগুলি এখনও স্থির নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই।"

রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা এই ভাষার নাম উল্লেখ করেছেন 'কামতাবিহারী' ভাষা হিসেবে। কিন্তুপরবর্তীকালে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ এই নামের যথার্থতা খুঁজে পাননি। তবে, নাম যাই-ই হোক্‌, এই উপভাষার শব্দরূপ, ধাতুরূপ, পদবিন্যাস ইত্যাদি এবং বিশেষ করে উচ্চারণ বিশেষ আলোচনার দাবি রাখে। জাগ গান বুঝতে হলে এই আলোচনা অপরিহার্য।

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌-এর মন্তব্য অনুসরণ করে এবং ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ গ্রহণ করে বাংলার ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে রাজবংশীদের পূর্বপুরুষরা মধ্যভারতীয় আর্য ভাষার তৃতীয় স্তরের ভাষা মাগধী অপভ্রংশকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই ভাষাই বিবর্তিত হয়ে বর্তমান কামরূপী বা রাজবংশী উপভাষারূপ পরিগ্রহ করেছে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মতো এই কামরূপ অঞ্চলের ভাষাও একই নিয়মে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক প্রতিবন্ধকতায় এই বিবর্তন মধ্য বাংলায় এসে থেমে গেছে। ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব লাভ করে কলকাতা। ভৌগোলিক দূরত্ব এবং অন্যান্য কারণে কামরূপ অঞ্চলের ভাষার বিবর্তন তেমন গতি লাভ করেনি বলেই এই বিস্তৃত অঞ্চলের ভাষার মধ্যে আজও মধ্যবাংলার লক্ষণ প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হয়। ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (ODBL) বলেছেন— From its geographical position, Assam was practically an extension of North Bengal, so far as its speech and early history were concerned.'

ড. সুকুমার সেন (*ভাষার ইতিবৃত্ত*) মন্তব্য করেছেন—'উড়িয়া আসামীর সঙ্গে বাঙ্গালার সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ। আদিতে এই তিনটি একই ভাষা ছিল। ... বাঙ্গালার কামরূপী উপভাষা হইতে অসমীয়ার পার্থক্য খুব বেশি নয়। ...আধুনিককালে প্রচুর দেশী শব্দ গৃহীত হওয়ায় অসমীয়া কামরূপী হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে।'

অসমিয়া ভাষার গবেষকগণ স্বাভাবিক কারণেই এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। অসমিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ বাণীকান্ত কাকতি (*Assemese : Its Formation and Development*) বলেছেন—

"The whole of North Bengal including Koch Bihar, Rangpur, Jalpaiguri and also perhaps Dinajpur, should have been included with Assam ... if the territorial readjustment were to be made on the basis of linguistic homogeneity."

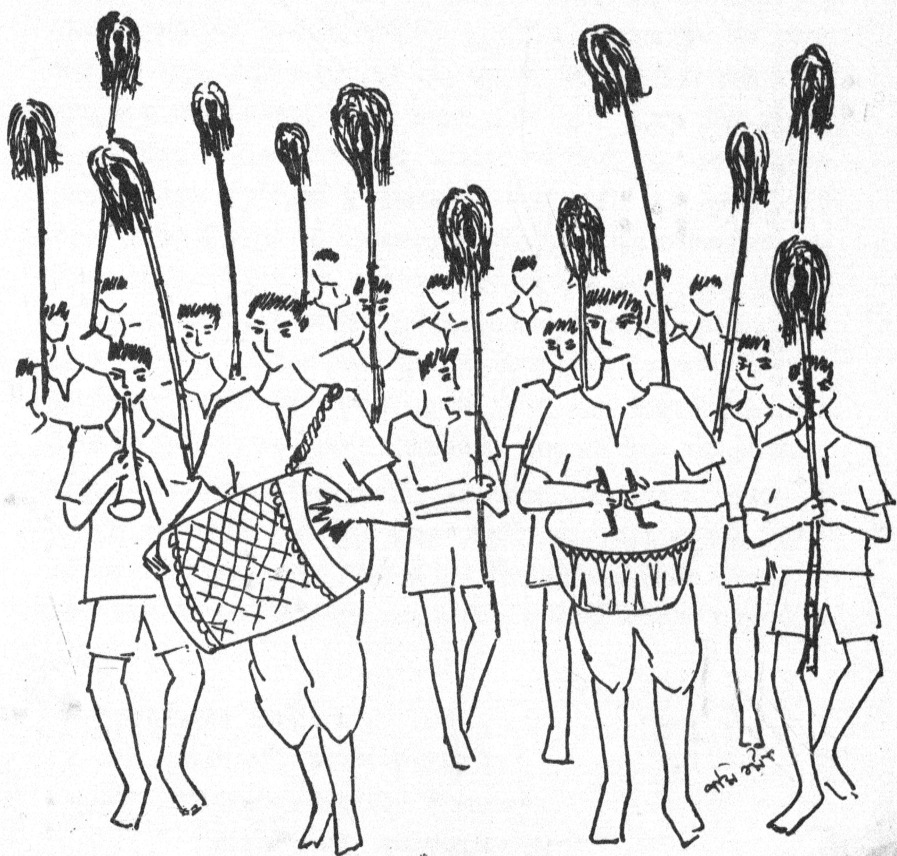
এই কারণেই কামতা-কোচবিহারের রাজদরবারের পরিপোষণায় ষোড়শ শতক পর্যন্ত রচিত সাহিত্যকে অসমিয়া সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

"লেখনং কার্যঞ্চ। এথা আমার কুশল। তোমার কুশল নিরন্তরে বাঞ্ছা করি। অখন তোমার আমার সন্তোষসম্পাদক পত্রাপত্রি গতায়াত হইলে উভয়ানুকূল প্রীতির বীজ অঙ্কুরিত হইতে রহে। তোমার আমার কর্তব্যে সে বর্ধিতাক পাই পুষ্পিত ফলিত হইবেক। আমরা সেই উদ্যোগতে আছি তোমরো এ গোট কর্তব্য উচিত হয় না কর তাক আপনে জান। অধিক কি লেখিম। সতানন্দ কর্মী রামেশ্বর শর্মা, কালকেতু ও ধুমাসদ্দার উদ্ভণ্ড চাউনিয়া শ্যামরাই ইমরাক পাঠাইতেছি তামরার মুখে সকল সমাচার বুঝিয়া চিতাপ বিদায় দিবা। অপর উকীল সঙ্গে ঘুড়ি ২ ধনু ১ চেঙ্গা মৎস্য ১ জোর বালিচ ১ জকাই ১ সারি ৫ খান এই সকল দিয়া গইছে। আরু সমাচার বুজি কহি পাঠাইবেক। তোমার অর্থে সন্দেশ গোমচেং ১ ছিট ৫ ঘাগরি ১০ কৃষ্ণচামর ২০ শুক্লচামর ১০। ইতি শঁক ১৪৭৭ মাস আষাঢ়।"

১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে অহোমরাজকে কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের লেখা এই পত্রটিকে বাংলা গদ্যের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে ; অন্যদিকে এই পত্রটিকে অসমিয়া গদ্যেরও প্রাচীনতম নিদর্শন হিসেবে দাবি করা হয়েছে। অসমিয়া পণ্ডিতদের এই দাবি অবশ্য বাঙালি পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন না। এ প্রসঙ্গে ড. সুকুমার সেনের বক্তব্য—'অসমিয়া ভাষার সুস্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সপ্তদশ শতকের পূর্বে দেখা দেয় নাই।' ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক (প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা) এই উপভাষার সঙ্গে অসমীয়ার সাদৃশ্য আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে রূপতত্ত্বের দিক থেকে কিছুটা সাদৃশ্য থাকলেও ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে সাদৃশ্য বলতে প্রায় কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না, যদিও কিছু কিছু শব্দ উভয় ভাষাতেই পাওয়া যায়।

নরনারায়ণের লেখা পত্রের উত্তরে অহোমরাজের পত্র—

'লিখনং কার্য্যঞ্চ অত্র কুশল। তোমার কুশলবার্ত্তা শুনিয়া পরমাপ্যাতি হৈলোঁ। আরু যে লিখিছা প্রীতিবৃক্ষ অঙ্গুরিত সেয়ে তোমার আমার সাহ্লাদেত বৃদ্ধিক পায়া ফলিত পুস্পিত হৈবার খান যি কহিছ ই গোট বিশেষ। কিন্তু তোমার আমার প্রীতি গোট যি হত হন্তে ঘটিছে সুমস্তে জান। সেইরূপ মর্য্যাদা ব্যবহারত যদি রহিব ফলিত পুস্পিত কিসক নহৈব। আমরা পূর্ব্ব অভিপ্রায়তে আছি। আরু উকিলর সঙ্গে যি সকল দ্রব্যাদি পাঠাইছিলা ই সকল সভাত দেখাইবার উচিত ন হয় কিন্তু যি সকলে যি হক আচরি থাকে অনীতি হৈলেও আচরণীয়ক লৈ তাকে নীতি স্বরূপে দেখে এতেকে দিবার পোবা আরু সমুচয় সেই সেই দ্রব্যত প্রবর্ত্তনীয় লোকর দ্বারায়ে যি বুজুবা গৈছে সেইরূপে বুজিবা। তোমার উকিলর সঙ্গে আমার উকিল শ্রীচণ্ডীবর ও শ্রীদামোদর শর্ম্মাক পাঠোবা গৈছে এমরার মুখে সকল সমাচার বুঝিবা। তোমার অর্থে সন্দেস নড়া কাপোর ২ থান গজদন্ত ৪ গাষ্ঠিয়ন ২ মোনা পঁহুছব। শক ১৪৭৮ মাস আহার দিন।" 'আসামবন্তী' পত্রিকা, ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুন।



বাঁশ পূজা মাগন

অহোমরাজের 'লিখিছা' 'যি' ইত্যাদি, কোচরাজের 'মাস আষাঢ়' অহোমরাজের 'মাস আহার' প্রভৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে তখন থেকেই দুটি ভাষার মধ্যে পার্থক্য সূচিত হওয়া শুরু হয়েছে। কোচরাজ 'বালিচ' ব্যবহার করেছেন। অসমিয়াতে তা গারু। ফারসী শব্দ বালিশ-ততদিনে মুসলিম প্রভাবে বঙ্গ-কামরূপী ভাষায় স্থান পেয়েছে।

রাজশাহী থেকে প্রকাশিত *উত্তরবঙ্গে সাহিত্য সাধনা* গ্রন্থে অধ্যাপক মহম্মদ আবু তালের, রাজনৈতিক, নৈসর্গিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক দিক থেকে আলোচনা করে প্রমাণিত করেছেন যে, মগধের সন্নিহিত উত্তরবঙ্গেই বাংলা ভাষা প্রথম জন্মলাভ করে। মাগধী প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে, ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এই অভিমত যদি মানা যায়, তবে উত্তরবঙ্গ থেকেই আসাম ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় এই নব্য-ভারতীয় আর্য ভাষার প্রথম বিস্তার ঘটেছে। যুক্তিগ্রাহ্য এই অভিমতকে ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক প্রণিধানযোগ্য বলে স্বীকার করেছেন। এই কারণে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, রংপুর, জেলা সন্নিহিত অসমের গোয়ালপাড়া ও কামরূপ অঞ্চলের ভাষায় এত সাদৃশ্য এবং এই একই কারণে এই বিস্তৃত অঞ্চলের সঙ্গীত নৃত্য সংস্কৃতিতে বিস্তর ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি অঞ্চলের প্রধান সঙ্গীত ধারা ভাওয়াইয়া-চটকা ও তৎভিত্তিক সংগীত নৃত্যাদি রংপুর, গোয়ালপাড়া জেলারও প্রধান সঙ্গীতধারা।

[*কামরূপী উপভাষায় রচিত কয়েকটি কামদেবের গান এখানে উদ্ধৃত করা হল। এই গানগুলি গোয়ালপাড়া, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা থেকে সংগৃহীত হয়েছে। এই গান গুলি বিশ্লেষণ করলে রাজবংশী নৃগোষ্ঠীর কাছে জাগ গানের গুরুত্ব কি তা বোঝা যাবে, যদিও এই বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন কামরূপী উপভাষা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা।*]

(১) **কামদেবের জন্মগীত ঃ**

ত্রিশকোটি দেবতার বন্দিলোং চরণ
কামদেবেরে জন্ম হইল কৃষ্ণের নন্দন।
উপজিল গোঁসাইর কুমার রমণীর উদরে

যেই মাসে গৃহস্থের না থাকিবে ভাত
সেই মাসে কামদেব পূজা পাবি তাত
গলায় পুষ্পের মালা সুন্দর রূপ ধরি
পূজা খাবার কামদেব গেল গৃহস্থের বাড়ী।

প্রথমে বন্দোং বাঁশ গোঁসাইর চরণ
যাগ-যজ্ঞ করে গোঁসাই হরষিত মন
চারিদিকে আরা দিয়া সৃজায় বাঁশ বন
বাঁশ রোপন করে গোঁসাই হরষিত মন।

(২) **বাঁশ সৃজন ও পূজার গা· ঃ**

জয় বন্দং জয় বন্দং জয় বন্দং রাম
জয় দিয়া বান্দিয়া কং আনন্দ ধরম।
উপজিল মদনঠাকুর হাতে সৃন্দি ফুল
হাতে পদ্ম পায়ে পদ্ম পদ্ম ন.ভাস্থল।
সুবর্ণের পাছরা মদন গায়ের ভূষণ
বারো শত দেবতা নিয়া বসিল দেওয়ান।
বারো মাসে বারো তীর্থ নিল তো বাটিয়া
চৈত্র মাস না নিল কেহ বড় আকালিয়া।
যদিরে মদন ঠাকুর এ নাম বাড়াং
আশিকালিয়া বুড়া মুই তিন ঝাপ ঝাপাং।
কলিত্ উপজিল মালীর ছাওয়া না জানে ডাইন বাম
বাপ মায়ে বাছিয়া থুইল মালা গিরি নাম।
তোক্ বলোং ওরে বাছা, মালা গিরি বর
পৃথিবীতে বাঁশ নাই তুই বাঁশ সৃজন কর।
কতেক দূর যায়য়া মালা আরো দূর যায়
আর কতেক দূর যায়য়া মালা ব্রহ্মার লাগ পায়।
ব্রহ্মার সেবা করে মালা ভিজা বস্ত্র লইয়া
মালার সেবা দেখিয়া ব্রহ্মার মনে হইল দয়া।
এত্তি চাপি বইস্ মালা এত্তি চাপি বইস্
কি কারণে করিস সেবা স্বরূপ করিয়া কইস্।
সুন্দর সুঠাম তনু মদন গোপাল
চৈত্র মাস আকালিয়া যাব হৈল ছাওয়াল।
এ তিন ভুবনে প্রভু বাঁশের পুলি নাই
তে কারণে মদন গোঁসাই পাঠাইল তোমার ঠাঁই।
তোক্ বলোং ওরে বাছা মালা গিরি বর।
মোর সেবা ছাড়িয়া তুই বিষ্ণুর সেবা কর।

[এমনি করে ব্রহ্মা বিষ্ণুর কাছে, বিষ্ণু শিবের কাছে এবং শিব নদীর কাছে পাঠালেন মালা— গিরিকে।] নদীর নিকট যাওয়ার পরে—
অথাও দরিয়ার পানী সেও থাও হইল
নানা জাতি বাঁশের পুলি পাইতে লাগিল।
ইরু বাঁশ, বিরু বাঁশ তুলিল বিস্তর
মাকলা বড়ো বাঁশ তুলি সাজাইল ভার।
ভার সাজাইল মালা গিরি আনন্দিত মন
আপোনার বাড়ী বুলি করিল গমন।
মালা গিরি খোঁড়ে গাত্ মদন কামে রোয়
বাঁশ নিয়া মদন গোঁসাই সারি সারি বসায়।
কি কারণে হে কিষাণ নিশ্চিন্তে বসিয়া
টারি চায়া বাঙ্গার খেত কিষাণ করো যায়া।
ভাদর মাসে ঘোর রৈদে বাঙ্গার চক্র ফুটে।
তাক্ দেখিয়া কিষাণের বেটার মুখের হাসি ফোটে
কেরকেয়া ধুনিয়া বাঙ্গার গড়েয়া নিল পাইজ
এক সূতা ছাড়িয়া দিল আটিয়া কলার মাইজ।
মথুরার হাটত্ সুতা নিয়া বেড়ায় বেচেয়া
জোলা সব দেখিয়া সূতা নিল তো কিনিয়া।
সূতা পায়া জোলা সব আনন্দিত মন
আপোনার বাড়ী বুলি করিল গমন।
কি করিস রে জোলানি তুই নিশ্চিন্তে বসিয়া।
সব চরকি ধরি শীঘ্র টানা খসাও আসিয়া।
দৈর্ঘ্যে দিল পঁচিশ হাত প্রস্থে কম দিল
বাশের মুখোত্ ফেলেয়া সূতাক কাপড় গড়াইল।
মথুরার হাটোত্ কাপড় নিয়া বেড়ায় বেচেয়া
বাশুয়ায় দেখিয়া কাপড় নিল তো কিনিয়া।
তোক্ বলোং ওরে বাছা মালা গিরি বর
ঝরি পরি গেইল আশিন কাতি পূজার জাগা কর।
এক কুড়াল কান্ধে লইয়া গিরি গেল ধায়া
কথা শুনিল মালা গিরি না থাকিল রয়া।
ইরু বাঁশের গোড়ত্ মালা ভিরিয়া দিল পাও
ইরু বাশ তেতেক্ষণে চেঁচেয়া করে রাও

খাটো খাটো পোর মোর তরল তরল গাও
মুই তো সহিতে নাপাং শ্বেত চণ্ডোরের বাও।
বিরু বাঁশের গোরত্ মালা ভিরিয়া দিল পাও
বিরু বাঁশও শবার নাপায় শ্বেত চণ্ডোরের বাও।
মাকলা বাঁশ উঠিয়া বলে মুই বড় বীর
মোর উপরত্ করিছে ভর আশি হাজার পীর।
বড় বাঁশ উঠিয়া তখন মালাক করিল রাও।
খাটো খাটো পোর মোর ভারি ভারি গাও।
কথা শুনি মালা গিরি বাঁশের দিকে চায়
কান্ধের কুড়াল ধরিয়া মালা গোড়ত্ ছেও দেয়।
গোরখান্ ছেদিল বাঁশের আগাল ঢুলিল
হরি হরি বলিয়া বাঁশ ভূমিতে পড়িল।
গোড়খান ফেলাইল বাঁশের গুড়ুয়া বলিয়া
আগালখান ফেলাইল বাঁশের আগালি বলিযা।
ব্রহ্মার ঝালত্ বাঁশের গাও করিল ঠারু
সুবর্ণের কাটারি দিয়া গাইট করিল সরু।
নদীত্ ফ্যালেয়া বাঁশক্ আনিলেক ধুইয়া
গাভী দুগ্ধে গঙ্গার জল নিল সিনান করিয়া।
বাঁশের আগালে বান্ধে হাড়িয়া চণ্ডোর
তাহার উপরে বান্ধে ধবল বস্তর।
আম ডালি দিয়া বান্ধে গুয়া একজোড়
তারে পাছে কি করিল মালা গিরি বব।
সুবর্ণের পাছরা আনি দিল ফোটা মালা
হরি হরি বলিয়া বাঁশক তুলিল খেলেয়া।
তোক বলোং ওরে বাছা মালা গিরি বর
বাঁশ তুলিলু ভালে করিলু ঘটের খবর কর।
কথা শুনি বুড়া কুমার না থাকিল রয়া।
মদন কামের পূজার ঘট দিল তো গড়েয়া।
তোক বলোং ওরে বাছা মালা গিরিবর
ঘট আনিলু ভালে করিলু, বাইজের খবর কর।
কি করেনরে বাজনি ভাই নিশ্চিন্তে বসিয়া
মদন কামের বাঁশ তুলিছং বাইজ বাজান আসিয়া।

[*এমনি করে পূজার জন্য পুরোহিত, অধিকারী, দেউরি প্রভৃতিকে ডেকে আনার গান গাওয়া হয়।*]

(৩) **ঘট স্থাপনের সময় গাওয়া হয়—**

জয় মারেয়ারে আজি ঘট বসাও সাবধানে।

(৪) **কামদেব বন্দনা ঃ**

আজি দেব দেব কাম দেব হে (৩)
(আর) দেব দেব কাম দেব হে, ঠাকুর মদনকাম
ভক্তি ভরে যেজন পুজে
(তার) পুরায় মনস্কাম হে ॥
আজি দেব দেব .... ॥
(আর) এয়োদশীতে বাঁশে কাপড়, চতুর্দ্দশীতে হম্ (যঞ্জ)
পূর্ণিমাতে বাড়ী বাড়ী, নামে মদনকাম হে ॥
আজি দেব দেব ... . ॥
(আর) চৈত্র মাসে চৈত্রের খেলা, ভর পূর্ণিমার চান
হাতে ধনুক কোচে বাটুল, নামে মদনকাম হে
আজি দেব দেব .... ॥
রামরে রামরে হরি রাম সে নারায়ণ
এই বার মোরে কর দয়া, ঠাকুর মদনকাম হে ॥
আজি দেব .... ॥
(কুশান ছন্দে) ভগবান ....
আচ্ছা বাবা, বেইশ
দেব দেব মোর কাম দেব হে
ঠাকুর মদনকাম ওরে ওহে
ভক্তি ভাবে যে জন পোজে
পুরায় মনস্কাম ওরে হায় হায় ॥
[ত্রয়োদশীতে বাঁশে কাপড় চতুর্দশীতে হম্
পূর্ণিমাতে বাড়ী বাড়ী নামে মদনকাম হায় হায় রে।
.... ইত্যাদি।]

(৫) **মদনকামের নাড়ু সিজ্জনের গান ঃ**

ও মোর ভালা রামরে।
রামরে রামরে হরি রাম সে নারায়ণ।
সেই নাম ভাবিলে হবে দুঃখ নিবারণ ॥

পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ চার কোণ বান্দং মাথে।
এ দেশে না ছিল ভাং ছিল বোল কৈলাশে ॥
বিচি আনিল ঝুলিত করিয়া ভাং আনিল মাথে
বিনা চাষে বিনা মৈ-এ ফেলেয়া দিল খেতে ॥
আসিল আশ্বিন মাস ভাঙের হইল জনম ॥
দোপাতা হইল ভাং লোহারি খেলায়
চারি পাতা হইল ভাং পাতা খাওয়া যায় ॥
আসিল চৈত্র মাস ভাং হইল জটিয়া
কোরা কাঁচি ধরিয়া বিরায় গৃহস্থের বুড়া ॥
মুটি মুটি কাটে ভাং বান্দে আটি আটি
কোরায় করিয়া ভাং আনিয়া থোয় বাড়ী ॥
রৈদতে শুকিয়া ভাঙের হাড় করিলেক গুঁড়া।
বাইশ খান ঢেকি ঢুকি তেইশ খান কুলা ॥
টেকিয়া টেকিয়া নেয় জটিয়া ভাঙের গুঁড়া ॥
আলোয়া পিটালি গাভীর দুগ্ধ করিয়া একত্রর
দধি দুগ্ধ গুড় চিনি দেয় সে বিস্তর ॥
ভাটি হইতে আইল কুচুনি হাতে পিতলের খাড়ু
তায় সে বানাইতে পারে মদন কামের নাড়ু ॥
ভালা রাম রে ॥
[সইরষা শাকে পোকা—
মুই মরোং খাজনার জ্বালায় মাইয়ায় খোঁজে শাঁখা ॥]
ও মোর ভালা রাম রে ॥
প্রথমেতে খায় ভাং মাও যসোমতি
তারপর খায় ভাং কার্তিক গণপতি ॥
তারপর খায় ভাং লক্ষ্মী সরস্বতী
গুয়ার আগালে খায় ভাং মাও শুভচণ্ডী ॥
তারপর খায় ভাং বলরাম
তারপরে খায় ভাং ঠাকুর মদনকাম ॥
সকল দেবতা খাইল ভাং না পাইল মাটিয়া
আসুক ঠাকুর মদনকাম দেউক বোল বাটিয়া ॥

দেবগণ খায়য়া ভাং হয়া গেল ভোর
সর্পগণে দিতে ভাং করে হস্ত জোর ॥
[উড্ডার গাটি ফোটে, আইত পোহাইলে
মারেয়ার মাইয়ার টিকা ভুটি কুকুরে চাটে]
ভালা রাম রে ॥
সর্পের মধ্যে খায় ভাং সর্প অজগর
সাত খান জিহ্বা তার মুখের ভিতর
তারপর খায় ভাং ঢ্যামনা ডারাইশ
তারপরে খায় ভাং আরও বোরাবুরি
আরও কিছু সর্পের নাম জানি বা না জানি।
সকল সর্প খাইল ভাং না পাইল ঘেংটিয়া
আসুক ঠাকুর মদনকাম দেউক বোল বাটিয়া।
সর্পগণ খায়য়া ভাং হয়া গেল ভোর
নদীগণে দিতে ভাং করে হস্ত জোর।
[আম ঝোপা ঝোপা তেঁতুলী ঝোপা ঝোপা
ও পাতার চেংরিগুলা তুলিয়া বান্দে খোঁপা] ॥
ভালা রাম রে ॥
নদীর মধ্যে খায় ভাং নদী মহাশয়
তাহার মোকানে নদী তার তলা বয়।
ধল্লা নদী খায় ভাং ঢলখানা তার বয়
তিস্তা নদী খায় ভাং খারাপ মতে বয় ॥
চেকনোনাই খায় ভাং আরও খাটাজানি
আরও কিছু নদীর নাম জানি বা না জানি ॥
নদী সকল খায়য়া ভাং হয়া গেল ভোর
নরগনে দিতে ভাং করে হস্ত জোর।
ভালা রাম রে ॥
রাজা সকল খায় ভাং রাজপাটে বসিয়া
তাঁতী সকল খায় ভাং তাঁত গোড়ায় বসিয়া।
সিপাই সকল খায় ভাং রণমধ্যে ধায়
হালুয়া সকল খায় ভাং হাল মারিতে যায়।
জালুয়া সকল খায় ভাং জাল মারিতে যায় ॥

কামার সকল খায় ভাং লোহায় মারে বারি
কুমার সকল খায় ভাং বসিয়া গড়ায় হাঁড়ি।
কাচ পোয়াতি খায় ভাং ছওয়া ধরিয়া শোতে
ঘুমের ঘোরে ভাঙের নেশায় বিছনা ভরি মোতে।
রামরে রামরে হরি মুকুন্দ মুরারি
নাড়ু সিজ্জন হয়য়া গেল বলো হরি হরি।
[বাঁশের আগালোত্ মই—
মারেয়া দাদার ঘটি নাই, খলাইত্ পাতে দই]
ভালা রাম রে ॥

(৬) **কোথাও কোথাও বাঁশ পূজার গীতের সঙ্গে ভাঙ্-এর মহিমা গাওয়া হয়।**

নাইয়া সব খায়রে ভাঙ্ নাওত্ পারে নিন্দ্
ভাঙের ধান্ধাত্ পুটকি উদাং চোরে দিয়া যায় সিন্দ্।
ঢেকিতে ফেলেয়া ভাঙ্ হাড় করিল গুড়া
ঢেকিত কুটিয়া নিল ভাটিয়া ভাঙের মুড়া।
ভাটি হইতে আইল কুচুনি হাতে নিযা খাড়ু
তায় সেন গড়াইতে পারে মদনকামের নাড়ু ॥

(৭) তোক বলোং ওরে বাছা মালা গিরিবর
মোর বাঁশ খেলাইতে যায় কামাখ্যা শহর।
কামাখ্যা শহরের লোক আগেয়া নেয় বরি
বরিয়া নেয় শহরের লোক পুত্র বাঞ্ছা করি।
মোর বাঁশ খেলাইতে যায় দক্ষিণের শহর
দক্ষিণ শহরের লোক আগেয়া নেয় রে বর।
পশ্চিম শহরের লোকে বলে হরি হরি
আলোয়া আতপের চাউলে বাঁশের সেবা করি।
উত্তরের শহরেব লোকে লোহার জোঙা ধরা
সোনার ঠোট সোনার মোট সোনার মোহর ভরা।

(৮) **মদনকামের বরণের গান—**

আইলো আইলোরে
খেলার গোঁসাই আইলোরে।
আইলোরে মদনের মাও, মদনোক বরিয়া নেও ॥

আই বৈরাতি সবে মিলি
আইলো আইলোরে
আইলোরে মদনের মাও মদনোক বরিয়া নেও।
আইলো .... গোঁসাই আইলোরে ॥

(৯) **মদনকামের বাঁশ ঘরে নিয়ে যাওয়ার পূর্বে গাওয়া হয়—**
যায় ধরিবে চাইলন বাতি
তায় পাইবে বর পাছা রাতি।
আরে, হাপ্সি আসিল মদনকাম
গছা নাগেয়া দেখো***
মদন ফিরিয়া আসিল রে।
(*** এই স্থানে যে শব্দটি রয়েছে তার অর্থ যৌনাঙ্গ)

(১০) [**জাগ গানের বন্দনা** ঃ]
ওরে বন্দোং জগৎগুরু বাঞ্ছা কল্পতরু
দয়াল হরিহে, ওরে ভরসা কইরাছি হরি
তব চরণ তুলে দেও মাথে
ভক্তি করি হরি শতদলে।
ওরে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সৃষ্টি স্থিতি লয়
সৃজন পালন মরণ বাঁচন
তিনজন হইতেই হয়
ওরে আমি সভায় উঠিয়া
সগারে চরণ লইলাম মাথে ঈশ্বর ভাবিয়া
ওরে সভা করিয়া বসিয়া আছেন
(তোমরা) দশজন বাপ, ভাই
দশের চরণে আমরা প্রণাম জানাই
নানান জাতের আছেন হেন্দু মোছলমান
সকলের চরণ নিলাম মাথে
ভাবিয়া নিরঞ্জন ॥

(১১) **জাগ গানে শ্রী রাধার মান ভঞ্জন পালা গানের শুরু—**
এই যে বন্দনা গানের কথা রইল ভালে ভালে
শ্রী রাধার মান ভঞ্জনের কথা একবার
শুনিয়া নেও সকলে ॥

(১২) **মদনকামের মহিমা ও দলের সমস্যা নিয়ে গান ঃ—**

ও কালী মা, কালী মা
(আরে) কালের করুণাময়ী মা
কালের করুণাময়ী এ গানে তোর মহিমা
আরে এসো এসো সরস্বতী মা।
ও জাগের গান, আমার বান্দি হইল ঠকন
দলে মানুষ মেলে না ॥
আরে ডাইনা পালি মুল বাইন বৈরাগি
সবে এক ধারা
আহে মুল গিদালের গালা ফাসা
ডাইনা চ্যাংরা কম্‌বক্তা
অহে ডাইনা পালি দ্যাখে ভুন্দি বিলাইর মতো
জুলজুল করিয়া
আহে বৈরাগির নাই ভঙ্গিমা
মানুষ হাসামো ক্যামন করিয়া
ও ভালোরে ......
আগোৎ বন্দোং সরেস্বতী হে
পিছে মদনকাম
মদনকামের বড়ো হে ছাইচকা
ওরে ঐ নারীটার নাই ছাইলা
তাকও দেয় ছাইলা
হায়রে যদি নারীটা মনচেৎ করিয়া ধরে
হায়রে আটকুড়া নাম ঘুচিয়া যাইবে বোল
মদনকামের বরে।
হয়য়া ছাইলা না দ্যায় পূজা
পূজা না দ্যায়রে দ্যাখা
ও হায়রে হয়য়া ছাইলা ভাই সেও রবার নয়।

বাখান ঃ [কথার ভঙ্গিতে] [আর হির্‌ দ্যাখ আর হির্‌ দ্যাখ
হোর্‌ দ্যাখ্‌ মোর খাটো শালি, চ্যাপ্‌টি শালি
তোর কথাটা মুইও কঙ্‌ আর হির্‌ দ্যাখ্‌]
এই যে মদনকামক ভর করিয়া হে
ও শালী মুই কোপাং ডাকালি



জাগ গানের আসর

ধুয়া→(বন্ধুর পীরিতি যেমন কুমারের মাটির কলসী
রে ভাঙ্গিলে হয় খোলা
ও হায়রে ভাঙ্গিলে পীরিতি না নেয়রে জোড়া ॥)
[(আর) ক' রে বৈরাগি গোলাম
খাটো গোলাম, ঢ্যাকরা গোলাম
(আর) ক'মো নাতেন কী রে মোর শালির মাই
ক'মো নাতেন কী]
এই যে মদনকামক ভর করিয়া হে
শালি মুই কোপাং ডাকালি।
ধুয়া→(ও মোর বন্ধুর পীরিতি যেমন কুমারের মাটির কলসী
.... না নেয়রে জোড়া ॥)
আরে রামো রে রামোরে হরি রাম সে নারায়ণ
এইবার মোরে কর দয়া ঠাকুর মদনকাম ॥

(১৩) **ঐ একই গানের পাঠান্তর ঃ**

রামরে রামরে হরি রাম সে নারায়ণ
ওরে এইবার মোরে করো দয়া হে
ঐনা ঠাকুর মদনকাম।
আরো ঠাকুর মদনকাম
ডাইকে গঙ্গা গঙ্গা বলে
ওরে নিদান কালে গঙ্গা মাতা হে
ও মাতা রইলেন কার বা কাছে।
ভালো রে, আয় মোর হরি আয় মোর হরি হে
ও আরো মোর মিলনে আয় জাগের দল—
আমার বান্দি হইল ঠকন
দলে মানুষ মেলে না
ও হায়রে মুল বাইন পালি আমার
সবে এক ধারা
আর দোয়ারির নাই ভঙ্গিমা
ওরে ডাইনা চ্যাংরা কম্‌বক্তা
ও হায়রে ডাইনা পালি দ্যাখে
ভুন্‌দি বিলাইর মতন জুলজুল করিয়া।

বাখান ঃ [হির দ্যাখ্, ধাম্ ধামাধাম্ ধাম্রে শালি,
হ্যার দ্যাখ ধাম্ ধামাধাম্ ধাম্]
এই যে প্রথমে উঠিয়া নিলাম রে
ঐ না মদনকামের নাম, জাগের দল
আমার বান্দি হইল ঠকন
দলে· মোর মানুষ মেলে না
হায়রে মুল বাইন পালি আমার সবে এক ধারা।
[হির দ্যাখ্, হ্যানে বা নাতেন আরো থ্যানেরে
গোলাম আরে হ্যানে বা নাতেন আরো থ্যানেরে]
ঐ যে মদনকামক্ বন্দিলু গোলামরে
ও তুই মোক বন্দিলু না ক্যানে।
ডাইকে গঙ্গা গঙ্গা বলে
ওরে নিদান কালে গঙ্গা মাতা
ও মাতা রইলেন কার বা কাছে।
ভালোরে—আয় মোর হরি আয় মোর হরি হে
আরও মোর মিলনে আয়
হায়রে গাঁজা কোটেরে ভাং বুড়া চালিত্ বসিয়া
আগত্ মুই গাঁজা খাইম্
ও হায়রে পাছত্ একটা আচ্ছা **খাওয়া*** দেন ॥
ওরে রামরে রামরে হরি রাম সে নারায়ণ
এইবার মোরে কর দয়া
ঠাকুর মদনকাম হে ঠাকুর মদনকাম।

(* এই স্থানে 'চোদন' শব্দটিও ব্যবহৃত হয়)

(১৪) **গ্রামাফোন রেকর্ড থেকে প্রাপ্ত জাগ গানঃ**

অকি ফাগুন মাসের তিগুণরে জ্বালা
ওরে চৈত্র বৈশাখ এই দুই মাসে শরীল হয় কালা
জৈষ্ঠ্য মাসের মিষ্ট ফল শ্যামাস বাঙি আনারস কাটোল
ভালোরে, রাম রাম রাম হরি হে
ও ভালোরে, রাম নারায়ণ
রাম ভজিলে হবে হে, আরে দুঙ্ক নিবারণ
ফাগুন মাসের ....

ধুয়া→ ও বুড়া কয় বুড়িরে ছোট বৌয়ের মুখোতে হাসি
কপালত্ সেন্দুরের ফোঁটা বোচা নাকত্ নোলো তোর
ওরে উচা দাতত্ নাগাইচে নিশি
এই যে পীরিত উঠন পীরিত বইসন পীরিত গালার হার
বুড়া কয় ....
আরে পীরিত করি যেজন ম[illegible] ার
বুড়া ....

বাখান ঃ (ছোকরা) [উঠেক বৈরাগি গোলাম, চৌকত্ মোতং তোর মুখোত্ মোতং
রে নাড্ডা গোলাম তোর কথাটা মুইও কওং
আর ঘাটত্ ভাঙা নাওরে বৈরাগি গোলাম ঘাটত্ ভাঙা নাও]
এই যে বাখান যদি কবার না পাইস রে .....
ও তুই মোকে বলেক বাপ
বুড়া কয় ....

বাখান ঃ (বৈরাগি) [দুরো দুরো দুর শালি তোর শালির মাইওঁ
তোর কথাটা মুইও কওং
রে ধৌলি শালি মুখোত্ পড়িছে দাগরে মোর শালির মাইওঁ
মুখোত্ পড়িছে দাগ]
এই যে বাখান যদি ক'বার না পাইস রে
ও তুই মোকে বলেক বাপ
বুড়া .... ॥

বাখান ঃ (ছোকরা) [আরে শোন্ শোন্ বৈরাগি গোলাম, জারুয়া গোলাম,
তোর কথাটা মুইও কওং]
আরো আগোৎ যদি রাও করিসরে ...
ও মুই ঠ্যাং ভাঙি দিম্ যায়য়া
বুড়া কয় ....

বাখান ঃ (বৈরাগি) [আরে চুপ করি থাক শালির বুড়ি হাটত বেচাইস আলুরে
মোর ধাগরি শালি হাটোত্ বেচাইস্ আলু]
আর মুই যদি তোক নাই নেওং রে
ও তুই ছওয়া কোটে পালু
বুড়া কয় ....

বাখান ঃ [ওরে পূজা পাতেক বৈরাগি গোলাম পূজা পাতেক তুই
(ছোকরা) এই যে পূজার না বাদে গোলামরে ও মুই পাতিয়া থুইচোং দই]
বাখান ঃ [তবে শুনছিস মোর ধৌলি শালি হ্যার,
(বৈরাগি) আর পূজা পাতিছং মুই]
এবার পূজার না তোরে পালারে, আরে পূজা দিবু তুই—
বুড়া কয় .... হাসি ॥

(১৫) **ধুয়া গান ঃ**

ওরে জ্যাঠ বৈশাখে ঘন করিছে হে
ভালরে উজাই নাগিছে মাছ
অকি রাধে গেল জল ভরিতে হে
ওরে তোর কানাই নিল পাছ।
অকি হাতের বাঁশি মাটিত্ থুইয়া হে
ঐ না কানাই মারে মাছ ॥
কানাই মারে মাছ মাকর হে
ওরে তোর রাধের গায়ে হালি
ওরে এচিয়া বেচিয়া মারে হে
ঐ না মীন মকরের জালি ॥

(১৬) **মোটা জাগের ধুয়াঃ**

ওরে যখন রাধে নামিল জলতে
কানাই দুই হাতে ধরিয়া রাধাক
জল*** করে।
বিনোদ রসিয়া বাজান বাঁশরিয়া
ওরে এইবার ছেড়ির চুবগাইবে কুড়া ॥
রাধা কথায় না শোনে, ওরে কানাইর মনো না মানে
ওরে পরম পীরিতির ভারে রাধার ঠ্যাং ধরি কান্দে
অকি হায়রে হায়—কৃষ্ণ প্রেমের এত মহিমা ॥
[(***) এই স্থানে কথাটির অর্থ মৈথুন।]

(১৭) **মোটা ধুয়া ঃ**

ও মুই আর না যাইম্ গদাধর
জারুয়া গোলাম গুলার সাথতে
অকি ঘরঘরিয়া নদীর কাইতাতে।

ওরে দুইজনে ধরিয়া আই মোক
*** (নদীর কাছারত্ ফেলাইছে)
ওরে, ওটা যদি নাই বোঝেন তো মোক
ঐ কাজ করিছে ॥
একজন সম্বন্ধের পিসার বেটা ভাই
আর একজন টগরু বিয়াই
ওরে সারারাতি মোক ধরিয়া**
হাউস মিটাইলেক আই।

(***) এই অংশে যে কথাগুলি আছে তা ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা কঠিন। পরিবর্তে এই কথাগুলি সংযোজিত হয়েছে।
(**) যে কথাটি রয়েছে তার অর্থ মৈথুন।

বিভিন্ন গানের মাঝে অথবা শেষে [ ] বন্ধনীর মধ্যে অংশগুলি আবৃত্তি বলার ঢঙে পরিবেশিত হয়।

সংগৃহীত গানগুলিতে ব্যবহৃত কিছু কামরূপী পদের/শব্দের অর্থ ঃ

বন্দিলোং—বন্দিলাম, বন্দোং—বন্দনা করি, আরা— ঝোপ (বাঁশের), কং—বলি, সুন্দি— সুগন্ধি, উরণ— ওরনা, বাড়াং— বাড়িয়ে দিই, ঝাপাং—ঝাপ দিই, ছওয়া— সন্তান, তোক্—তোকে, বলোং — বলি, এত্তি—এদিকে, বইস্— বসো, পুলি—চারাগাছ, অথাও— অতল, গাত্— গর্ত, টারি— পাড়া, বাঙ্গা— কার্পাস, তাক্—তাই, তাকে, আটিয়া কলা— বীচি কলা, হাটত্— হাটে, গোড়োত্— গোড়ায়, পোর— বাঁশের দুই গাঁট-এর মধ্যবর্তী অংশ, ছেও— বাঁশ টুকরো করার জন্য কুড়ালের আঘাত, গুড়ুয়া— গোড়ার অংশ, আগাল, আগালি— অগ্রভাগ, গাইট—গাঁট, তুলিলু— তুলে ধরলে, বাজনি— বাজনদার, তুলিছং— তুলেছি, নাওত্— নৌকায়, ধান্দাত— ধান্দায়, পুট্কি—পশ্চাদ্দেশ, উদাং—উন্মুক্ত, তায়— সেই, তিনিই, সেন— তো, মারেয়া— গৃহস্থ, মাও—মা, বরিয়া— বরণ করে, চান—চাঁদ, কোচে— কোমরের থলিতে, সিজ্জন— সৃজন, বিচি— বীজ, আনিল— নিয়ে এল, মই, মৈ— জমি চাষের পর উঁচু নীচু মাটিকে সমান করার জন্য বাঁশের নির্মিত গরুতে টানা ভারযুক্ত যন্ত্র। কোরা— কাঁধে ভারী বস্তু বহনের জন্য বাঁশ নির্মিত যন্ত্র। থোয়—রাখে, টেকিয়া— কুলার সাহায্যে ঝেড়ে নিয়ে, আলোয়া— আতপ, পিটালি—চালের গুঁড়ার মন্ড, মরং— মরি, মাইয়া—স্ত্রী, গুয়া— সুপারি, খায়া— খেয়ে, উড্ডা — বাউণ্ডুলে, গাটি—গাঁট, টিকা— পশ্চাদ্দেশ, ভুটি কুকুর— মাদি কুকুর, চেংরি—মেয়ে, কাচ পোয়াতি— সদ্যপ্রসবা নারী, মোতে—প্রস্রাব করে, খলাই—বাঁশ নির্মিত মাছ রাখার যন্ত্র, চাইলন— চালুন, পাছারাতি— শেষ রাতে, হাপসি— ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে, গছা— বাতি, প্রদীপ ; ডাইনাপালি—১নংবা প্রধান দোহার, মূল—মূল গিদাল, মূল গায়ক ; বাইন— বায়েন, বৈরাগী—দোয়ারি, হাস্যরসিক দোহার ; গালা ফাসা— গলা ভাঙ্গা, চ্যাংরা— মেয়েবেশধারী ছেলে, যাকে বলে ছোকরা ; ডাইনা চ্যাংরা—১নং বা প্রধান ছোকরা, ভুন্দি বিলাই—মাদী বিড়াল, ছাইচকা— মহিমা, মাহাত্ম্য ; মনচেৎ— মানত করা, মানসিক করা ; হয়য়া— জন্ম হয়ে ; রবার নয়— রইবে না অর্থাৎ বাঁচবে না , হির্ দ্যাখ—এই দেখ ; খাটো— বেঁটে ; চ্যাপটি— চ্যাপটার স্ত্রীলিঙ্গ ; ডাকালি কোপানো—একটি কাষ্ঠ সাহায্যে অন্য একটি অপেক্ষাকৃত বড় চ্যাপটা কাষ্ঠ খন্ডে আঘাত করা ; খোলা—মাটির কলসী ভেঙ্গে টুকরো। কমো নাতেনকি—বলব না তো কি?, কমবক্তা — অপদার্থ, চালিত্ বসিয়া— দাওয়ায় বসে, শ্যামাস—শশা, বাঙি— ফুটি, কাটোল—কাঁঠাল, নিশি— মিশি, জারুয়া—জারজ, ধাগরি—দুশ্চরিত্রা, ধৌলি— ফরসা, সাদা, ঠকন—ঠকে যাওয়া।

[অতঃপর রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত যাদবেশ্বর তর্করত্ন ও অন্যান্যদের দ্বারা সংগৃহীত জাগ গান গুলির উদ্ধৃতি দেওয়া হল।]

রাধার শাক তোলা

খুঁরিয়া[১] বতুয়া[২] শাকে ক্ষেত[৩] গেইছে[৪] ভরি।
রাধা যায় শাক, তুলিতে নয়া[৫] ডালি ধারি॥
সরু কাপড়া[৬] প'রছে রাধা কেবল নয়া ধোপ।
নচপচা[৭] শাক্ দেখি রাধার হইল নোভ॥
বাছের[৮] বাছ তোলে রাধা ক্ষেতের ভিতর যা'য়া।
কোচা[৯] ভরিয়া তুলি শাক থোয় ডালি ভরিয়া॥
দেওয়ানীয়া[১০] ভাল বাসে খুঁরিয়া শাকের ভাজা।
শাক তু'ল্‌তে তুলতে মোক কইল্লে[১১] ভাজা ভাজা॥
নাজ নাই নজ্জা নাই গাবুর[১২] বউরী[১৩]।
শাক তুলিতে এমন বউকে দেয় কেমন করি॥
ঐ যে আইসে নন্দের বেটা জুয়ান জাওয়ান কানু।
কেনে আইসে আইলে আইলে বুঝিরে না পানু॥
কেমন করি চৌকে চায় গিলিয়া যেমন খায়।
জুয়ান বউরী দেখি এই ভিতি[১৪] ধায়॥
চিটুল[১৫] চাউনি তার মুখে মুচ্‌কি হাসি।
রাস্তায় ঘাটায়[১৬] পাইলে আগে আঞ্চল ধরে আসি॥
কোন দিকে যাই এখন এ বড় বালাই।
যে দিকে পালাই এখন সেই দিকে কাণাই॥
বজ্জর আটুনি ফস্কা গিরো ঘরে মোর তালা।
যেটেসেটে[১৭] পটেয়া[১৮] দেয় রাস্তায় পায় কালা॥
কালার জ্বালায় মোর অঙ্গ হৈল কালী।
পালাইতে পারিলে ঝাঁচোঙ্[১৯] থাকুক পড়ি ডালি॥
আলুর ক্ষেতে যায়া রাধা হৈল আলু থালু।
যে দিকেতে যায় রাধা সে দিকে যায় কানু॥
রাধা কয় উহু উহু পায়ে লাগিল কাঁটা।
এমন ভাঙা কপাল মোর কপালে মারোঁ[২০] ঝাঁটা॥
পাঁও[২১] পাতিতে পারোঁ না মুই কেমন করি যাইম্[২২]!
নিচ্চয়[২৩] ননদীর মুই ঝাঁটা নাতি[২৪] খাইম্[২৫]॥
খুড়িয়া খুড়িয়া[২৬] আনু খুরিয়ার বন হাতে[২৭]।

আর তো পারোঁনা মুই এত পন্থ[২৮] যাইতে ॥
কে আছে এমন বন্ধু কাঁটা খুলিয়া দেয়।
জন্মের মত বিনা মূলে রাধাক কিনি নেয় ॥
বাঁশী থুইয়া হাসি হাসি রাধার কাছে আসি।
ক্ষেতের মাঝত[২৯] বসি কাণাই সুক্খে যায় ভাসি ॥
কোমল করে কোমল চরণ বুকে ধরে তুলি।
রাধার চরণ ধরিয়া কাণাই সব যায় ভুলি ॥
কাণাই বলে ওগো মামী তোমার পায়ের কাটা।
দাঁত দিয়া তুলিম মুই নন্দ রাজার বেটা ॥
কোন ভয় নাই মামী আমি আছি কাচে।
রাধা কয় শীগ্গির[৩০] তোল কেউবা দেখে পাচে ॥
রাধার রং কাঁচা সোণা নাল পায়ের তলা।
দেখিয়া দেখিয়া কাণাই হয়া গেল ভালা ॥
কানু কয় মামী তোমার কাঁটা কই পাওঁ[৩১]।
যেমনকার তেমনি[৩২] তোমার আছে মামী পাঁও[৩৩] ॥
কি কাঁটা ফুটিছে তোমার বুঝিতে নারি আমি।
হৃদ্দের কাঁটা তুল্তে পারঙ যদি কও মামী ॥
ঢুড়িয়া ঢুড়িয়া[৩৪] দেখনু খুরিয়ার কাটা নাই।
এমন চরণ পাইলোঙ যদি হৃদে রাখ্তে চাই ॥
রাধা কয় ওরে কাণাই একে কাঁটার জ্বালা।
পচ্চিয়া বাতাসে[৩৫] আরো চৌকে পড়িল বালা[৩৬] ॥
পাঁও ঘাড়ে রাখিয়া কাণু চৌকে দিল ফুক।
এ পালা হইল সারা রাধার কত সুখ ॥

১। খুঁরিয়া—নটেশাক, ২। বতুয়া—বাস্তুকশাক, ৩। ক্ষেত—ক্ষেত্র, ৪। গেইছে—গিয়াছে, ৫। নয়া—নব, নূতন, ৬। কাপড়া—কাপড়, সংস্কৃত কর্পট, ৭। নচপচা—নধর, ৮। বাছের—শ্রেষ্ঠ, ৯। কোচা—কোঁচড়, ১০। দেওয়ানীরা—বাড়ীর কর্ত্তা, ১১। কইল্লে—করিল, ১২। গাবুর—যুবতী, ১৩। বউরি—বউ, ১৪। ভিতি—দিকে, ১৫। চিটুল—চটুল, চঞ্চল, ১৬। ঘাটায়—রাস্তায় ; ঘণ্টা পথ হইতে উৎপত্তি। ১৭। যেটেসেটে—যেখানে সেখানে, ১৮। পটেয়া—পাঠাইয়া, ১৯। বাঁচোঙ্—বাঁচি, ২০। মারোঁ—মারি, ২১। পাঁও—পা ; ২২। যাইম—যাইব, ২৩। নিচ্চয়—নিশ্চয়, ২৪। নাতি—লাথি, ২৫। খাইম্—খাইব, ২৬। খুড়িয়া খুড়িয়া—খঞ্জের ন্যায়, ২৭। হাতে—হইতে, ২৮। পন্থ—পথ, ২৯। মাঝত—মধ্যে, ৩০। শীগ্গির—শীঘ্র, ৩১। পাওঁ—পাই, ৩২। যেমনকার তেমনি—যেমন তেমনি, ৩৩। পাঁও—পঙ্গ, ৩৪। ঢুড়িয়া ঢুড়িয়া—খুজিয়া খুজিয়া, ৩৫। পচ্চিয়া বাতাসে—পশ্চিম বায়ুতে, ৩৬। বালা—বালুকা, আইলে আইলে—শস্যক্ষেতের আল ধরে।

কৃষ্ণের ধোরে মাছ মারা

আষাঢ় মাসে ভরবরিষা[১] উজাই লাগিল[২] মাছ ॥
মাচ ধরিতে যায় রাধা কাণাই নাগিল্‌ পাছ ॥
বড় দিঘির বড় ধোরে[৩] বড় দিচে নেটা[৪]।
নন্দের বেটার সঙ্গে রাধার সেই খানেতে নেটা[৫] ॥
কাণাই বলে মেগে[৬] বর্ষে কেমন জলের ধার ॥
আকাশ হাতে[৭] পরে যেমন রূপার শতেক তার[৮] ॥
দেওয়া চিল্‌কে[৯] মাটিত্‌ পড়ি ডাকে ঐ দেওয়া[১০]।
ধরাশ্‌ করি চম্‌কি উঠে আমার কোমল হিয়া ॥
তারাশে[১১] কাঁপিছে হিয়া হাতাশ[১২] খানু[১৩] মামী।
বুকে চাপি ধরো আসি তবে বাঁচি আমি ॥
ফাঁক নাই ফুক নাই[১৪] প'রছে জলের ধারা।
আকাশ পাতাল ঢাক্‌ছে মেগে চাঁন সূরুজ[১৫] তারা ॥
খাল বিল দিঘী নদী সব একাকার।
তবে কেনে করেন মামী সম্বন্ধ বিচার ॥
রাধা কয়· কিবা কইস[১৬] নন্দের ছাওয়াল[১৭]।
মাছ মারিতে আসিয়া কেনে ঘটাই'স জঞ্জাল ॥
ধোরের ধারে যায়া রাধা ভাবে সাত পাঁচ।
হাতের বাঁশী ভূমে থুইয়া কাণাই মারে মাছ ॥
রাধার মুখের দিগে কাণাই এক দৃষ্টে চায়।
ডাঙ্গর ডুঙ্গর চক্ষু দুটী পলক নাহি তায় ॥
হাসিয়া কইছে রাধা এ কেমন চাউনি।
এমন চাউনিতে সাপে ধরয়ে পক্ষিণী ॥
চক্ষু দিয়া দংশ কেনে তুমি কালা সাপ।
মামীক দংশিয়া কেনে কর মহাপাপ ॥
কাল সাপের বিষে আমার অঙ্গ জর জর।
কোন মতে দাঁড়ায়া আছি অঙ্গে দিয়া ভর ॥
যমুনার জলে থাকে সেই কালীয়া সাপ।
দংশিয়া দংশিয়া মোকে বড় দেয় তাপ ॥
দেওয়ানিয়া সাপের রোজা চারি দিকে ডাক।

দেখাইবে[১৮] তায়ঁ[১৯] যদি পায় কালা সাপের নাগ ॥
এ সাপ বিষম সাপ কদমের ডালে ঝুলে।
পাছে পাছে ফিরে সাপ যমুনার কুলে কুলে ॥
সারা রা'ত পড়িয়া থাকে ঘরের ছাইঞ্চায়[২০]।
বাহির হৈলে পাঁও বেড়িয়া মুখের চুমা খায় ॥
কাণাই বলে ভয় নাই আমি সাপের ওঝা।
কত মন্তর জ্ঞান জানি ঔষধ বোজা বোজা ॥
গাঙের জল পড়িয়া দেই কর তায় সিন্নান।
বিষ নামিবে কাদো ধুবে বাচিবে তোমার জান ॥
মাছ ধরিতে সব্ব অঙ্গে লাগিয়া গেইছে কাদা।
ঝক্ ঝক্ করুক যেমন চকচকিয়া চান্দা ॥
রাধা কয় মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া।
কেমন তুমি সাপের ওজা সাপের সাপুড়িয়া ॥
সাপুড়িয়া বাঁশীর সুরে সাপ বাহির হয়া আ'সে।
তোমার বাঁশীর সুরে সাপ জাগিয়া উঠিয়া বইসে ॥
তোমার বাঁশীর সুরে সাপ কাণের ছিদ্দির[২১] দিয়া।
বসত বাড়ী কর্‌লে সাপ হৃদের গর্ত্তে গিয়া ॥
ঘুমায় না ঘুমায় না সাপ জাগিয়া থাকে সোজা[২২]।
তোমার বাঁশীর সুরে সাপ খায় মোর কলিজা[২৩] ॥
আর কিছু মাঙ্গি না কানু আর কিছু মাঙ্গিনা[২৪]।
সাপ বাহির করিয়া ফেলাও গুণের ভাগিনা ॥
ছাড়না ছাড়না কেনে ও মোর আঙ্গিনা[২৫]।
তুমি না জাগাইলে আমি কখনো জাগি না ॥
কাণাই কয় (ওরে) মামী কেনে কথার কাটাকাটি।
সিন্নান[২৬] করিয়া উঠ যাই আপন বাটী ॥
এ উজান বয়সে[২৭] মামী উজান বয়া যাই।
তোমার অঙ্গে অঙ্গ দিয়া একবার সাঁতার খাই ॥
ভরা যৌবন তোমার ভরা পুরা বাণ।
ইয়াত যায়ে সাঁতার দেয় সেই তো ভাগ্যবান ॥
গলা জলে নামিল রাধা করিতে সিন্নান।
আউলাইল মাথার কেশ যে ছিল বিনান[২৮] ॥

লম্ফ দিয়া পড়ে কানাই অতল জলের মাঝে।
রাধাকে না হেরি কানুর মনে কেমন বাজে ॥
দূরে ডুবে আসে কাণাই রাধার চরণ তলে।
রাধারে ধরিয়া কাণাই ভাসিয়া গেল জলে ॥
মনের সুখে হাসি রাধা কয় হাত তুলে।
কেউকি আছেন দরদিয়া[২৯] দরিয়ার[৩০] কুলে ॥
ননদিরে শাশুড়ীকে কইমেন[৩১] বিচারি।
কুম্ভীরে লইল তোমার যুয়ান বউরী ॥
ঝাইল[৩২] ভরা গয়না আছে সেই গুলা দিয়া।
ধুম ধামে করাক এখন দেওয়ানিয়ার বিয়া ॥
অকুল দরিয়ায় ভাসিল কলঙ্কিনী রাই।
এ পালা হইল সারা এখন বাড়ী চলি যাই ॥

১। ভরবরিযা—পূর্ণবর্ষা, ২। উজাই নাগিল—উজাইয়া মৎস্যের যাওয়া, ৩। ধোরে—পুষ্করিণীতে জলের প্রবেশ নির্গণ পথ, ৪। নেটা—মৎস্য ধরিবার জন্য প্রস্তুত কর্দমযুক্ত স্থান; উল্লম্ফন দ্বারা পতিত মৎস্য কর্দমাযুক্ত হইয়া আর যাইতে পারে না; সুতরাং ধরা পড়ে, ৫। নেটা—লেঠা, প্রতিবন্ধ, সঙ্গ, ৬। মেগে—মেঘে, ৭। হাতে—হইতে, ৮। শতেক তার—শত শত তার, ৯। দেওয়া চিল্‌কে—মেঘ বা মেঘাবৃত বিকাশে বিদ্যুৎ খেলাইতেছে, ১০। দেওয়া—মেঘাবৃত আকাশ, ১১। তারাশে—ত্রাসে, ১২। হাতাশ—(?), ১৩। খানু—এ স্থলে পাইনু, ১৪। ফাঁক নাই ফুক নাই—নিরবচ্ছিন্ন, ১৫। সুরুজ—সূর্য, ১৬। কইস—কহিল্‌, ১৭। নন্দের ছাওয়াল—নন্দের ছেলে, ১৮। দেখাইবে—উচিত ফল দিখে, ১৯। তার্য—তিনি বা সে, ২০। ছাইঞ্চায়—ঘরেব বাহির ধার, ঘরে চাঙ্গের বাহির অংশ, ২১। ছিদ্দির—ছিদ্র, ২২। সোজা—কেবল, ২৩। কলিজা—হৃৎপিণ্ড, ২৪। মাঙ্গিনা—ভিক্ষা করি না, ২৫। আঙ্গিনা—প্রাঙ্গন, ২৬। সিন্নান—স্নান, ২৭। উজান বয়সে—উঠ্‌তি বয়সে, ২৮। বিনান—গ্রথিত, ২৯। দরদিয়া—সমদুঃখভাগী, ব্যথার ব্যথী, ৩০। দরিয়ার—দরি হইতে নির্গতা নদী, ৩১। কইমেন—কহিবেন, ৩২। ঝাইল—বেত্রনির্ম্মিত পেটরা।

কৃষ্ণের বড়শীতে মাছ ধরা

ছিপছিপানি[১] বিষ্টি পড়ে ঘাড়ে নিল ছিপ্[২]।
অন্তরে আগুন জ্বলে করিয়া ধিপ্ ধিপ্ ॥
বাঁওহাতে[৩] বোল্লার চাক[৪] ধরাত্[৫] গুঁজে বাঁশী।
মাছ মারিতে চলে কাণাই মুখে মধুর হাসি ॥
যেই ঘাটে সিন্নান করে রাধা বিনোদিনী।
সেই ঘাটে বড়্শী ফেলায় কাণাই গুণমণি ॥
জলেতে ভাসিয়া পাতা[৬] করে টিপ্ টিপ্[৭]।
দুই হাতে টানিয়া কাণাই তুলিয়া ধরে ছিপ্ ॥
রাধা কয় কি এ মাছ রুই না কাতল[৮]।
রুই মাছের মুড়া মিঠা আর মিঠা কোল[৯]।
কাণাই কয় কেনে মামী দেন জলের ছিটা[১০] ॥
তোমার কোল হতে কি মামী রুয়ের কোল[১১] মিটা ॥
রাধা কয় কি কইস্ কাণাই শোন দশ কথা।
রুইয়ের মাথা ছাড়িয়া তুঞিও খালু মোর মাথা ॥
কি মাছ মারিতে আসিস্ নিতি[১২] যমুনায়।
কত জন আইসে আর কত জন যায় ॥
এ কেমন মাছ মারা বলি করে কাণাকাণি।
আমাকে লইয়া পাছত[১৩] হইবে টানাটানি ॥
ছিপে টান দেও যখন তখন হয় গেয়ান[১৪]।
ছিপে টান দেওয়া নয়রে তোর পরাণে মারা টান ॥
মাছের মুখে নাগে নারে এ বড় বড়্শী।
বড়্শী নোয়ায় বড়্শী নোয়ায় এ মোর সাঁড়াশী ॥
বাঁকা বাঁকা দুইটী ভুরু তোমার দুইটী ছিপ।
নোহার বড়্শী তোমার ঐ চৌকের টিপ্[১৫] ॥
জানি না কিছুইরে কাণাই জানি না কিছুই।
বুঝিয়া সুঝিয়া তোমার কিছুই না ছুঁই ॥
তেঁওতো কেমন করি নাগিল বড়শী।
ঠারে ঠোরে কতই বোলে এ পাড়া পড়শী ॥
যৌবন জলে সুখে ভাসি পুঁটি মাছের মত।
মিঠার লোভে গিলনু বড়্শী এলা[১৬] হনু হত ॥
মাতার উপর বিষ্টি পড়ে করিয়া টোপ্ টোপ্।
কি মাছ ধরিতে কাণাই ফেলাও এমন টোপ ॥

গোয়ালের[17] ছাওয়াল তুমি খাও ননী ছানা।
অকারণে মার কেনে অবোধ মাছের ছানা ॥
বাড়ী যা'য়া ছানা ননী খাও পেট ভরি।
বাঁচুক মাছের ছানা বাঁচুক বউরি।
ভাগিনা হইয়া কেনে মামির ভিতি[18] লোভ।
ভাল মানুষ দেখিলে পরে বড় হইবে ক্ষোভ ॥
অলপে অলপে যাও বাড়ীত চলিয়া।
হাড় ভাঙ্গিয়া দিবে যদি দেখে দেওয়ানিয়া ॥
এক ভিতি আছে নদী ও ভিতি[19] ননদী।
কোন ভিতি যাইমেন কাণাই পরাণ বাচা'ন যদি ॥
কাণাই বলে কেনে ভয় দেখান নিতি নিতি।
তোমাকে ছাড়িয়া মামী যাম কোন ভিতি ॥
তরাসে কাঁপিছে গাও ডরে কাঁপে মাথা।
তোমার অঙ্গে লুকাইম কে ধরিবে হেথা ॥
তোমার অঙ্গ কাঞ্চা সোণা সোণার উঠে ঢেউ।
তোমার অঙ্গে লুকাইলে না দেখিবে কেউ ॥
সোণার অঙ্গে সোনার হারে শোভা নাহি হয়।
ছিঁড়ি ফেলাও কণ্ঠের হার কাকে করো ভয় ॥
এই আমার বাহু দুইটী নীলমণির মত।
গলা জড়াইলে মামী শোভা হইবে কত ॥
গলা জড়াইলে মামী বুকে পড়মো[20] তোর।
সোনার অঙ্গে মাণিকের হার দেখিয়া হইমেন ভোর ॥
হাসিতে হাসিতে রাধা জলত[21] যা'য়া পড়ে।
আস্তে ব্যস্তে ধরে কাণাই নামিয়া জলের তোড়ে ॥
রাধারে ধরিয়া কাণাই জলে দিল ডুব।
আজিকার পালা সারা সুখ হৈল খুব ॥

১। ছিপছিপানি—টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি, ২। ছিপ—বড়শীর ছিপ্, ৩। বাঁওহাতে—বামহস্তে, ৪। বোল্লার চাক—বোলতার রসচক্র, ৫। ধরাত—ধড়াতে, ৬। পাতা—বড়শীর মোনা, ৭। টিপটিপ—একবার ডুবে একবার ভাসে, ৮। কাতল—কাতলা মাছ, ৯। কোল—পেটী, ১০। জলের ছিটা—শীতার্ত অস্নাত ব্যক্তির ছিটা অশান্তিকর, ১১। কোল—ক্রোড়, ১২। নিতি—কোল, ১৩। পাছত—পশ্চাতে, পরে, ১৪। গেয়ান—জ্ঞান হয়, মনে হয়, ১৫। টিপ্—কটাক্ষ, ১৬। এলা—???, ১৭। গোয়ালের—গোয়ালার, ১৮। ভিতি—দিকে, ১৯। ও ভিতি—ও দিকে, ২০। পড়মো—পতিত হইব, ২১। জলত্—জলেতে।

রাস

আশিন[১] গেইছে,[২] কাত্তিকের আ'জ গেল আধেক[৩] দিন।
রাত্তির কোণা[৪], একটুক্ বা'ড়্ছে, পাওয়া না যায় চিন্[৫] ॥
গাদ্‌লা[৬] নাই, ঝড়ি[৭] নাই, কাশিয়ার ফুল ফুটে।
নাচিয়া বেড়ায় খঞ্জন গুলা ইত্তিউত্তি[৮] ছুটে ॥
নদীর জল টল্‌টল্ দেখা যায় বালা।[৮(১)]
মাথার উপর আকাশ খানি খালি সব নীলা ॥
রাস্তায় ঘাঁটায় কাদো[৯] নাই খালি পায়ে যা'ও।
আনিতে হৈবে না জল ধুবার লাগেনা পাও ॥
শীত গীরিয[১০] কিছুই নাই বড় মজার দিন।
মাছি নাই মশা নাই করেনা পিন্ পিন্ ॥
সা'জের বেলা পুরুবদিগে, ঝলক দিয়া চান্দ।
আকাশের গায় উঠে, অই কেমন তার ছান্দ ॥
গাছের উপর পড়ে জোনাক[১১] রূপার গাছ করি।
পাতের উপরে জোনাকের খাটেনা কারিকুরি ॥
নদীর জল জোনাক পায়া করে ঝক্ ঝক্।
বালুর চর কাশিয়ার ফুল জ্বলে চক্ চক্ ॥
জোনাকতে ভরিয়া গেল সমস্ত পিথিমি[১২]।
আকাশতে তারা গুলা করে রিমি ঝিমি[১৩] ॥
সিঙ্গাহারের ফুলে[১৪] ফুলে ঢাকিল সব বন।
সুবাস[১৫] পা'য়া ঘরে থাকির[১৬] কারো না হয় মন।
সব ঠাঁই ছড়ায় বাস ফুর ফুরা বায়[১৭]।
লাখে লাখে ভ্রমরা উড়ে যুতি ফুলের গায় ॥
এমন সময় নদীর কুলে বাঁশীত দিল শান।
গলে মালা চিকণ কালা করে রাধা রাধা গা'ন ॥
বাঁশীর সুরে ভাসিয়া গেল আকাশ পাতাল মাটি।
জাতি কুল ধরম করম ভাসিল সব মাটী ॥
রূপসী যতেক ছিল ব্রজের বউরী।
সকলে বাহির হইল নাই কেউ বৈরী ॥
সকলি মিলিল আসি নিকুঞ্জের বনে।

ডালি ভরি তুলি ফুল আনে জনে জনে ॥
ফুলের কঙ্কণ পরে ফুলের নেপুর[১৮]।
ফুলের হার ফুলের তার সবে ভর পূর ॥
কানে দিল ফুলের কুণ্ডল মাথায় ফুলের সিঁতি।
ফুল সাজে সাজিল যতেক ব্রজের যুবতী ॥
সবে বলে দেখাবো আজি কেমন চিকণ কালা।
চিনিয়া নেউক কাঁএ্ত তার রাধা সেই রূপসী বালা ॥
চিন্‌তে যদি নাই পারে মা'র্‌মো ঠোক্‌না[১৯] গালে।
এই কি তোমার ভালবাসা যাও গরুর পালে ॥
যার জন্যে ছাড়ি বন্ধু খাওয়া শোওয়া বইসা[২০]।
তারে এখন চিন না যে কেমন ভালবাসা ॥
সে দিন যেমন দিন দুপরে ক'রচে বসন চুরি।
আ'জ তার কান ধরিয়া দেখাম চাতুরী ॥
বান্ধম[২১] তার হাত দুখানি দিয়া নীল শাড়ী।
সবার আগে ধরা চূড়া বাঁশী নিম[২২] কাড়ি ॥
হাসিয়া হাসিয়া তবে দিমো[২৩] করতালি।
নারীর হাটে নারীর হাতে কি কর্‌বেন বনমালী ॥
মাইয়া মানুষ[২৪] দেখ্‌লে তার উচাটন মতি।
ভাল করি হাউস[২৫] মিটামো[২৬] যতেক যুবতী ॥
মাইয়া মানুষ দেখ্‌লে তার জিভার পড়ে নাল[২৭]।
এতেক্ যুবতীর সনে ধরুক দেখি তাল ॥
নীল শাড়ী চুরি করি বসিছিল ঠ্যালে[২৮]।
আ'জ তার পত্তিশোধ[২৯] দিমো রাত্তির কালে ॥
নীল মেঘের মত হয় কালীয়ার রং।
নীল শাড়ী কর্‌মো তারে কর্‌মো বড় রং[৩০] ॥
সবাই পরমো তাকে ছিঁড়া ছিঁড়ি করি।
দেখিমো কেমন করেন একেলা মুরারি ॥
এই যে কাচুলি গুলা বড় হইছে কশা[৩১]।
একবার দিলে আর না যায় তাক্ খসা ॥
এগুলা ছিঁড়িয়া ফেলাও দুষ্ক[৩২] কর দূর।
দেখিমো কালীয়া ছোঁড়ার কত বুক পুর ॥

কানুর হাতের তলা লাল পীঠির ভিতি নীল।
সুন্দর কাঁচুলি হৈবে না হইবে ঢিল[৩৩] ॥
দুইখানি কানুর হাত এতেক রমণী।
দেখিমো দেখিমো কেমন করেন নীলমণি ॥
একেবারে তুল্‌মো সবে রসের তুফান।
ঝগড়া নাই ঝাঁটি নাই সকলি সমান ॥
গাছের আওরালে[৩৪] থাকি সব শুনিল কাণু।
হাস্‌তে হাস্‌তে আসিল কাণাই বাজাইয়া বেণু ॥
কাণাই কয় মিলিছেন যতেক যুবতী।
আমার কারণে তোমরা কি ক'রলেন যুকতি ॥
কাড়িয়া নিমেন[৩৫] পীত ধড়া সাবাস সাবাস।
পীত বরণ তোমার উরাত[৩৬] হৈবে পীতবাস ॥
কাণাইর কথা শুনি হাসিয়া আটখান।
এ পড়ে উহার গায়ে ছুটে রসের বাণ ॥
যতেক গোপিনী আছিল তত হৈল কাণু।
নাচিতে লাগিল সবে ডগ মগ তনু ॥
পায়ের নেপুর বাজে হাতের কঙ্কণ।
মধুর বাঁশরী বাজায় মদন মোহন ॥
নাচিতে নাচিতে উঠে গানের তরঙ্গ।
গভীর শব্দে বাজে রসের মৃদঙ্গ ॥
ভুবন ভরিয়া গেল এ রসের গানে।
ভাঙ্গিল শিবের ধ্যান উঠে দেবী সনে ॥
পঞ্চ মুখে গান গায় ডম্বরু বাজায়।
নাচে শিব ঠ্যাস্‌ দিয়া[৩৭] ভবানীর গায় ॥
যত দেবী যত দেবা[৩৮] এ রাস হেরিয়া।
রথের উপরে সবে পড়ে মুরছিয়া ॥
নাচিছে গোপিনী গণ নাচার নাই শেষ।
খুলিল মাথার খোপা[৩৯] আউলাইল[৪০] কেশ ॥
ছরমে[৪১] সবার মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম।
আপন অঞ্চলে তাহা মুছাইছে শাম ॥
নাচিতে নাচিতে সবার ছিঁড়িয়া গেল ডুরি।

খসিল কাঁচুলি তাদের খইসে যেন শাড়ী ॥
সৌগ[৪২] ঠাঁই কাল জল কোন ঠাঁই নাই ॥
সমুদ্দুর[৪৩] হইছে[৪৪] আ'জ আপনি কাণাই ॥
আদি নাই অন্ত নাই নাই কূল কিনার।
এ সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে উঠে শক্তি কার ॥
গণিতে না পারি কত আসিছে কামিনী।
সগ্‌গুলি[৪৫] হইছে নদী যতেক গোপিনী ॥
কামের বাতাসে সবার উঠিছে হিল্লোল।
রাসের তরঙ্গে সবার বাড়িছে কল্লোল ॥
সকল নারীর শিরা[৪৬] কাণাইর সাধা[৪৭]।
আপনি হইছে গংগা তায় গৌরী রাধা ॥
শত শত গোপিনী গাঙেরে[৪৮] সঙ্গে করি।
ভাসেয়া ভুবন ধায় গংগা হরি হরি ॥
ঝম্প দিয়া পড়ি মিশে সেই কালা জলে।
রতিবাম দাস রাস গায় কুতূহলে ॥
কাণাই ধামালি[৪৯] পালা এতদূরে সারা।
বৈষ্ণবেতে গাও হরি শাক্তে গাও তারা ॥
ব্রাহ্মণের শ্রীপাদ পদ্মে করি পরণাম[৫০]।
নিবেদন করে দাস জাতি নাম ধাম ॥
পুরব[৫১] দিগেতে[৫২] ব্রহ্মপুত্রের মেলানি[৫৩]।
পশ্চিমে কুশাই[৫৪] গঙ্গা আছয়ে ছড়ানি[৫৫] ॥
উত্তরেতে গিরিরাজ দক্ষিণে বাঙ্গালা।
যে দেশে কিরিপা[৫৬] করে কামাক্ষ্যা মঙ্গলা ॥
করতোয়া শিবের ব্রিভার[৫৭] হস্তজল।
মধ্য দিয়া বয়া[৫৮] যায় করি টল টল ॥
করতোয়ার তীরে আছে শীলাদেবীর ঘাট।
পরশুরামের আছে সেইখানেতে পাঠ[৫৯] ॥
পৌষ মাঘে হয় যদি নারায়ণী যোগ।
শতেক যোজন হ'তে আইসে কত লোক ॥
এই সীমার মাঝে দেশ পোণদুয়ার[৬০] থিতি[৬১]
এ দেশে আমাদের জাতির বসতি ॥

হায়রে রাজার বংশে লভিয়া জনম।
পরশু রামের ভয় এ বড় সরম ॥
রণে ভঙ্গ দিয়া মোরা এ দেশে আইসাছি[৬২]।
ভঙ্গ ক্ষত্রি রাজবংশী এই নামে আছি ॥
ব্রাহ্মণেরে দেখি যেন[৬৩] দেবতার মত।
ব্রাহ্মণেতে নারায়ণে নাহি কিছু ভেদ ॥
এই দেশে ঘোড়াঘাট-রঙ্গপুর জেলা।
যে জেলা করিছে বঙ্গদেশের উজলা ॥
এ জেলার শেষ রাজা রাজা নীলাম্বর।
ভোট চীন ব্রহ্মা[৬৪] আদি যারে দিলা কর ॥
যার তলোয়ারে প্রাণ দিয়াছিল গাজি[৬৫]।
যার ভয়ে পলাইল কত কত কাজি ॥
শেষেতে কারসাজি[৬৬] করে সাজি নারীবেশ!
সেই হাতে পুড়ি গেল এই পুণ্য দেশ ॥
পরে নরনারায়ণ হৈল পুন রাজা।*
ভোট ব্রহ্মা আদি তার পুনঃ হইল প্রজা ॥
সেই শিব বংশে জন্ম রাজা পরীক্ষিৎ।
রঙ্গপুরের পূর্ব্ব[৬৭] ভাগে যার ছিল স্থিত[৬৮] ॥
যে চাতুরী অন্তরে[৬৯] নিয়াছে ভারত।
সেই চাতুরীতে তারে কৈল হস্তগত ॥
সেই হ'তে দিল্লীর বাদশাহ হৈল রাজা।
প্রজাগুলা পূর্ব্বের মত নাহি থাকে তাজা ॥
নিজের ভগিনী দিয়া বাদশাহের কাছে।
মানসিংহ পাইল মান এইরূপ ছাঁচে[৭০] ॥
রঙ্গপুরে ফতেপুর প্রকাণ্ড চাকেলা।
রাজা রায় রাজা তায় আছিল একেলা ॥
ধর্ম্মে মতি রাজা রায় কত কৈল দান।
ব্রহ্মোত্তর ভূমি কত ব্রাহ্মণেতে পান ॥
ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর আর বৈদ্যোত্তর আদি।
কত দান করিয়াছে নাহি যে অবধি ॥
মন্থনা বামনডাঙ্গা প্রভৃতি পরগণা।

ফতেপুরের অন্তর্গত সব যায় গণা ॥
অনুগত ব্রাহ্মণ জানিয়া কৈল দান।
ফতেপুরের এত বড় এই জন্যে মান ॥
কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবীসিং।
সে সময়ে মল্লুকেতে হৈল বার ঢিং[৭১] ॥
যেমন যে দেবতার মূরতি গঠন।
তেমনি হইল তার ভূষণ বাহন ॥
রাজার পাপেতে হৈলো মুল্লুক আকাল[৭২]।
শিওরে রাখিয়া টাকা গৃহী[৭৩] মারা গেল[৭৪]
কত যে খাজানা পাইবে তার নেকা[৭৫] নাই।
যত পারে তত নেয় আরো বলে চাই ॥
দেও দেও চাই চাই এই মাত্র বোল।
মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥
মানীর সম্মান নাই মানী জমিদার।
ছোট বড় নাই সবে করে হাহাকার ॥
সোয়ারিতে[৭৬] চড়িয়া যায় পাইকে মোরে জোতা[৭৭]।
দেবীসিংহের কাছে আজ সবে হলো ভোঁতা[৭৮] ॥
পারে না ঘাঁটায় চল্‌তে ঝিউরী বউরী।
দেবীসিংহের লোকে নেয় তাকে জোর করি ॥
পূর্ণ কলি অবতার দেবীসিংহ রাজা।
দেবীসিংহ-এর উপদ্রবে প্রজা ভাজা ভাজা ॥
রাজারায়ের পুত্র হয় শিবচন্দ্র রায়।
শিবের সমান বলি সর্ব্ব লোকে গায় ॥
ইটাকুমারিতে তার আছে রাজবাটী।
দেখিতে প্রকাণ্ড বড় অতি পরিপাটী ॥
কত ঘর কত দুয়ার কত যে আঙ্গিনা।
তার সনে কোন বাড়ীর তুলনা লাগে না ॥
বড় ঘর চণ্ডীমণ্ডপ টুই[৭৯] অতি উঁচা।
দুই চালে ঘর খানি কোণা গুলা নীচা ॥
পশ্চিম দুয়ারী মণ্ডপ আর কোন খানে নাই।
এ ঘর হাতে যে ঘর হইবে সেটাও দেখবার পাই ॥

কত পাইক পেয়াদা আছে কত দারোয়ান।
কত যে আমলা আছে কত দেওয়ান।
মন্থনার কর্ত্তী জয়দুর্গা চৌধুরাণী।
বড় বুদ্ধি বড় তেজ সকলে বাখানি ॥
শিবচন্দ্রের কাজ কর্ম্ম তার বুদ্ধি নিয়া।
তার বুদ্ধির পতিষ্ঠা[৮০] করে সক্কল[৮১] দুনিয়া[৮২] ॥
আকালে দুনিয়া গেল দেবী চায় টাকা।
মারি ধরি লুট করে বদ্‌মাইস পাকা ॥
শিবচন্দ্রের হৃদে এই সব দুস্ক বাজে।
জয়দুর্গার আজ্ঞায় শিবচন্দ্র সাজে ॥
দেবীসিঙ্গের দরবারে শিবচন্দ্র গে'ল।
প্রজার দুস্কের কথা কহিতে লাগিল ॥
রাজ্‌পুত কালাভূত দেবিসিং হয়।
চেহারায় মৈযাসুর হইল পরাজয় ॥
শুনি চক্ষু কট্ মট্ লাল হৈল রাগে।
'কৌন্ হ্যায় কৌন্ হ্যায়' বলি দেবী হাঁকে ॥
শিবচন্দ্রক কয়েদ করে দিয়া পায়ে বেড়ি।
শিবচন্দ্র রাজা থাকে কয়েদখানাত্ পড়ি ॥
দেওয়ান শুনিয়া পরে অনেক টাকা দিয়া।
ইটাকুমারিত আনে শিবে উদ্ধারিয়া ॥
বৈদ্যবংশ চন্দ্র শিবচন্দ্র মহাশয়।
দেবীসিঙ্গের অত্যাচার আর নাহি সয় ॥
রঙ্গপুরে আচিল যতেক জমিদার।
সবাকে লিখিল পত্র সেইটে[৮৩] আসিবার ॥
নিজ এলাকার আর ভিন্ন এলাকার।
সক্কল প্রজাক ডাকে রোকা[৮৪] দিয়া তার ॥
হাতি ঘোড়া বরকন্দাজে ইটাকুমারী ভরে।
সব জমিদার আইসে শিবচন্দ্রের ঘরে ॥
পীরগাছার কর্ত্তী আইল জয়দুর্গা দেবী।
জগমোহনতে [৫] বৈসে একে একে সবি ॥

রাইয়ৎ প্রজারা সবে থাকে খাড়া হৈয়া।
হাত জুড়ি চক্ষুজলে বক্ষ ভাসাইয়া ॥
পেটে নাই অন্ন তাদের পৈরণে নাই বাস।
চামে ঢাকা হাড় কয়খান করি উপবাস ॥
শিবচন্দ্র খাড়া হইয়া কয় হাত জোড়ে।
রাগেতে কহিতে কথা চক্ষে জল পড়ে ॥
প্রজাদেক দেখাইয়া জমিদার গণে।
এদের দুস্ক না ভাবিয়া অন্ন খা'ন কেনে ॥
উত্তর হাতে জল আসিয়া বড় নাগে বান।
সেই বানে খা'য়া ফেলায় যত কিছু ধান ॥
কত দিনে কত কষ্টে কত টাকা দিয়া।
ক্যারোয়ার মুখ[৮৬] আমি দিয়াছি বান্ধিয়া।
রাজার পাপে প্রজা নষ্ট দেওয়ার নাই জল।
মাঠে ধান জ্বলিয়া গেল ঘরে নাই সম্বল।
বচ্ছরে বচ্ছরে[৮৭] এলা হইতেছে আকাল।
চালে নাই খ্যাড়[৮৮] কারো ঘরে নাই চা'ল[৮৯] ॥
মাও ছাড়ে বাপ ছাড়ে ছাড়ে নিজের মাইয়া[৯০]।
বেটা ছাড়ে বেটি ছাড়ে নাই কারো মায়া[৯১]।
দুষ্টরাজা দেবীসিংহে বুঝাইতে গেলাম।
আমার পায়ে বেড়ী দিল দেওয়ানের গোলাম[৯২] ॥
প্রজার অবস্থা দেখি যাক্ করিতে হয়।
কব জমিদারগণ তোম্‌রা মহাশয় ॥
কারো মুখে নাই কথা হেটমণ্ডে[৯৩] রয়।
রাগিয়া শিবচন্দ্র রায় পুনরায় কয় ॥
যেমন হারামজাদা রজপুত্‌ ডাকাইত।
খেদাও[৯৪] সর্ব্বায় তাক ঘাড়ে দিয়া হাত ॥
জ্বলিয়া উঠিল তবে জয়দুর্গা মাই।
তোমরা পুরুষ নও শকতি কি নাই? ॥
মাইয়া হয়া জনমিয়া ধরিয়া উহারে।
খণ্ড খণ্ড কাটিবারে পারোঙ্‌ তলোয়ারে ॥

করিতে হৈবেনা আর কাহাকেও কিছু।
প্রজাগুলা করিবে সব হইব না নীচু ॥
রাগি কয় শিবচন্দ্র থর থর কাঁপে।
ফ্যাণা[৯৫] ধরি উঠে যেমন রাগি গোঁমা সাঁপে[৯৬] ॥
শিবচন্দ্র নন্দী কয় শুন প্রজাগণ।
রাজার তোমরা অন্ন তোমরাই ধন ॥
রঙ্গপুরে যাও সবে হাজার হাজার।
দেবীসিংহের বাড়ী নুট বাড়ী ভাঙ্গ তার ॥
পারিষদবর্গ সহ তারে ধরি আন।
আপন হস্তেতে তার কাটিয়া দিমো কান ॥
শিবচন্দ্রের হুকুমেতে সবপ্রজা ক্ষ্যাপে[৯৭]।
হাজার হাজার প্রজা ধায় এক ক্ষ্যাপে[৯৮] ॥
নাঠি নিল খন্তি[৯৯] নিল নিল কাচি[১০০] দাও।
আপত্য[১০১] করিতে আর না থাকিল কাও[১০২] ॥
ঘাড়েতে বাঁকুয়া[১০৩] নিল হালের জোয়াল।
জাঙ্গলা বলিয়া সব চলিল কাঙ্গাল ॥
চারি ভিতি হাতে আইল রঙ্গপুরে প্রজা।
ভদ্রগুলা আইল কেবল দেখিবার মজা ॥
ইঁটা দিয়া পাইট্কা[১০৪] দিয়া পাটকেলায়[১০৫] খুব।
চারি ভিতি হাতে পড়ে করিয়া ঝুপ ঝুপ ॥
ইঁটার ঢেলের চোটে ভাঙ্গিল কারো হাড়।
দিবীসিং-এর বাড়ী হৈল ইঁটার পাহাড় ॥
খিড়িকির দুয়ার দিয়া পলাইল দেবীসিং।
সাথে সাথে পালেয়া গেল সেই বারচিং ॥
দেবীসিং পালাইল দিয়া গাও ঢাকা।
কেউ বলে মুর্শিদাবাদ কেউ বলে ঢাকা ॥
ইংরাজের হাতে রাজ্য দিলে চক্রপাণি।
সুবিচার করি গেল আপনি কোম্পানি ॥
ইংরাজ বিচার করে এজলাস করি।
একে একে ফাটকেতে রাখে ঢিংএ ধরি ॥

সেই শিবচন্দ্র রাজা ইটাকুমারীর।
এই গ্রামে বাস করি জানিবেন থির[১০৬] ॥
কুঁড়া[১০৭] আছে বাঁশদহ নদী আলাইকুড়ী।
কালী আছেন জাগ্রত আরো আছেন বুড়ী[১০৮] ॥
ঠাকুরপাড়া বামনপাড়া আছে বৈদ্যপাড়া।
পাড়ায় পাড়ায় গ্রামখানি সব জোড়া ॥
কায়েতপাড়া গণকপাড়া, কর্ণিপাড়া আছে।
কামারপাড়া ছুতারপাড়া কুমারপাড়াও আছে ॥
মালীপাড়া নাউয়াপাড়া[১০৯] রাঢ়িরপাড়ার কাছে।
তাঁতীপাড়া গিরস্ত পাড়া আছে গ্রামের পাছে ॥
গ্রামের দক্ষিণে আছে জোলাপাড়া বড়।
দুসুতি তৈয়ার ক'রতে তামরা[১১০] বড় দড় ॥
গুঁড় কিন্‌তে চাও যদি গুঁড়াতিপাড়া যাও।
কড়ি দিয়া যত কিনো মিলবে আরো ফাও ॥
তেলীপাড়া আছে আরো মিয়াপাড়া আছে।
কত পাড়ার কথা কমো গান বাড়ে পাছে ॥
বৈদ্যপাড়ার কাছে আছে শোত্তির পাড়া।
এক পাড়ায় কথা কৈলে সব পাড়ায় সারা ॥
উত্তরে দক্ষিণে লম্বা ঠাকুরপাড়া খানি।
সক্কলি পণ্ডিত তার সক্কলি বিদ্যামণি ॥
দেখিতে সুন্দর তারা আগুনের মত রং।
দেবতার মত মুর্ত্তি তাদের মুনির মত ঢং ॥
ভোরে স্নান সন্ধ্যা তর্পণ স্তব পূজা জপ।
সমস্ত দিন পড়া শুনা সমস্ত দিন তপ ॥
সক্কলের আছে চৌপাঁরী[১১১] পড়ুয়া কত পড়ে।
পড়ুয়া চলিলে যেন গ্রামখানি নড়ে ॥
শ্রীপঞ্চমী পূজার সমে[১১২] পড়ুয়ারা মেলে।
হর হর ধ্বনি করে গ্রাম যেন টলে ॥
নবদ্দীপে সরস্বতী আগে এক পহর[১১৩]।
বসতি করেন ইহা জানে সর্ব্বত্তর[১১৪] ॥
ইটা কুমারিতে থাকে আসি পহর বেলা।
মাইয়া লোকের সঙ্গে হয় সরস্বতীর খেলা ॥

সেই ঠাকুর বংশের পদে করিয়া প্রণাম।
মদন কামের জাগ গায় দাস রতিরাম ॥

১। আশিন—আশ্বিন মাস, ২। গেইছে—গিয়াছে, ৩। আধেক—অৰ্দ্ধেক, ৪। কোণা— ৫। চিন্—চিহ্ন। ৬। গাদ্‌লা—বাদ্‌লা, ৭। ঝড়ি—বৃষ্টি, ৮। ইত্তউত্তি—এদিক ওদিক, ৮(১)। বালা-বালি, ৯। কাদো—কাদা, কৰ্দম, ১০। গীরিষ—গ্রীষ্ম, ১১। জোনাক—জোৎস্না, ১২। পিথিমি—পৃথিবী, ১৩। রিমি ঝিমি—টিপ্ টিপ্, ১৪। সিঙ্গাহারের ফুলে—শেফালিকা পুষ্পে, ১৫। সুবাস—সুগন্ধ, ১৬। থাকির—থাকিতে, ১৭। বায—বাতাস, ১৮। নেপুব—নূপুর, ১৯। ঠোক্‌না—আঙ্গুল দিয়া গালে মায়া, ২০। বইসা—বসা, ২১। বান্ধম—বাধিব, ২২। নিম—লইব, ২৩। দিমো—দিব, ২৪। মাইয়া মানুষ—স্ত্রীলোক, ২৫। হাউস—অভিলাষ, ২৬। মিটামো—মিটাইব, ২৭। নাল—মুখের লালা, ২৮। ঠ্যালে—ডালে, ২৯। পত্তিশোধ—প্রতিশোধ, ৩০। রং—রঙ্গ, ৩১। কশা—আটি আটি, ৩২। দুস্ক—দুঃখ, ৩৩। ঢিল—ঢিলা, ৩৪। আওবালে—আড়ালে, ৩৫। নিমেন—লইবেন, ৩৬। উরা—উরু, ৩৭। ঠ্যাস দিয়া—অন্যের গায়ে অঙ্গ নির্ভব কবিয়া, ৩৮। দেবা—দেব, ৩৯। খোপা—কবরী, ৪০। আউলাইল—খুলিয়া গেল, ৪১। ছবমে—শ্রমে, ৪২। সৌগ—সকল, ৪৩। সমুদ্দুব—সমুদ্র, ৪৪। হইছে—হইয়াছে, ৪৫। সগ্‌গুলি—সকলি, ৪৬। শিবা—শ্রেষ্ঠ, ৪৭। সাধা —কাণাই যাব সাধনা কবিযাছেন, ৪৮। গাঙেরে—নদীগুলিকে, ৪৯। ধামালী—ক্রীড়া, ৫০। পবণাম—প্রণাম, ৫১। পূবব—পূৰ্ব্ব, ৫২। দিগেতে—দিকেতে, ৫৩। মেলানি—গমন, ৫৪। কুশাই—কৌশিকী, ৫৫। ছড়ানি—ছাড়িযা, ৫৬। কিবিপা—কৃপা, ৫৭। বিভাব—বিবাহের, ৫৮। বয়া—বহিযা, ৫৯। পাঠ—পীঠস্থান, ৬০। পোণদুয়ার—পৌণ্ড্রেব, ৬১। থিতি—স্থিতি, ৬২। আইসাছি—আসিযাছি, ৬৩। যেন—উচ্চাবণ য্যান্, ৬৪। ব্রহ্মা—ব্রহ্মদেশ, ৬৫। গাজি—ইস্‌মাইলগাজি, ৬৬। কাবসাজি—কপটতা, ৬৭। রঙ্গপুরের পূৰ্ব্বভাগ—কামরূপ, ৬৮। স্থিত—স্থিতি, ৬৯। অস্তরে—অস্ত্রে, ৭০। ছাঁচে—ধরণে, ৭১। বার চিং—হরবাম প্রভৃতি সহচব, ৭২। আকাল—দুর্ভিক্ষ, ৭৩। গৃহী—গৃহস্থ, ৭৪। মারা গেল—মরে গেল, ৭৫। নেকা—ন্যাকা—লেখা, ৭৬। সোযারিত্—সোয়ারিতে—পাল্কিতে, ৭৭। জোতা—জুতা, ৭৮। ভোঁতা—ভোঁতা, ৭৯। টুই—খড়ের ঘরেব চালের শীর্ষ, ৮০। পতিষ্ঠা—প্রতিষ্ঠা, ৮১। সক্কল—সকল, ৮২। দুনিয়া—পৃথিবী, ৮৩। সেইটে—সেইখানে, ৮৪। রোকা—ক্ষুদ্রচিঠি অনাবৃত পত্র, ৮৫। জগমোহন—নাটমন্দিব, ৮৬। ক্যাবোযার মুখ—নদী বিশেষের মোনো, ৮৭। বচ্ছরে বচ্ছবে—বৎসরে বৎসবে, ৮৮। খ্যাড়—খড়, ৮৯। চা'ল—চাউল, ৯০। মাইয়া—পত্নী, ৯১। মায়া—মমতা, ৯২। দেওয়ানেব গোলাম—দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের গোলাম ইহাই বোধ হয় কবির বলিবার অভিসন্ধি, ৯৩। হেটমুণ্ডে—অধোমুখে, ৯৪। খেদাও—তাড়াও, ৯৫। ফ্যাণা—ফণা, ৯৬। গোঁমা সাঁপে—গক্ষুর সর্পে, ৯৭। ক্ষ্যাপে—ক্রুদ্ধ হয, ৯৮। এক ক্ষ্যাপে—এক একবারে, ৯৯। খন্তি—মাটী খনন অস্ত্র, ১০০। কাচি—কাস্তে, ১০১। আপত্য—অনভিমত, ১০২। কাঁও—কেহই, ১০৩। বাঁকুয়া—বাঁক, ১০৪। পাইট্‌কা—ইট, ১০৫। পাট্‌কেলার—ঢিল ছুড়ে, ১০৬। থিব—স্থির, ১০৭। কুঁড়া—কুণ্ড, দহ, ১০৮। বুড়ী—গ্রাম্য দেবী, বনদুর্গা ; নদীব দেবতা, ১০৯। নাউয়াপাডা—নাপিতপাড়া, ১১০। তামরা—তাহারা ?, ১১১। চৌপারী—চতুস্পাঠী, ১১২। সমে—সময়ে, ১১৩। পহর—প্রহর, ১১৪। সর্বত্তর—সর্বত্র॥

কুলটা রমণীর উপপতির রূপ বর্ণনা

আগুনের মত সোয়ামীর[১] রূপ
নাখ মুখ চৌখ সব ভাল।
বড় তাঁয়[২] সুন্দর সবাই কয় তাক
বঁধুয়া তো মোর কাল ॥
তঁওতো[৩] বন্ধুয়ার কাণি নগুলের[৪]
রূপ কোণা[৫] সোয়ামীত্ নাই।
এরূপ দেখিয়া কে সেরূপ চায়
কোন খানে এরূপ পাই ॥
চাঁন্দক[৬] সুন্দর ফুলক সুন্দর
সবাকে সবাঁয় যে কয়।
খানিক[৭] দেখিলে সে সব সুন্দর
দেখিতে কি ইচ্ছা হয় ॥
জনম ভরিয়া বঁধুয়ার রূপ
দেখিছোঁ[৮] মিটেনা আশ।
দেখিতে দেখিতে তঁওতো মিটেনা
আরো বাড়ে হাভিলাষ[৯] ॥
চৌকের কখন আলিস[১০] হয় না
পড়েনা চৌকের পাতা।
সে রূপের সনে মিছামিছি কেনে
দেখাইমো লতা পাতা ॥
বঁধুয়ার রূপ বঁধুয়ার মত
আর নাই সেরূপের মত।
কালা মাণিকের রঙ্গও হা'র মানে
তোমাক বুঝা'মো[১১] কত ॥
মুখখানি তার কেমন সুন্দর
কপাল চওড়া বড়।
মাথার বাবুরী কোঁকড়া কোঁকড়া
ঘাড়ে আসি হইছে জড় ॥
সরু মোটা নয় ভুরু দুটী তার
কাল পিপীড়ার সাইর।

কাণের ছেন্দা[১২] হাতে বাহির হইছে
কি মধু খাইতে তার ॥
মোটা সোটা তার দীঘল দীঘল
চৌক দুটী ভাসা ভাসা।
সে চৌক দেখিয়া উঁচা নাক দেখি
মনের পূরিবে আশা ॥
অলপ অলপ হইছে কেবল
মুখেতে পাতলা মোচ[১৩]।
ভুরু আঁকি বিধি মোচ দুখ্‌না * আকিছে
পড়িছে অলপ পোঁচ ॥
ঠোঁট দুইটী তার কত যে সুন্দর
কুন্দান হীরার দাঁত।
দেখিলে বউরী সব ভুলি যায়
ঐ কানে হয় মাত ॥
মুখানিতে তার কত আছে মধু
মুখানি মধুর ভাঁড়।
মাথা হাতে তার ক্রমে ঢাল[১৪] করি
কাটিয়া করিছে ঘাড় ॥
মাঠের মতন কেমন চওড়া
পাটার মতন বুক।
সে কঠিন বুক দেখি শত্তুরুর[১৫]
শুকাইয়া যায় মুখ ॥
বুক-রাজপাটে কে আসি বসিবে
কে হইবে এখানে রাজা
জোর করি মুঞি দখল করিনু
মোর বুক বড় তাজা ॥
মোটা মোটা তার হাত দুই খানি
নোহা দিয়া যেন গড়া।
ড্যানা[১৬] দুইখানি নোহার মতন
হাড়ে মংসে[১৭] রগে জড়া ॥

দুখ্‌না—দুইটী।

সিদা[১৮] যদি করে　　　　বাইমের[১৯] মতন
মাঝেতে মাঝেতে ফুলে।
জোরেতে নগুলে[২০]　　　　টিপা যদি যায়
খাল নাহি পড়ে মূলে ॥
সে দাপনা[২১] দুটী　　　　আপনার করিচোঁ[২২]
কিছুতে নাহি মোর ভয়।
এ ননীর দেহ　　　　সখীরে তাহার
সকল দাপট[২৩] সয় ॥
ওসারে পসারে　　　　যেমন বুকখানি
তেমনি চরপটা[২৪] পাছা।
ছিলিমের মত[২৫]　　　　কেনে তার সরু
কমরখানি[২৬] কও ছাঁচা[২৭] ॥
লোহার কলার　　　　গাছের মতন
দুইটী উরাত[২৮] তার।
শক্ত হইলেও　　　　বড় ছিলছিলা[২৯]
আছে কি এমন আর ॥
বড়ই কঠিন　　　　বঁধুয়ায় সব
নরম কেবল পাঁও।
গোলাপ ফুলের　　　　পাশির[৩০] মতন
বড়ই ভাগ্যেতে পাওঁ[৩১] ॥
বাঁওতে[৩২] তামার[৩৩]　　　　খাড়া হনু[৩৪] মুঞি
ঘর খানি হইল আলা[৩৫]।
কি করি কহিম্　　　　আপনার রূপ
এ বড় হইল জ্বালা ॥
আমার রূপের　　　　ঝলক[৩৬] বেরায়[৩৭]
কে আর পলক ফেলে ॥
ফ্যাল্ ফ্যাল্ করি　　　　সকলে চাহিছে
চৌকে যেন রূপ গিলে ॥
রূপের ঝলকে　　　　চৌকে লাগে ধান্দা
বান্ধা পড়ে রূপের জালে ॥
এ জাল ছিঁড়িয়া　　　　উড়াইতে পারেনা
পারবেওনা কোন কালে ॥

সে বুকের উপরে মুকুতার মালা
সাত নড়ি আছিল ঝুলা ॥
সব জমিদারক্ ভাঙ্গিয়া চূড়িয়া
দেবীসিং হরেরাম।
যেমন কঠিন হয়া মোটা হয়
উচ্চা হ'য়া করে নাম ॥
সেইরূপে বুঝি সৌগ অঙ্গ হাতে
সার নিয়া চুচি* দুটা।
বড়ই কঠিন মাথা উচা করি
হইছে বুঝি মোটা সোটা ॥
শিবচন্দ্রের হাতে যেমন হইল
সে দুটার অধঃপাত।
সেইরূপ পাপ এদুটার বুঝি
করিবে বন্ধুয়ার হাত ॥
একদিগে চুচি* আর দিগে পাছা
দুজনে লইল টানি।
আছে কিনা আছে বুঝা নাহি যায়
আমার কমর কানি ॥
এক দিকে যেমন মন্থনা লইল
অন্য দিকে বামণডাঙ্গা।
ফতেপুর এখন আছে কিনা আছে
সব দিকে হইছে ভাঙ্গা ॥
তার উপর ভার পঞ্চসনা নামে
পড়িছে কাগজের গাদি।
দুর্ব্বল কোমরের উপরে পড়িছে
সেইরূপে পেটের নুধি[৩৮] ॥
সাগর উপরে তিন নড়া মোর
পড়িছে সোণার গোট।
সুখসাগর যেন ঘিরিয়া ফেলাইছে
মদন রাজার কোট ॥
পদ দুখানি সোণার জাঙ্গাল[৪০]
পাশাপাশি হয়া গেইছে।

যে পুরের কাছে মোটা সোটা হয়্যা
বাহিরেতে সরু হইচে ॥
চান্দক চিপিয়া জোনাক লইয়া
তাহাতে মিশায়া ননী।
সোণাক চিপিয়া রং খানি নিয়া
বিধি বুঝি সব ছানী ॥
তাতে দিয়া মোকে গড়াইছে সখি
না হইলে এমন রূপ।
কেমনে পাইনু এই কোণা ঠিক্
ভাবিয়া থাকেক চুপ ॥
পাঁওতে পড়িছে সকলের চোক
কি দেখে পাঁওতে মোর।
সকলেতে কয় ইনিই ভবানী
ভাবেতে হইয়া ভোর

শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন

১। সোয়ামী—স্বামী, ২। তাঁব—তিনি, ৩। তেঁওতো—তথাপিও, ৪। কাণিনগুলের—কণিষ্ঠ অঙ্গুলীর, ৫। রূপকোণা—রূপটুকু, ৬। চান্দক—চাঁদকে, ৭। খানিক—ক্ষণেক, ৮। দেখিছোঁ—দেখিতেছি, ৯। হাবিলাষ—অভিলাষ, ১০। আলিস—আলস্য, ১১। বুঝামো—বুঝাইব। বঙ্গপুরে উত্তম পুরুষ 'ব' বিভক্তি স্থানে—'ম' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়, ১২। ছেন্দা—ছিদ্র, ১৩। মোচ—গোঁফ। গোঁফের বর্ণনায় কবির বলিবার ভাব এই যে, বিধাতা তুলিতে কালী পুরিয়া প্রথমে ভ্রযুগল আঁকিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার কালী ফুরাইয়া গিয়াছে, সেই তুলি দিয়া গোঁফ আঁকিতে সামান্য মাত্র কালীর পোঁচ পড়িয়াছে। কবি এই উৎপ্রেক্ষা করিতেছেন। ১৪। ঢাল—ঢালু, ১৫। শত্তুরুর—শত্রুর, ১৬। ড্যানা—বাহু, ১৭। মংসে—মাংসে, ১৮। সিদা—সোজা, ১৯। বাইমের মত—বাইম মাছের মত ; অর্থাৎ পেশী (muscle) সংযুক্ত বাইম মাছের গাত্রে যেমন দেখা যায়, ২০। নগুলে—অঙ্গুলিতে, ২১। দাপনা—বাহু, ২২। করিচোঁ—করিয়াছি, ২৩। দাপট—বেগ, ২৪। চরপটা—পাছা, নিতম্ব, ২৫। ছিলিমের মত—কল্‌কের ন্যায়, ২৬। কমরখানি—কোমরটী, ২৭। ছাঁচা—সত্য। হিন্দি সাচ্চা শব্দ হইতে উৎপন্ন। ২৮। উরাত—উরু, ২৯। ছিল্‌ছিলা—মসৃণ, ৩০। পাশির—পাপড়ির, ৩১। পাও—পাইয়াছি, ৩২। বাঁওতে—বামেতে, ৩৩। তামার—তাঁহার, ৩৪। খাড়া হনু—দাঁড়াইলাম, ৩৫। আলা—আলো, ৩৬। ঝলক—জ্যোতি, ৩৭। বেরায—বাহির হয়, ৩৮। নুধি—ভুঁড়ি, ৩৯। চুচি—স্তন।

কৃষ্ণের বংশী সৃজন

রাধা।　কালিয়া কৃষ্ণ জন্মিল কাল যমুনারি পানি।
উপজিল[১] কালিয়া কৃষ্ণ ছাড়নু বেচি কিনি ॥
হাট ঘাট ত্যজিনু বড়াই মথুরা নগর।
ছাওয়াল কানাইর গুয়া[২] খাইয়া কি হইল ঝগর[৩] ॥
একদিন দরশন হইল ফুল-বৃন্দাবনে।
সেইদিন হইতে ছাওয়াল কানাই আইসে ঘনে ঘনে ॥
আগ দুয়ারে আইসে কানাই পাছ দুয়ারে চায়।
সরুয়া টোকরাই[৪] খানি দুই হাতে বাজায় ॥
সরুয়া টোকরাই খানি যেন স্বরগের তারা।
মদনে মারিল বাণ গেইল কদম তলা ॥
কানাই গেল কদমতলা রাধে রইল ঘরে।
ঘরে আসি চন্দ্রাননী ভাবিত অন্তরে ॥
চম্পা কলা নয় কানাই মিঠে মিঠে খাওঁ।
সোন্দা জল[৫] নয়হে কানাই সোজা ধারে খাওঁ ॥
নেতের বস্ত্র নয় হে কানাই পিন্দিয়া ওসার চাওঁ[৬] ॥
যেটে জাওঁ পামরী রাধে সেইটে কৃষ্ণর নাম।
মরিয়া যাওঁ পামরী রাধে টুটুক রাধার নাম ॥

বড়াই।　কানে কানে কওঁহে কথা শুনেক চন্দ্রাননী।
তোর কারণে নন্দের ছাইলা ছাড়চে অন্ন পানি ॥

রাধা।　নন্দের ছাইলা সুন্দর কানাই সে ভাগিনা হয় ;
ধাক্কা দিয়া বাইর করোঁ বুড়িক মিছা কথা কয় ॥
আস নয় পড়শী নয় সোদর[৭] ভাগিনা।
কাইল বিয়ানে[৮] আস্‌বে কানাই আমার আঙ্গিনা ॥
কাল শিলায় কাল বাটায় নাই খাওঁ পিশিয়া[৯]।
ঘরে ছিল কাল বিলাই[১০] ফেলাইছোঁ মারিয়া ॥
কাল মেঘ কোকিলের রাও[১১] নাই সয় গো তারে।
ঘরে ছিল কাল গাভী বেচাছোঁ সত্বরে ॥

বড়াই।　কালা কেন নিন্দ রাধে কালাক কেন নিন্দ।
কালা হেন কাজলের ফোটা কপালে কেন পিন্দ[১২] ॥
কালা নয়হে ও নাতিনী কালা নয় শ্যাম।
অঞ্চলে লিখিয়া রাখ কালার নিজ নাম ॥
ঐ ছাইলা করিলে দয়া পাপ বিমোচন ॥

রাধা। খাইলাম তোমার গুয়া বড়াই নিলাম তোমার পান।
কয়েন যাইয়া ছাওয়াল কানাইক্ বাঁশীত দেউক সান ॥
চট্ দিয়া[১৩] যায় রঙ্গের বড়াই কানাইর আগত[১৪] কয়।

বড়াই। তোক বোল ছাওয়াল কানাই মোর সে বচন ধর ॥
যদি চাইস রাধিকার নাগাইল[১৫] বাঁশীর সৃজন কর ॥
এ বোল শুনিয়া ছাওয়াল কানাই না থাকিল রয়া[১৬]।
সোনার নয় বুড়ি কড়ি নিল অঞ্চলে বাঁধিয়া ॥
সুবর্ণ মুট কাটারী নিল হস্তে করিয়া।
বৃন্দা বলিয়া কানাই শীঘ্র গেল ধাইয়া ॥
এ আরায় ও আরায়[১৭] বাঁশ বেড়ায় তো দেখিয়া।
তবু তো বাঁশীর বাঁশ না পাইল খুঁজিয়া ॥
তরাই ও তরুল[১৮] বাঁশ ছেও[১৯] দিয়া দিল।
গোড়াতে ছেওয়াল[২০] বাঁশের আগাল[২১] টলিল ॥
হরি হরি বলিয়া বাঁশ ভূমিত পড়িল ॥
গোড়া খানি কাটিল বাঁশের গুরুয়া[২২] বলিয়া।
আগ খানি কাটিল বাঁশের আগালী বলিয়া ॥
মধ্যখানি নিল বাঁশের বাঁশীর মাফিক[২৩] চাইয়া[২৪] ॥
কতকদূর হইতে কানাই কতকদূর যায়।
আর কতকদূর যায়া সে কামারের[২৫] বাড়ী পায় ॥
তোক বোল ভানু কামার রয়া তাম্বুল খাও।
রাধা নামে কানাইর বাঁশী আমাকে ফোড়ে[২৬] দেও ॥
আকাশে পাতালে হাতিনার[২৭] দুই গোঁজ[২৮] গাড়িল।[২৯]
চামের দোয়াল[৩০] দিয়া ভিরিয়া[৩১] বান্দিল ॥
বীর হনুমান মার্‌লে টান গর্জ্জিয়া উঠিল ॥
আকর শালের[৩২] মাঝে বাঁশী ফোঁড়া আরম্ভিল ॥
প্রথমেতে ফোঁড়ান ফোঁড়[৩৩] যেন আকাশের চান।
চন্দ্র সূর্য্য লাগান বাঁশীত মাণিক কাঞ্চন ॥
তারপরে ফোঁড়ান ফোঁড় যেন স্বরগের তারা।
তারপরে ফোঁড়ান ফোঁড়া বোলে রাধা রাধা ॥
এক ফোঁড়, দুই ফোঁড় তিন ফোঁড় দিল।
সাতখানি বাঁশীর ফোঁড়া গণিয়া ফোঁড়াইল ॥
বাঁশী ফোঁড়ে কামার ভাইয়া দিল কানাইর হাতে।
বাঁশী পাইয়া ছাওয়াল কানাই আনন্দিত চিতে ॥
বাঁশীপাইয়া ছাওয়াল কানাইর আনন্দিত মন।
কদম তলায় ছাওয়াল কানাই করিল গমন ॥

কদম তলায় যাইয়া নিল প্রথম যৌবন ॥
নিরাকারে সখিগণ প্রভু যদুরায়।
কদমতলায় থাকিয়া কানাই আর-বাঁশি[৩৪] বাজায় ॥
কদম তলায় থাকি কানাই বাঁশীত দিল সান।
বুক ধরফর চন্দ্রাননীর আউলাইল[৩৫] পরাণ ॥
বুক ধরফর চন্দ্রাননীর ধরণ না যায় হিয়া।
কোন জাগায় নিলাজী[৩৬] ডাকে রাধা নাম লইয়া ॥
যখন তখন বসি গুরুজনার কাছে।
নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশী আমি মরি লাজে ॥
একেতো বাঁশের বাঁশী বিন্দু গোটা গোটা।
হাতের টিপে মুখের সুরে দিলে দারুণ খোঁটা ॥
একেতো বাঁশের বাঁশী সাত খানি ফোঁড়।
কেমনে জানিল বাঁশী রাধা নামটি মোর ॥
আহা রে অভাগার বাঁশী কি বোল বলিস মোরে।
বাইরাও বাইরাও করে মন পরাণ বিদরে ॥
বাঁশীর সুরে শ্রীরাধিকার ঘরে না রয় হিয়া।
কোন ছলে ছাওয়াল কানাইক দেখিব একবার গিয়া ॥
কাঁচা না মান্দারের খড়ি[৩৭] টোকায় ঝাঁপ দিয়া।
ভরণ কলসীর জল ফেলিল ঢালিয়া ॥
ধুমার ছলে চন্দ্রাননী বিরাইল[৩৮] কান্দিয়া ॥
জল আনিতে যায় রাধিকা ভাবে মনে মন।
সঙ্গের সঙ্গিনী নিল সখি চারি জন ॥

১। উপজিল—জন্মিল, ২। গুয়া—গুবাক, সুপারি, ৩। ঝগর—বিপদ, ৪। সরুয়া টোকরাই—শম্বুকাবরণ নির্ম্মিত বাদ্যযন্ত্র বিশেষ, ৫। সোন্দাজল—মিষ্টজল, ৬। সোর চাও—লজ্জা নিবারণ করি, ৭। সোদব—সহোদর, ৮। বিযানে—প্রাতঃকালে, ৯। পিশিয়া—পেশন করিয়া, কাঁটিয়া। ১০। বিলাই—বিড়াল, ১১। বাও—শব্দ, ১২। পিন্দ—পর, ১৩। চট দিয়া—ত্বরা করিয়া, সত্বরতাসহকারে, ১৪। আগত—সম্মুখে, ১৫। নাগাইল—সঙ্গ, ১৬। রয়া—প্রতীক্ষা করিয়া, ১৭। এ আরার ও আরার—অরণ্যে অরণ্যে, এ ঝোপে সে ঝোপে, ১৮। তরাই ও তকুল—এক জাতীয় বাঁশ গাছ, ১৯। ছেও—ছেদন, ২০। ছেওযাল—ছেদন করিল, ২১। আগাল—অগ্রভাগ, ২২। গুরুয়া—গোড়া, ২৩। মাফিক—উপযুক্ত, ২৪। চাইয়া—দেখিয়া, ২৫। কামার—লৌহকার, ২৬। ফোঁড়ে—ছিদ্র করিয়া, ২৭। হাতিনার—হাপরের, ২৮। গোঁজ—খুঁটি, ২৯। গাড়িল—পুঁতিল, ৩০। দোয়াল—চর্ম্ম নির্ম্মিত রজ্জু বিশেষ, ৩১। ভিরিয়া—শক্ত করিয়া, ৩২। আকর শালের—লৌহকারের কারখান, ৩৩। ফোঁড়—ছিদ্র, ৩৪। আরবাঁশি—মুখে ফুঁ দিযা বাজাইবার বংশ নির্ম্মিত বাঁশি বিশেষ, ৩৫। আউলাইল—বিচলিত হইল, ৩৬। নিলাজী—লজ্জাহীনা, ৩৭। মান্দার খড়ি—মন্দার গাছের জ্বালানী কাষ্ঠ। ইহা ভাল জ্বলে না কেবল ধুম হয়। ৩৮। বিরাল—বাহির হইল।

আমাদের আলোচনাতে দেখা গেছে যে জাগ গানের অপেক্ষাকৃত পরিশীলিত রূপ কানাই-ধামালী বা লীলা জাগ নামে পরিচিত। রংপুর সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় জাগ গানের যে পালাগুলো সংকলিত তার সবকটিই রাধাকৃষ্ণ সম্পর্কিত। পালাগুলির নাম রাধার শাক তোলা, কৃষ্ণের ধোরে মাছ মারা, কৃষ্ণের বড়শীতে মাছ ধরা, রাস, কৃষ্ণের বংশী সৃজন ইত্যাদি। আমরা যে গানগুলো সংগ্রহ করেছি তার মধ্যেও কোথাও কোথাও রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। মদনকামের জন্ম নিয়ে একটি গানে মদনকামকে কৃষ্ণের নন্দন বলে উল্লেখ করা হয়েছে—"তিরিশ কোটি দেবতার বন্দিলোং চরণ, মদনকামের জন্ম হইল কৃষ্ণের নন্দন।"

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে মদনকাম গানে রাধাকৃষ্ণ সংক্রান্ত পালার বাহুল্য কেন? এই প্রশ্নের সহজ উত্তর হল যে কামকে জাগ্রত করার গীত গানে স্ত্রী পুরুষের প্রেম ও মিলন বর্ণনা অপরিহার্য্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনে সবচেয়ে বড় তুলনীয় ঘটনা রাধাকৃষ্ণের প্রেম। তবে রাধাকৃষ্ণ এখানে মাটির মানুষ—কোনও দেবদেবী নয়। উত্তরবঙ্গের গানের এটাই বিশেষত্ব। এখানে কানাই, কানু, কালা, সবই আছে কিন্তু তাদের মধ্যে দেবত্বের চেয়ে মানব গুণ অনেক বেশি। তাইতো জাগ গানের রাধাকৃষ্ণের প্রেমালাপে তথাকথিত স্বর্গীয় পারমার্থিক প্রেমের কোনও স্থান নেই। এই বর্ণনায় যা পাওয়া যায় তা নিতান্তই সাধারণ গ্রাম্য স্ত্রী পুরুষের দৈনন্দিন প্রেম এবং নিছক কাম মিশ্রিত প্রেম। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব সারা উত্তরবঙ্গে কিছুটা কম হলেও এই অঞ্চল একেবারে বৈষ্ণব প্রভাব মুক্ত থাকে নি। একদিকে অসমের শঙ্করদেবের প্রভাব অন্য দিকে গৌড় বাংলার চৈতন্যদেবের প্রভাব রাধাকৃষ্ণের অমর প্রেমকাহিনী কবি সাহিত্যিক গীতিকারদের মনে প্রেরণা জুগিয়েছে। রাধাকৃষ্ণের প্রেম-ভাবকে অবলম্বন করে তারা মদন কামের গান রচনা করেছেন—। মদন কাম গানের উদ্দেশ্য যদি হয়ে থাকে কামকে জাগ্রত করা, তবে তো রাধাকৃষ্ণ প্রেমের মানবিক অংশের প্রকাশ এই গানগুলোর মধ্যে না আসাটাই অস্বাভাবিক। গ্রাম্যকবি গীতিকারদের সহজ সরল অকপট প্রকাশ ভঙ্গীতে এই স্তব গানে স্বভাবতই এসে পড়েছে তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত অনেক শব্দ যা হয়ত তথাকথিত ভদ্রসমাজের মাপকাঠিতে অশ্লীল। মদনকাম গানে কাম-প্রধান প্রেমের আধিপত্যের বিশেষ কারণ মদনকে উর্বরতার দেবতা হিসেবে গণ্য করা। নিঃসন্তানের সন্তান লাভের জন্য যাইটোল, শুভচনি দেবীর আশীর্বাদ যেমন কার্যকরী তেমনি কার্যকরী কার্তিক বা কাতি ও মদনের বর। মদনকামের গানে এবিষয়ে নিঃসন্দেহ প্রমাণ রয়েছে। একটি গানে পাই—"ওরে নারীটার নাই ছাইলা তাকো দেয় ছাইলা, হায়রে যদি নারীটা মনচেৎ করিয়া ধরে হায়রে আটকুড়া নাম ঘুচিয়া যাইবে বোল মদনকামের বরে।"

উল্লেখ্য যে মদনকামের গানের সঙ্গে যে পূজা জড়িত তা হল বাঁশ পূজা। বাঁশ পুরুষাঙ্গের প্রতীক। বাঁশ পূজার মাধ্যমে উর্বরতা ও সৃষ্টি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরাধনাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। প্রতীক রূপ বাদ দিয়ে ব্যবহারিক দিক বিচারেও বাঁশের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সমীচিন। প্রাচীন কামরূপে বর্তমান উত্তরবঙ্গ ও আসামে বাঁশ অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু। গ্রাম প্রধান এই অঞ্চলে ঘরবাড়ি তৈরি, কৃষিকাজ, মাছধরা প্রভৃতি অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবিকার প্রায় সব কিছুতেই প্রয়োজন বাঁশের। এই অঞ্চলে বাঁশ জন্মে প্রচুর পরিমাণে। বাঁশের এইরূপ গুরুত্বের কারণে অর্থকরী সম্পদ হিসেবেও মূল্যবান। সম্ভবত এই কারণে বোধহয় এখানে বাঁশ পূজার প্রচলন।

প্রথমে আমাদের সংগৃহীত গানগুলো নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রথম গানটা মদনকামের জন্ম গীত-সেখানে মদনকামকে কৃষ্ণের নন্দন বলে অভিহিত করা হয়েছে। সুন্দর রূপধারণ করে কামদেব বাড়ী বাড়ী পূজো খেতে যান চৈত্র মাসে। চৈত্র মাসকে বর্ণনা করা হয়েছে আকালের মাস হিসেবে—"যেই মাসে গৃহস্থের না থাকিবে ভাত।" দ্বিতীয় গানটিতেও চৈত্র মাসের বর্ণনা—"বারো মাসে বারো তীর্থ দিল তো বাটিয়া। চৈত্র মাস না নিল কেহ বড় আকালিয়া।" বৎসরের সব কটি মাস বিভিন্ন দেব দেবী ভাগ করে নিয়েছে তাদের পূজোর মাস হিসেবে। কিন্তু চৈত্র মাস নিতে কেউ রাজী হয়নি কারণ এই মাসে গৃহস্থের ঘরে খাবার থাকে না— তারা পূজো দেবে কি করে? তিন দশক আগেও সারা উত্তরবঙ্গ অসমের কৃষির যে অবস্থা ছিল তাতে সারা বছরের ভাত খুব কম পরিবারেরই থাকত। দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম-বর্দ্ধমান-হুগলী-নদীয়া-মুর্শিদাবাদের মতো না হলেও আজকাল উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে শ্যালো টিউবওয়েল, রিভার লিফ্ট ইত্যাদির মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে—উন্নত ধরণের বীজ, কৃষি পদ্ধতি ইত্যাদির মাধ্যমে আমন চাষে ফলনের পরিমাণ বেড়েছে, বোরো চাষ বাড়ছে। বোরো চাষের ফলে, আলু কপি ইত্যাদি চাষের ফলে ফাল্গুন চৈত্র মাস এখন আর ততটা ভয়াবহ নয়। কামরূপে অর্থাৎ তৎকালীন উত্তরবঙ্গ অসমে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি, উন্নতমানের বীজ, কৃষি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগি, আধুনিক সেচ ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ছিল না। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসে যে সামান্য পরিমাণ আমন ধানকাটা হত তাতে ফাল্গুন মাসের পরে সাধারণ গৃহস্থের ঘরে দৈনন্দিন উপোস করার মত অবস্থা ছিল। এ হেন চৈত্র মাসেও মদনকামের আপত্তি নেই। এই মাসেই পূজা খেতে বাড়ি বাড়ি যান তিনি। কারণ তাঁর পূজায় কোনও আড়ম্বর নেই। প্রতি গ্রামে অঢেল বাঁশ ঝাঁড়, পথের পাশে আলের ধারে কোথাও বা শস্যাক্ষেতে যেখানে সেখানে গজিয়ে ওঠা অঢেল ভাং তাঁর পূজার প্রধান উপকরণ। তাঁর পূজার নাড়ু তৈরি করার জন্য প্রয়োজন শুধু সামান্য পরিমাণ চালের গুড়োঁ যা অনেক গৃহস্থের পক্ষেই চৈত্র মাসেও যোগাড় করা অসম্ভব নয়।

যা হোক কামদেবের পূজার প্রতীক বাঁশ অর্থাৎ বাঁশ পূজা। তাই প্রয়োজন বাঁশ সৃজনের—"প্রথমে বন্দোং বাঁশ গোঁসাইর চরণ।" এই গানের শেষ চরণে তাই—"চারিদিকে আরা দিয়া সৃজায় বাঁশ বন, বাঁশ রোপণ করে গোঁসাই হরষিত মন।"

দ্বিতীয় গানটির বিষয়বস্তু বাঁশ সৃজন। এই গানে এক মালীর পুত্র মালা গিরি মদনকাম পূজার জন্য পৃথিবীতে বাঁশ সৃষ্টির দায়িত্ব নিয়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি দেবতার আরাধনা করে। ব্রহ্মাকে উদ্দেশ্য করে মালাগিরির প্রার্থনা—

"সুন্দর সুঠাম তনু মদন গোপাল
চৈত্র মাস আকালিয়া যার হৈল ছাওয়াল।
এ তিন ভুবনে প্রভু বাঁশের পুলি নাই
তে কারণে মদন গোঁসাই পাঠাইল তোমার ঠাঁই।"

ব্রহ্মা তাকে বিষ্ণুর সেবা করতে বলেন এবং বিষ্ণু বলেন শিবের আরাধনা করতে। শিব বলেন এই কাজ ব্রহ্মা, বিষ্ণু বা শিবের নয়। তিনি মালা গিরিকে উপদেশ দেন নদীর আরাধনা করতে। তার সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে নদী বর দিল বিভিন্ন জাতের বাঁশের পুলি (চারা—saplings)--"অথাও দরিয়ার পানী সেও থাও হইল, নানা জাতি বাঁশের পুলি পাইতে লাগিল। ইরু বাঁশ বিরু বাঁশ পাইল বিস্তর, মাকলা বড়োবাঁশ তুলি সাজাইল ভার।"

ইরু, বিরু, মাকলা,বড়ো প্রভৃতি বাঁশের নাম। আর এক জাত বাঁশের নাম নল বাঁশ বা তরলা বাঁশ যা দিয়ে বাঁশি তৈরি হয়। আব্বাসউদ্দীন সাহেব গীত একটি বিখ্যাত গানে পাওয়া যায়—"তরলা বাঁশের বাঁশি ছিদ্র গোটা ছয়।" বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষাদি রোপণে প্রধান উপকরণ জল—তাই হয়ত নদীকে এক্ষেত্রে উর্ব্বরতা শক্তির প্রতীক হিসেবে দেখা হয়েছে। অথবা এমনও হতে পারে যেহেতু নদী দিয়ে, বিশেষ করে বর্ষারম্ভে নদীপথে প্রচুর বৃক্ষাদি ভেসে যায়, বাঁশের চারা ভেসে যায় সেই হিসেবে নদীকে চারা যোগানের সূত্র হিসেবে দেখা হয়েছে। প্রাকৃতিক শক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস থেকে এসেছে প্রকৃতির উপাসনা। এই বিশ্বাস থেকেই কামরূপ বাসীগণ নদী, বৃক্ষ, শিলা পূজায় বিশ্বাস করতেন। এখানে তারই প্রতিফলন ঘটেছে। যা হোক নদীর কাছ থেকে বাঁশের চারা পেয়ে সেই চারা মালা গিরি রোপণ করে মদন ঠাকুরের সাহায্যে। পূজার সময়ে বাঁশগুলোকে কাপড় দিয়ে মুড়ে সুন্দর করে সাজাতে হবে, তাই মালা গিরি এবারে কৃষকের কাছে গিয়ে বলে বাঙা (কার্পাস) চায করতে। সেই কার্পাসের ফল বড়ো হলে তুলো আসবে ভাদ্র মাসে। সেই তুলোতে কাপড় তৈরি হবে মদনকামের বাঁশ মোড়ানোর জন্য। তৈরি করবে জোলা (তাঁতি)।

ইতিমধ্যে কার্তিক মাস এসে গেছে। রোপণ করা বাঁশগুলো কাটার উপযুক্ত হয়েছে। সুতরাং মালা গিরি যায় বাঁশ কাটতে। কাটতে গেলে ইরু, বিরু ও মাকলা

বাঁশ কাতর অনুনয় করে যে তারা মদনকামের শ্বেত চণ্ডোরের (শ্বেত চামোরের) ভার সইতে পারবে না। সুতরাং বড়ো বাঁশ কেটে গোড়া ও আগার দিক বাদ দিয়ে মধ্যভাগ পরিষ্কার করে নদীতে ধুয়ে নিয়ে গঙ্গা জল দিয়ে তা স্নান করিয়ে তার মাথায় একজোড়া পান সুপারি চামোর বেঁধে শুভ্র বস্ত্রে সেই বাঁশ আচ্ছাদিত করে হরি হরি বলে মাটিতে খাড়া করে পোঁতা হল। এবারে চাই পূজোর ঘট। কুমোর সেই ঘট যোগান দিল। দেউরি, বাজনদার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হল।

তৃতীয় ও চতুর্থ গানে ঘট স্থাপন ও কামদেব বন্দনা। এই বন্দনার গানে বর্ণনা থেকে দেখা যায় যে ত্রয়োদশীতে বাঁশকে বস্ত্রাদি পরিয়ে পূজোর উপযোগী করা হয়। চতুর্দ্দশীতে হম্ (যজ্ঞ) ; অর্থাৎ সেদিনই প্রকৃত পূজা। এবং পূর্ণিমার দিন এই ঠাকুর বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ায় অর্থাৎ ভক্ত্যাগণ বাঁশ নিয়ে নৃত্যগীত সহ মাগন করে বেড়ায়।

পঞ্চম গানটি নাড়ু সিজ্জনের অর্থাৎ নাড়ু তৈরির জন্য যে ভাং এর প্রয়োজন সেই ভাং-এর জন্ম কথা এই গানে। মদনকাম পূজার প্রসাদ হিসেবে নাড়ু এবং বিশেষ করে ভাং মিশ্রিত নাড়ুর গুরুত্ব ভাং নিয়ে এই সব গান থেকে অতি পরিস্কার। কৈলাশ থেকে বীজ এনে এই ভাং চাষ করা হয়েছে। কাটার উপযুক্ত হলে এই ভাং কেটে শুকিয়ে পরিষ্কার করে পাতা গুঁড়ো করে সেই গুঁড়ো আতপ চালের সঙ্গে মিশিয়ে দই দুধ গুড় চিনি দিয়ে নাড়ু তৈরি হল। এই নাড়ু তৈরি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ। এই কাজ কুচুনী অর্থাৎ কোচ কন্যারাই ভালো করতে পারে।

"ভাটি হ্যাতে আইল কুচুনী হাতে পিতলের খাড়ু
তায় সে বানাইতে পারে মদনকামের নাড়ু।"

কামরূপের আদি আধবাসীগণ রাজবংশী না কোচ এবং রাজবংশী ও কোচ এক জাতি কি না ইত্যাদি তর্কের আভাস এই গানে পাওয়া যায়। গানের এই পংক্তি থেকে বোঝা মুশকিল এখানে এই কোচ-কন্যাকে কোথাকার অধিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। "ভাটি হ্যাতে আইল" অর্থাৎ পূর্ববঙ্গ থেকে আগতা এই কুচুনী। ময়মনসিংহের দিকে ও গাড়ো পাহাড়ে কোচ নামে এক জাতির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানে সেখানকার নারীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে কিনা সেই বিচারের অবকাশ থেকে যায়। যা হোক, এমন যে ভাং-এর নাড়ু সেই নাড়ু, সেই ভাং খাওয়ার জন্য সকলে উন্মুখ হয়ে আছে। সমুদ্র মন্থনের পর অমৃত পানের জন্য যেমন দেব দানব সকলের প্রতিযোগিতা তেমনি প্রতিযোগিতার বর্ণনা এই মদনকামের ভাং মিশ্রিত নাড়ু খাওয়ার জন্য। অতি স্বাভাবিক কারণেই ভাং খাওয়ার প্রথম অধিকার দেবদেবী গণের। তার পর সর্পগণের পালা। অজগর, ঢ্যামনা, ডারাইশ, ঘেংটিয়া সকলেই পায় সেই প্রসাদ। এর পর ভাং যায় নদীর কাছে। তিস্তা, ধরলা, কালজানি, খাটাজানি

ইত্যাদি বড় ছোট সব নদীই ভাং প্রসাদ লাভ করে। এবারে অধিকার নরগণের। এদের মধ্যে প্রথম অধিকার রাজাদের। এরপর একে একে তাঁতি, কুমোর, কামার, কৃষক, শ্রমিক, হাঁড়ি, বাগদি ইত্যাদি সকলেই মহানন্দে ভাং প্রসাদ খায়। এমন কি কাচ পোয়াতি অর্থাৎ, সদ্যপ্রসবকারী মহিলা সেও বাদ যায় না।

নাড়ু সিজ্জনের মূল গানের ফাঁকে ফাঁকে কিছু কিছু খোসা গান পরিবেশিত হয় হাস্যরস সৃষ্টির জন্য। অধিকাংশ সময়েই এই খোসা গান গুলোর কোনো অর্থ হয় না এবং মূল গানের সঙ্গে এদের প্রাসঙ্গিকতাও থাকে না। যেমন পঞ্চম গানের শেষ পংক্তিতে আছে—

"গছের আগালোৎ মই,
মারেয়া দাদার ঘটি নাই খলাইত্ পাতে দই।"

মারেয়া অর্থাৎ যে গৃহস্থের বাড়ীতে পূজো হচ্ছে সেই গৃহস্থকে নিয়ে একটু হাসিঠাট্টা করার জন্য গায়ক বলছে যে এই গৃহস্থের বাড়ীতে ঘটি অর্থাৎ মাটির ঘট নেই তাই মাছ রাখার যন্ত্র খলাইতেই তারা দই পাতে। খলাইতে দুধ জমিয়ে দই করা সম্ভব নয়-সকলের জানা। তাই গানের এই খোসা অংশগুলি হাসিঠাট্টার জন্য ব্যবহৃত মাত্র। (উত্তরবঙ্গে আজও দুধ জমিয়ে জমিয়ে দই পাতা হয় মাটির ঘটিতে। এই দই-এর নাম ধটিয়া দই।)

ষষ্ঠ গানটিতেও ভাং-এর মহিমা বর্ণনা। পঞ্চম গানে ভাং-এর মহিমার আভাস রয়েছে ভাং খেয়ে সদ্যপ্রসবী মহিলা সারা বিছানা ভরে মূত্রত্যাগ করে ভাসিয়েছে।

"কাচ পোয়াতি খায় ভাং ছাওয়া ধরিয়া শোতে
ঘুমের ঘোরে ভাঙের নেশায় বিছিনা ভরি মোতে।"

ষষ্ঠ গানে নাওয়ের মাঝিরা ভাং খেয়ে অঘোরে ঘুমোয় এবং সেই সুযোগে সিধ কেটে চোর সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যায় বলে বর্ণনা।

"নাইয়া সব খায়রে ভাং নাওত্ পারে নিন্দ্
ভাঙের ধান্দাত্ পুট্‌কি উদাং চোরে দিয়া যায় সিন্দ্।"

এই গানটিতেও "ভাটি" দেশের কুটুনীর উল্লেখ রয়েছে। শুধু তাই নয়, ভাং-কে "ভাটিয়া" অর্থাৎ ভাটি দেশের ভাং হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

সপ্তম গানটি বাঁশ নিয়ে মাগন করার জন্য নৃত্যগীত সহ যেভাবে গাওয়া হয় যাকে বলা হয় বাঁশ খেলা তার বর্ণনা। বলা হয়েছে "এই বাঁশ খেলাইতে যায় কামাখ্যা শহর।" কামরূপ কামাখ্যা-অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। কামাখ্যার লোক বাঁশকে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বরণ করে নেয় এবং মদনকামের বর কামনা করে।

অষ্টম গানটি বাঁশ খেলতে আসা মদনকে বরণের গান।

"আইলো, আইলো রে, খেলার গোঁসাই আইলো রে।
আইলোরে মদনের মাও, মদনোক্ বরিয়া নেও।"

পূজো শেষে বাঁশ বিসর্জনের পালা। এই বিসর্জনের আগে সব বাড়ি থেকে বাঁশ গিয়ে খোলা মাঠে বাড়ি ঘর থেকে দূরে কোথাও বাঁশের "থলা" বা "মিছিল" বসে। চলে বিভিন্ন দলের নৃত্যগীত প্রতিযোগিতা এমন কি অশ্লীল কথাবার্তা গান ও অঙ্গভঙ্গীর প্রতিযোগিতা। এরপর মদনকামের বাঁশ ঘরে প্রবেশ করবে।

নবম গানটি বাঁশ ঘরে নিয়ে যাওয়ার প্রাক-মুহূর্তে গাওয়া হয়। এই গানটিতে এমন সব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যা ভদ্ররুচির মাপকাঠিতে অশ্লীল।

"আরে হাপ্‌সি আসিল মদনকাম
গছা নাগেয়া দেখো**
মদন ফিরিয়া আসিল রে।"
(**) চিহ্নিত স্থানে যে কথা তার অর্থ যৌনাঙ্গ।

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পূর্ণিমার দিনে বাড়ী বাড়ী ধরে যে মাগন শুরু হয় তা বেশ কয়েকদিন ধরে চলে এবং ৫/৭ দিন পর নির্দ্দিষ্ট থলাতে এসে মহা খেলার পর এই উৎসব শেষ হয়। কেউ কেউ অবশ্য থলায় না গিয়ে পূর্ণিমা বা তার দু'একদিনের মধ্যেই বাঁশ বিসর্জন দেয়. গত কয়েকদিনের খেলাধুলা বাড়ী বাড়ী দৌড়াদৌড়িতে পরিশ্রান্ত হয়ে মদন ফিরে এসেছেন, এবারে মদন কামনা বিধুর পুত্র কামী নারীকে পুত্র বর দেবেন। তাই হাপ্‌সি অর্থাৎ ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে মদন এসছেন। গছা নাগেয়া অর্থাৎ বাতি জ্বালিয়ে অভ্যর্থনা করা হোক তাকে গ্রহণ করার জন্য।

দশম ও একাদশ গান দুটি বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। দশম সংখ্যক বন্দনা গানটিতে পাওয়া যায় সব পালাগানের শুরুতে বিভিন্ন দেবতার বন্দনার সাথে সাথে আসরে উপস্থিত দর্শকদের বন্দনার নমুনা।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সংখ্যক গান দুটিতে মদনকাম পূজার সঙ্গে জড়িত জাগ গান বা কামদেবের গানের দল গঠনের সমস্যা নিয়ে। এই গান করার জন্য যে দল প্রয়োজন সেই দল তৈরি করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে। মূল গিদালের সেই কণ্ঠ আর নেই। ডাইনা পালি, বৈরাগি, খোল বাজানোর বায়েন, ছোকরা কোন কিছুই ভালো পাওয়া যায় না। তাই জাগ গান বাঁচবে কি করে?

কোন্ সময়ে রচিত এই গান তা অনুমান করা কঠিন। তবে এই গান যে বর্তমান শতকের আগে রচিত সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। জাগ গান সে সময়ে ক্ষয়িষ্ণু ;

সমাজ-অর্থনীতির পরিবর্তনের সাথে সাথে রাজবংশী সমাজে এ ধরণের গানের আদর যখন ক্রমাগত কমে আসছে, সেই সময়ের রচনা এই গান। তথাকথিত ভদ্র সমাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার ফলে কামরূপ অঞ্চলের বহির্দেশ থেকে আগত মানুষের সংস্পর্শে এবং এই অঞ্চলে শিক্ষাদীক্ষার শুরুর ফলে আপাত অশালীন কথা ও ভঙ্গিতে ভরা এই গান ক্রমশঃ জনস্বীকৃতি হারিয়েছে। এই গান দুটো থেকেই বোঝা যায় কিভাবে আজ এই সমাজে জাগ গান প্রায় নিশ্চিহ্ন, গবেষকদের সংগ্রহের বস্তু। আবার এই গান দুটিতেই জাগ গানের বৈশিষ্ট্য মতিহারি ও মেয়েবেশধারী ছোকরার উদাহরণ পাওয়া যায়। মতিহারির জবানিতে পাই—"হিব দ্যাখ, ধাম্ ধামাধাম্ ধামরে শালি হ্যার্ দ্যাখ, ধাম্ ধামাধাম্ ধাম্।"......... ইত্যাদি। এবং ছোকরার জবানিতে—"হির দ্যাখ্, হ্যানে বা নাতেন আরো থ্যানেরে গোলাম, আরে হ্যানে বা নাতেন আরো থ্যানেরে।"........... ইত্যাদি।

চতুর্দ্দশ সংখ্যক গানটি কামদেবের মহিমা বর্ণনা উপলক্ষে। এই গানটি একটি ধুয়া দিয়ে শুরু। ফাল্গুন-চৈত্র-বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে অর্থাৎ বৎসরের যে সময়ে কামদেবের পূজা অনুষ্ঠিত সেই সময়ের প্রকৃতির বর্ণনা এই ধুয়াতে—"ফাগুণ মাসের তিগুণ রে জ্বালা। চৈত্র বৈশাখ এই দুই মাসে শরীল হয় কালা ...।"

মূল বিষয় কামদেবের মহিমা, কামদেবের পূজার সঙ্গে প্রকৃতির বর্ণনার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। কিন্তু উত্তরবঙ্গের অন্যান্য সব পালাগানের মত জাগ গানেও ধুয়ার গুরুত্ব রয়েছে। ধুয়া হল কোনও ছুট্‌কা গান যা মূল বিষয় পরিবেশনায় যে পরিকল্পনা করা হয় যেভাবে মালা গাঁথা হয় সেই মালার সূত্র হিসেবে কাজ করে। অনুমান করা হয় যে আগেকার দিনের পালা গানগুলিতে ব্যবহৃত এই ধুয়াগুলিই পরবর্তীকালে একক ভাওয়াইয়া চটকা হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। এই গানটিতে কামদেবের দুঃখ নিবারণী শক্তির ব্যাখ্যা করে আবার একটি অন্য ধুয়া গাওয়া হয়েছে—"বুড়া কয় বুড়িরে ছোট বৌ-এর মুখোতে হাসি..." সেই সঙ্গে সঙ্গে গানটিতে বৈরাগি বা মতিহারি ও ছোকরার কথা কাটাকাটি অর্থাৎ বাখান ব্যবহার করা হয়েছে। জাগ গানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি এই গানটিতে প্রতিফলিত হয়েছে। এই গানটিতে কামরূপে প্রচলিত কাইন প্রথার উল্লেখ আছে। "মুই যদি তোক নাই নেওং রে, ও তুই ছওয়া কোটে পালু" এই অংশে।

পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ সংখ্যক গানগুলি "মোটা জাগ" এর ধুয়ার নমুনা। ধুয়ার প্রথমটিতে রাধাকৃষ্ণের লীলাভিত্তিক জৈব-প্রেম। দ্বিতীয়টি রাধাকৃষ্ণ রুপী নায়িকা ও নায়কের আর একটু গভীর প্রেম। তৃতীয়টিতে একেবারে সরাসরি জৈব প্রবৃত্তি নিবারণের বর্ণনা।

অনুরূপভাবে রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় সংকলিত জাগ গানগুলি নিয়ে আলোচনা করলে তৎকালীন কামরূপের সমাজ-অর্থনীতি-রাজনীতি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানা যায়। প্রথম পালা-রাধার শাক তোলা। পালাটির নাম থেকেই পরিষ্কার যে এই রাধা বৃন্দাবনের রাধা নয়। বৃন্দাবনের রাধা শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি শুনে যমুনায় জল আনতে যায়। দই দুধ বেচতে যায় মথুরার হাটে, কিন্তু রান্নার জন্য শাক তুলতে যায় না। বৃন্দাবনের কৃষ্ণ বাঁশি নিয়ে গরু চরাতে যায় কিন্তু ধোরে* মাছ ধরতে যায় না, রাধাও সেখানে মাছ ধরতে যায় না। এখানে শাক তুলতে যাওয়া রাধা নিতান্তই যুবতী কোনো গ্রাম্য নারী এবং তেমনি কানু এখানে গ্রাম্য যুবক।

"খুঁরিয়া বতুয়া শাকে ক্ষেত গেইচে ভরি
রাধা যায় শাক তুলিতে নয়া ডালি ধরি।"

নটে শাক, বেতে শাক ইত্যাদি ভরা আলুর ক্ষেতে রাধা নাম্নী যুবতী বধু শাক তুলতে যায় এবং সেই সুযোগে তার নায়ক বন্ধু যায় তার সঙ্গে প্রেম করতে। নায়ককে দেখে রাধা পায়ে কাঁটা বিঁধেছে এই অজুহাতে ক্ষেতের ঝোপে বসে পড়ে এবং নায়ককে পায়ের কাঁটা তুলতে বলে। তার ফল—

"বাঁশি থুইয়া হাসি হাসি রাধার কাছে আসি
ক্ষেতের মাঝত্ বসি কানাই সুক্‌খে যায় ভাসি।"

নায়ক জানে তার নায়িকার পায়ে কাঁটা বেঁধেনি, বিঁধেছে মনে, হৃদয়ে।

"কি কাঁটা ফুটিছে তোমার বুঝিতে নারি আমি
হৃদ্দের কাঁটা তুলতে পারঙ্ যদি কও মামী।"

নায়িকা এবারে আরও সুযোগ দেয় নায়ককে, বলে যে তার চোখে বালি পড়েছে। এর ফল—

"পাও ঘাড়ে রাখিয়া কানু চৌকে দিল ফুঁক
এ পালা হইল সারা রাধার কত সুখ।"

দ্বিতীয় পালা কৃষ্ণের ধোরে মাছ ধরা। কামরূপের এই অঞ্চলে বর্ষাকালে পুকুরে জল ঢোকানোর পথে বা চাষের ক্ষেতে কাঁদা মাটি দিয়ে ঘিরে স্বল্প জলের ছোট্ট পুষ্করিণী তৈরি করা হত মাছ ধরার জন্য। ছোট-মাঝারি ধরনের মাছ লাফ দিয়ে পড়ত ঐ ছোট পুষ্করিণীতে যাকে বলা হয় নেটা। এইরূপ এক নেটায় মাছ ধরতে গেছে রাধা এবং তার পিছে পিছে কানুও সেখানে উপস্থিত। যুবতী মামীকে দেখে কানু লোভাতুর চোখে তাকিয়ে আছে এবং এই লোভ দৃষ্টিকে রাধা কাল সাপ রূপে

* 'ধোর' শব্দের অর্থ কোনো বহতা নালার মুখে বা খালের মুখে মাটির আল দিয়ে জল আটকে তৈরি করা মাছ ধরার জায়গা।

বর্ণনা করছে। এই সাপের প্রকৃতি বর্ণনায় কবির প্রশংসা না করে উপায় নেই। এই সাপ—

"সারা রাইত্ পড়িয়া থাকে ঘরের কাইঞ্চায়
বাহির হইলে পাও বেড়িয়া মুখের চুমা খায়।"

কামরূপের গ্রামে ডারাইশ জাতীয় সাপকে এভাবে ঘরের দাওয়ায় পড়ে থাকতে দেখা যেত। সুযোগ পেলেই এই সাপ দংশন করতে ছাড়ত না।

এর পর নায়ক নিজেকে সাপের ওঝা হিসেবে গণ্য করতে চাইলে নায়িকা বলে—

"সাপুড়িয়া বাঁশির সুরে সাপ বাহির হয়া আইসে
তোমার বাঁশির সুরে সাপ জাগিয়া উঠিয়া বইসে।"

এখানে কাম-বাসনাকে সাপ রূপে বর্ণনা করেছেন কবি।

কিন্তু এভাবে কথায় কথায় সময় নষ্ট না করে নদীতে স্নান করে বাড়ি ফিরে যাওয়ার প্রস্তাব দেয় নায়ক। নায়ক কানাইর প্রস্তাব—

"এ উজান বয়সে মামী উজান বয়া যাই
তোমার অঙ্গে অঙ্গ দিয়া একবার সাঁতার খাই।
ভরা যৌবন তোমার ভরা পুরা বান
ইয়াত্ জায় সাঁতার দেয় সেই তো ভাগ্যবান।"

নায়কের প্রস্তাব নায়িকার পছন্দ হয়। সে গলা জলে নামে স্নান করতে। নায়ক আর বিলম্ব না করে সঙ্গে সঙ্গে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নায়িকাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে রাধা বলে—

"ননদিরে শাশুড়িকে কইবেন বিচারি
কুম্ভীরে লইল তোমার যুয়ান বউরি।"

এর ফল অত্যন্ত স্বাভাবিক—

"অকুল দরিয়ায় ভাসিল কলঙ্কিনী রাই
এ পালা হইল সারা এখন বাড়ী চলি যাই।"

তৃতীয় পালা কৃষ্ণের বড়শীতে মাছ ধরা। কানাই ছিপ নিয়ে মাছ ধরতে যায় সেই ঘাটে যেখানে রাধা স্নান করছে। রাধা কৃষ্ণের চিরন্তন সম্পর্ক মামী ভাগ্নে অবলম্বনে নায়ক-নায়িকার কথোপকথন খুব সুন্দর ভাবে ফুটে উঠেছে এই গানটিতে। কথার মারপ্যাচে নায়ক-নায়িকার প্রেমের প্রকাশ ও বিকাশ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মতো।

"রাধা কয় কি এ মাছ রুই না কাতল।
রুই মাছের মুড়া মিঠা আর মিঠা কোল॥

কানাই কয় কেনে মামী দেন জলের ছিটা।
তোমার কোল হইতে কি মামী রুইয়ের কোল মিঠা ॥"

উত্তরে রাধার উক্তিতে দেখি—"রুইয়ের মাথা ছাড়িয়া তুঞি খালু মোর মাথা।" শুধু তাই নয় কানাই-এর প্রেমে পাগল রাধার উক্তি—

"যৌবন জলে সুখে ভাসি পুঁটি মাছের মত
মিঠার লোভে গিলনু বড়শী এলা হনু হত ॥"

প্রসঙ্গক্রমে রাধা কানাইকে তার মামার ভয় দেখায়—

"অলপে অলপে যাও বাড়ীত্ চলিয়া
হাড় ভাঙ্গিয়া দিবে যদি দেখে দেওয়ানিয়া।"

'দেওয়ানিয়া' শব্দটি আমরা প্রথম ও দ্বিতীয় গানেও পেয়েছি। দেওয়ানি বা দেওয়ানিয়ার সহজ সরল অর্থ গৃহস্থ। তবে অনেক সময়েই কথাটি নেতা অর্থে ব্যবহৃত। যেমন—"খুব দেওয়ানি হইছিস, না?" অথবা "আজকাল উয়ায় (সে) খুব দেওয়ানি হইচে।" "অত দেওয়ানিগিরি করিস না" ...... ইত্যাদি। তবে অধিকাংশ সময়েই এই কথাটি স্ত্রীরা ব্যবহার করেন স্বামীকে বোঝাতে, যেমন এই গান তিনটিতে। প্রথম গানে—"দেওয়ানিয়া ভালবাসে খুরিয়া শাকের ভাজা"তে নায়িকা বলছে যে তার স্বামী নটে শাকের ভাজা খেতে ভালবাসে তাই জোয়ান বধু হয়েও তাকে আলুর ক্ষেতে শাক তুলতে যেতে হয়।

"দেওয়ানিয়া সাপের রোজা চারিদিকে ডাক
দেখাইবে তায় যদি পায় কালা সাপের নাগ।"

চিরন্তন পদ্ধতিতে নায়িকা ভয় দেখায় যে তার স্বামী যদি নায়কের নাগাল পায় তবে তার নিস্তার নেই।

তৃতীয় পালাতেও ঐ একই ভাবে নায়িকা ভয় দেখায় যে নায়কের নাগাল পেলে দেওয়ানিয়া অর্থাৎ নায়িকার স্বামী ছেড়ে কথা কইবে না, হাঁড় হাড্ডি গুঁড়ো করে দেবে।

চতুর কানাই (নায়ক) এ কথার উত্তরে বলে যে তেমন কিছু ঘটণা ঘটলে সে লুকিয়ে পড়বে রাধার অঙ্গে।

"তোমার অংগ কাঞ্চা সোনা সোনার উঠে ঢেউ
তোমার অঙ্গে লুকাইলে না দেখিবে কেউ।"

শুধু তাই নয়, কানাই আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে যায় এবং বলে যে রাধার গলায় যে হার আছে তার চেয়ে অনেক বেশি শোভা পাবে কানাই-এর বাহু দুটি।

"এই আমার বাহু দুটি নীলমণির মত।
গলা জড়াইলে মামী শোভা হইবে কত ॥
গলা জড়াইলে মামী বুকে পড়মো তোর
সোনার অঙ্গে মানিকের হার দেখিয়া হইমেন ভোর ॥"

নায়কের এই আহ্বানে সাড়া দেওয়া ছাড়া নায়িকার উপায় নেই। তাই কবি রতিরাম দাস গাইছেন—

"হাসিতে হাসিতে রাধা জলত্ যায়া পড়ে।
আস্তে ব্যস্তে ধরে কানাই নামিয়া জলের তোড়ে ॥
রাধারে ধরিয়া কানাই জলে দিল ডুব।
আজিকার পালা সারা সুখ হৈল খুব ॥"

কবি রতিরাম দাসের চতুর্থ পালাটি রাস। রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার চরম প্রকাশ রাস লীলায়। রতিরাম দাসের কবিত্ব শক্তিরও চরম উৎকর্ষতা প্রকাশ পেয়েছে তার রাস পালাতে। বিষয় নির্বাচন, বর্ণনা, রস সৃষ্টি, ভাষার তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ, আর্থ-সামাজিক ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেশন ইত্যাদি সব দিক থেকেই এই পালাটি অনন্য।

পালাটি শুরু প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে। কার্তিক মাসের মাঝামাঝি সময়ে কামরূপের প্রকৃতির যে অবস্থা তা হল বর্ষা চলে গেছে, নদীর চর কাশ ফুলের সমারোহে সুন্দর হয়ে উঠেছে, রাস্তায় কাঁদা ইত্যাদি শুকিয়ে গেছে, ঝড়, বৃষ্টি থেমে গেছে—শীতও নয় গরমও নয়, মাথার উপরে নীল আকাশ, মাছি মশার উপদ্রব তেমন নেই, নদীর জল স্বচ্ছ এবং তাতে জ্যোৎস্নার আলো পড়ে নদীর জল চকচক করছে। প্রকৃতির এই উৎফুল্লতায় কানাই এর মনে পড়েছে গোপিনীদের কথা, তাই তো বাঁশির মধুর সুরে তাদেরকে আহ্বান। কানাই-এর এইরূপ আচরণে গোপিনীরা অস্বস্তি বোধ করে। তাই প্রতিশোধ নেওয়ার উদ্দেশ্যে, কানাইকে বোকা বানানোর উদ্দেশ্যে ব্রজের সব কুলবধূ আজ একই রকম সাজপোশাক পরিধান করে কানাই-এর সঙ্গে মিলিত হবে এবং তাকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়বে। কানাই-এর চরিত্র বর্ণনা করেছেন কবি এভাবে—

"মাইয়া মানুষ দেখ্‌লে তার উচাটন মতি।"

এবং "মাইয়া মানুষ দেখ্‌লে তার জিভার পড়ে নাল।"

এই চরিত্রের কানাইকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ায় জন্য কুলবধুরা ফন্দি এঁটেছে—

"সবে বলে দেখাবো আজি কেমন চিকন কালা।
চিনিয়া নেউক কাঁঞ তার রাধা সেই রূপসী বালা।"

কানাই যেমন একদিন কুলবধূদের বসন চুরি করে বৃক্ষডালে বসে মজা দেখেছে, আজ তারা সেই প্রতিশোধ নেবে—।

"নীল শাড়ি চুরি করি বসি ছিল ঠ্যালে
আজ তার পত্তিশোধ দিমো রাত্তির কালে।"
"সবাই পরমো তাকে ছিঁড়াছিঁড়ি করি।
দেখিমো কেমন করেন একেলা মুরারি ॥
এই যে কাচুলি গুলা বড় হইচে কশা।
একবার দিলে আর না যায় তাক্ খসা।

সবাই কানাইকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে তাদের কাচুলির বাঁধন খুলতে বলবে কানাই-এর সাহস পরীক্ষার উদ্দেশ্যে।

"এগুলা ছিঁড়িয়া ফেলাও দুষ্ক কর দূর।
দেখিমো কালিয়া ছোঁড়ার কত বুক পুর ॥
দুইখানি কানুর হাত এতেক রমণী।
দেখিমো দেখিমো কেমন করেন নীলমণি ॥"

কিন্তু রাধাকৃষ্ণলীলার চিরন্তন সত্যানুযায়ী গোপিনীদের এই পরিকল্পনা সফল হয় না।

"যতেক গোপিনী আছিল তত হৈল কানু।
নাচিতে লাগিল সবে ডগমগ তনু ॥

কানাইর সঙ্গে তাদের এই নাচের আর শেষ নেই।

"নাচিতে নাচিতে সবার ছিঁড়িয়া গেল ডুরি।
খসিল কাচুলি তাদের খইসে যেন শাড়ী ॥

নাচের চরম অবস্থা কবি বর্ণনা করেছেন এই ভাবে—

"কামের বাতাসে সবার উঠিছে হিল্লোল।
রাসের তরঙ্গে সবার বাড়িছে কল্লোল ॥
সকল নারীর শিরা কানাইর সাধা।
আপনি হইছে গঙ্গা তায় গৌরী রাধা ॥

এভাবেই কবি তার কানাই ধামালি 'রাস' পালা বর্ণনা করেন।

এই পালাগুলি রচনাকালে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে কবি এবারে তার নিজের সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন। কবি রতিরাম দাস কিন্তু শুধু নিজের নাম ধাম বলেই ক্ষান্ত থাকেন না।

নিজের গ্রামের পরিচয় দিতে গিয়ে সুকৌশলে তিনি তার গ্রাম ইটাকুমারী যে জেলায় অবস্থিত সেই রংপুরের প্রাচীন ইতিহাস অর্থাৎ কামরূপের ইতিহাসকে পাঠকের সামনে তুলে ধরেন। প্রাচীন কামরূপ থেকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কামতাপুর, কোচবিহার প্রভৃতি নামে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তার জন্মভূমি কিভাবে ঐতিহাসিক পটভূমিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সে ইতিহাস তিনি সুকৌশলে উন্মোচন করেছেন এই গানের মাধ্যমে। শুধু তাই নয় তার জাতি যাকে তিনি ভঙ্গ ক্ষত্রিয় আখ্যা দিয়েছেন সেই জাতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাসও তিনি এই গানে বর্ণনা করেছেন। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস আলোচনায় কবি রতিরাম দাসের গানের এই অংশ আজও উল্লেখিত হয়।

এই সীমার মাঝে দেশ পোণ দুয়ার থিতি।
এ দেশে আমাদের জাতির বসতি ॥
হায়রে রাজার বংশে লভিয়া জনম ॥
পরশু রামের ভয় এ বড় শরম ॥
রণে ভঙ্গ দিয়া মোরা এ দেশে আইসাছি।
ভঙ্গ ক্ষত্রি রাজবংশী এই নামে আছি ॥"

বর্তমান শতাব্দীর একেবারে গোড়াতেই অর্থাৎ ১৯০৮/১৯০৯ সালের দিকে রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার বাসিন্দা, রংপুরে ওকালতি ব্যবসায় রত পঞ্চানন সরকার। তার অল্প কিছুদিন পরেই পঞ্চানন সরকার উত্তরবঙ্গের সমগ্র রাজবংশী জাতির সামাজিক রাজনৈতিক নেতা হিসেবে ক্ষত্রিয় আন্দোলন শুরু করেন। তখন তাঁর নাম হয় পঞ্চানন বর্মা। ১৯১১ সালের আদম সুমারিতে রাজবংশীদেরকে 'কোচ" হিসেবে চিহ্নিত করার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষত্রিয় আন্দোলন বিশাল আকার ধারণ করে এবং সমগ্র উত্তরবঙ্গ আসামে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১৩ সালে, বাংলা ১৩১৯ সালের ২৭শে মাঘ দিনাজপুর জেলার ডোমার থানার পেরোলবাড়ী গ্রামে করতোয়া তীরে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় মহামিলন দিবস অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অসংখ্য ক্ষত্রিয় যুবক মস্তক মুণ্ডনের পর প্রায়শ্চিত্ত করে উপবীত (পৈতা) গ্রহণ করেন। রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় আন্দোলন আজও চলছে এবং প্রতি বছর ২৭শে মাঘ দিনটি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আজও মহামিলন দিবস হিসেবে পালিত হয়। রাজবংশীরা সভাসমিতির মাধ্যমে এই দিনটি পালন করার সময়ে তাদের নিজেদের জাতির ইতিহাস আলোচনা করেন। এই আলোচনায় তাদের ক্ষত্রিয়ত্ব দাবীর বড় প্রমাণ সূত্র হিসেবে উল্লেখিত হয় রতিরাম দাসের জাগ গানের এই অংশ বিশেষ।

নিজের জাতি ও দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা বর্ণনা করেই থামেন নি তিনি। ইংরেজ আমলে ভারতবর্ষের জমিদারির যুগে গ্রামের মানুষের সামাজিক-

অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক অবস্থার নিপুণ বর্ণনা দিয়েছেন। ইংরেজ নিযুক্ত ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচার, তার গ্রাম ইটাকুমারীর জমিদার শিবচন্দ্রের প্রজা বাৎসল্য ও দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, কারাবরণ ইত্যাদির বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন। এই বিবরণ দিতে গিয়ে একটি গ্রামের তাঁতী পাড়া, কুমোর পাড়া, বামুন পাড়া ইত্যাদির সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর এই বর্ণনায় তৎকালীন কামরূপের একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রামের পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। বামুন, কায়েত, ধোপা, নাপিত, কুমোর, কামার, কৃষক, শ্রমিক, গোয়ালা, তাঁতি প্রভৃতি সকলকে নিয়ে এই গ্রামগুলি ছিল পরস্পর-পরস্পরের সাহায্য সহযোগিতায় আত্মনির্ভর। গ্রামের কৃষক, শ্রমিক মানুষ যাদের অধিকাংশ রাজবংশী ও মুসলমান তারা কিভাবে জমিদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন।

"ব্রাহ্মণের শ্রীপাদ পদ্মে করি পরনাম।
নিবেদন করে দাস জাতি নাম ধাম ॥

পালা শেষে এই ভাবে শুরু হয়েছে কবি পরিচয়। নিজ দেশ ও জাতির বর্ণনা শুরু করেছেন খুব সুকৌশলে—।

"পূরব দিগেতে ব্রহ্মপুত্রের মেলানি।
পশ্চিমে কুশাই গঙ্গা আছয়ে ছড়ানি ॥"

উপরের এই পংক্তি থেকে

যেই হতে দিল্লীর বাদশাহ হইল রাজা।
প্রজাগুলা পূর্বের মত নাহি থাকে তাজা ॥
নিজের ভগিনী দিয়া বাদশাহের কাছে।
মানসিংহ পাইল মান এইরূপ ছাঁচে ॥"

—এই অংশে কবি কামরূপ, পৌণ্ড্রবর্ধন, কামতাপুর, কোচবিহার রাজ্যের অর্থাৎ ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ইতিহাস ও সেখানকার প্রধান জনগোষ্ঠী রাজবংশীদের ইতিহাসের সূত্র ধরিয়ে দিয়েছেন এই জাগ গানের মাধ্যমে। সংকলিত জাগ গানের পালাটির গুরুত্ব বুঝতে হলে সেই ইতিহাসের বিশদ আলোচনা প্রয়োজন।

রাজবংশীদের ইতিহাস সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় জাগ গানটির রচয়িতা কবি রতিরাম দাস এখানে তারই উল্লেখ করেছেন। এই তথ্যের ভিত্তিতে রাজবংশীগণ দাবী করেন যে তারা পৌণ্ড্রবর্ধনের ক্ষত্রিয় জনগোষ্ঠীর উত্তরসূরী।

ভ্রামরীতন্ত্রে বলা হয়েছে যে, নন্দীসুতের ভয়ে ভীত বর্ধনের পঞ্চ পুত্র জ্ঞাতি ও বন্ধুদের সঙ্গে পৌণ্ড্রবর্ধন থেকে রত্নপীঠে এসে বসবাস শুরু করে। সেখানে ব্রাহ্মণসঙ্গ অভাবে তারা ক্রমশঃ ক্ষাত্রধর্মচ্যুত হয়। এই স্বধর্মচ্যুত ক্ষত্রিয়রাই পৃথিবীতে রাজবংশী নামে খ্যাত।

"নন্দীসুত ভয়াদ্ভীমে পৌণ্ড্রদেশাৎ সমাগতাঃ
বর্ধনস্য পঞ্চপুত্রাঃ স্বগনৈর্বান্ধবৈঃ সহ।
রত্নপীঠং বিতিস্ততে কালাদ্বিপ্রসঙ্গমাৎ
ক্ষাত্রধর্মাদপক্রান্তা রাজবংশীতি খ্যাতাঃ ভূবি।"

কালিকাপুরাণ অনুসারে জামদগ্ন্যের ভয়ে ভীত ক্ষত্রিয়রা ম্লেচ্ছের সমাবেশে ভগবান জল্পেশ দেবের শরণাপন্ন হয় এবং ম্লেচ্ছাচারে অভ্যস্ত হয়ে ম্লেচ্ছভাষা ব্যবহার করতে থাকে। তবে তারা গোপনে মহাদেবের পূজা চালিয়ে থাকে।

জামদগ্ন্য ভয়াদ্ভীতাঃ ক্ষত্রিয়া পূর্বমেবহি
ম্লেচ্ছ ছদ্মানুপাদায় জল্পীশং শরণং গতাঃ

কালিকাপুরাণের সপ্ততিতম অধ্যায়ের সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ করেছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যারত্ন মহাশয়।

"জামদগ্ন্য ভয়ে পূর্বে ক্ষত্রিয় নিকর।
শরণ লইল আসি জল্পীশ গোচর ॥
ধরিয়া ম্লেচ্ছত্ব বেশ রহিল তথায়।
নিরন্তর থাকে রত ইহার পূজায় ॥
গুঢ়ভাবে থাকি সদা কৈলাশের পতি।
পালন করেন যত ক্ষত্রিয় সংহতি ॥

ভ্রামরীতন্ত্রের মতানুসারে ক্ষত্রিয়রা নন্দীসুতের ভয়ে রত্নপীঠে আশ্রয় নেয়। পক্ষান্তরে কালিকাপুরাণের মতে তারা জামদগ্ন্যের ভয়ে ভীত হয়ে জল্পীশ দেবের শরণ নেয়।

অনেক পণ্ডিত মনে করেন কালিকাপুরাণোক্ত জামদগ্ন্য (পরশুরাম) এবং ভ্রামরীতন্ত্রোক্ত নন্দীসুত একই ব্যক্তি। ক্ষত্রিয় নিধনকারী ঐতিহাসিক পুরুষ নন্দীসুতকে পরশুরাম আখ্যা দেওয়া হয়েছে এই অনুমানের পক্ষে সমর্থন মেলে বিষ্ণুপুরাণে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে। বিষ্ণুপুরাণে আছে যে, মহানন্দীর ঔরসে শূদ্রাণীর গর্ভে অতিলোভী মহাপদ্মনন্দের জন্ম হবে। এই মহাপদ্মনন্দ পরশুরামের মত ক্ষত্রিয় নিধন করবে এবং তখন থেকে শূদ্রই ভূমিপালক বা রাজা হবে।

শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

মহানন্দীর ঔরসে, শূদ্রা স্ত্রীর গর্ভে ক্ষত্রিয় বিনাশকারী রাজা মহাপদ্মের জন্ম হবে এবং পরশুরামের মত ক্ষত্রিয় নিধনকরে পৃথিবীর একচ্ছত্র শাসকে পরিণত হবে।

অতঃপর প্রশ্ন উঠে, রত্নপীঠ ও জল্পীশের অবস্থান ভূমি কি এক? এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রাজবংশীদের বাসভূমি প্রাচীন কামরূপ ছিল চারভাগে বিভক্ত— কামপীঠ, যোনিপীঠ, মণিপীঠ ও রত্নপীঠ। রাজ্যের সর্বপশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত রত্নপীঠ। যোগিনীতন্ত্রে রয়েছে এই তথ্যের সমর্থন। বুকানন হ্যামিলটনের রিপোর্টেও এ তথ্যের উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাচীন কামরূপের সীমারেখা ও বর্তমান জল্পেশের অবস্থান (জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার অন্তর্গত) বিচার করলে একথা স্বীকার করতে কোনও বাধা নেই যে, রত্নপীঠ ও জল্পীশের অবস্থান ভূমি এক। স্বাভাবিক প্রশ্ন ভ্রামরীতন্ত্রোক্ত পৌণ্ড্রদেশ-এর অবস্থান কোথায়?

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার বলেছেন—"পৌণ্ড্র একটি জাতির নাম। ইহারা উত্তরবঙ্গে বসবাস করিত বলিয়া এই অঞ্চল পুণ্ড্রদেশ ও পুণ্ড্রবর্ধন নামে খ্যাত ছিল।... পুণ্ড্রদেশের রাজধানীর নামও ছিল পুণ্ড্রবর্ধন। প্রাচীনকালে ইহা একটি প্রসিদ্ধ নগরী ছিল। বগুড়ার সাত মাইল দূরে অবস্থিত মহাস্থানগড়ই প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন নগরীর ধ্বংসাবশেষ বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। কারণ মৌর্যযুগের একখানি শিলালিপিতে এই স্থানটি পুণ্ড্রনগরী বলিয়া উল্লিখিত।"

রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই অভিমত এখন মোটামুটিভাবে সর্বজনগ্রাহ্য। মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে, পৌণ্ড্র, ওড্র, দ্রাবিড়, কম্বোজ, যবন, শক, কিরাত ইত্যাদি ক্ষত্রিয়রা উপনয়নাদি সংস্কারের অভাবে এবং ব্রাহ্মণের অদর্শনে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ের ৪৪ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় কুল্লুক মন্তব্য করেছেন যে, ক্ষত্রিয়রা, যারা পৌণ্ড্রদেশে বাস করত, বৈদিক আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করে এবং শূদ্রে পরিণত হয়। মনুসংহিতার বিধান অনুযায়ী বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যরা যে কোন কারণেই হোক, বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধান লংঘন করলে ব্রাত্য পদবাচ্য।

উপরে আলোচিত এইসব যুক্তির ভিত্তিতে দাবি করা হয় যে পৌণ্ড্রদেশ থেকে রাজা মহাপদ্মনন্দের ভয়ে ভীত কিছু সংখ্যক পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় করতোয়া নদী অতিক্রম করে রত্নপীঠ বা জল্পেশ দেবের অবস্থান ভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ব্রাহ্মণের অভাব অদর্শনজনিত কারণে বৈদিক আচার অনুষ্ঠানে বিরত থেকে ম্লেচ্ছ সংসর্গে ক্রমশ ম্লেচ্ছে পরিণত হয় ও ম্লেচ্ছ ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীগণ এদেরই বংশধর।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের উদ্ভব বিষয়ে দেশীয় এবং বিদেশী গবেষকবৃন্দ আজ পর্যন্ত কোনো একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। এই বিষয়ে অভিমতগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ গবেষকদের একটি অংশের মতে তারা দ্রাবিড় নরগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আবার কারও কারও মতে তারা মিশ্র অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলিয়ান নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে উদ্ভূত। গবেষকদের, বিশেষ করে ইংরেজ গবেষকদের এই সংক্রান্ত বিচার্য বিষয়ের মধ্যে একটি প্রধান বিতর্ক হল রাজবংশী ও কোচ এক জাতি কিনা। ইংরেজ গবেষকদের অনুসরণ করে একই বিতর্কে সমানভাবে জড়িয়ে পড়েছেন দেশীয় গবেষকরাও। সুতরাং এই বিষয়টি সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ, যোগিনীতন্ত্র, কালিকাপুরাণ প্রভৃতিতে এই অঞ্চলের পরিচয় রয়েছে 'প্রাগজ্যোতিষ' হিসেবে। পরবর্তীকালে এই প্রাগজ্যোতিষের পশ্চিমাংশ কামরূপ নামে খ্যাতি লাভ করে। প্রাগজ্যোতিষ বা কামরূপ সম্পর্কে প্রাচীন প্রবাদ আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হয়ে ঐ রাজ্য নরক রাজাকে প্রদান করেন। তিনি নরককে কামরূপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কামাক্ষ্যা মন্দিরের রক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। নরক কৈলাশপতি মহাদেবের প্রতি অন্যায় আচরণ করাতে কৃষ্ণ তাকে সংহার করে তার পুত্র ভগদত্তকে কামাক্ষ্যা দেবীর দ্বারপাল হিসেবে নিযুক্ত করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ভগদত্ত কৌরবদের পক্ষে যুদ্ধ করেন এবং অর্জুন কর্তৃক নিহত হন। কিন্তু তাঁর বংশজাত ব্যক্তি বহুকাল পর্যন্ত কামরূপে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন সুবাহু ও সুপারুরা।

ভগদত্তের বংশের পরে কামরূপে কয়েকজন শূদ্র রাজা রাজত্ব করেছিলেন বলে অনুমান করা হয়। খ্রিস্টিয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে শূদ্রবংশীয় দেবেশ্বর কামরূপের রাজা ছিলেন। আরও অনুমান করা হয় যে, দেবেশ্বরের বংশজাত পৃথু নামে একজন রাজা পশ্চিম কামরূপে (বর্তমান জলপাইগুড়ি) রাজত্ব করতেন। এই প্রসঙ্গে জলপাইগুড়ির সন্নিকটস্থ "পৃথু রাজার গড়" (বর্তমানে বাংলাদেশ) উল্লেখ্য। ৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নাগশংকর নামে জনৈক রাজা পূর্ব কামরূপে রাজত্ব করতেন।

চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র সম্রাট অশোকের ধর্মসভায় কামরূপের প্রতিনিধি প্রেরিত হয়েছিল। আনুমানিক খ্রিস্টিয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীতে সাঙ্গলদেব নামক কোচ দেশের জনৈক রাজা কামরূপে অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছিলেন।

খ্রিস্টিয় চতুর্থ থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কামরূপের ইতিহাস অনেক দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ইতিহাসের রসদ পাওয়া যায় বিখ্যাত চীনা বৌদ্ধ ভ্রমণকারী হিউয়েন-সাঙ্-এর বিবরণ, বাণভট্টের 'হর্ষচরিত' প্রভৃতি থেকে।

নরক বংশীয় রাজা পুষ্যবর্মন (পুষ্য বর্মা) কামরূপকে প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদান করেন। তিনি মহারাজাধিরাজ উপাধিও গ্রহণ করেছিলেন। এই বর্মন বংশ কামরূপে রাজত্ব করে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত। সপ্তম শতাব্দীতে কামরূপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৃপতি ভাস্কর বর্মনের (ভাস্কর বর্মা) আমন্ত্রণে হিউয়েন-সাঙ্ কামরূপ ভ্রমণে আগমন করেন এবং তাঁর বিবরণ থেকে তৎকালীন কামরূপ সম্পর্কে অনেক ধারণা লাভ করা সম্ভব। ভাস্কর বর্মন ছিলেন সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক এবং তিনি কর্ণ সুবর্ণের রাজা শশাঙ্ককে পরাজিত করেন।

ভাস্কর বর্মার পর কামরূপ রাজত্বে অধিকার লাভ করেন শালস্তম্ভ এবং এই শালস্তম্ভ বংশীয় রাজারা কামরূপে রাজত্ব করেন দশম শতাব্দী পর্যন্ত। এই বংশের শেষ রাজা ছিলেন ত্যাগ সিংহ। অপুত্রক ত্যাগ সিংহের মৃত্যুর পর জনগণ নরক বংশীয় কোন নেতাকে রাজত্বে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং পালবংশীয় ব্রহ্ম পাল রাজত্ব লাভ করেন। ব্রহ্ম পালের পর তাঁর পুত্র রত্ন পাল রাজত্ব লাভ করেন একাদশ শতকে। দ্বাদশ শতকের রাজা ধর্মপাল এই বংশের এক বিখ্যাত রাজা হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কালিকাপুরাণ এই ধর্মপালের সময়ে রচিত হয়েছিল বলে স্বর্গীয় কনক লাল বড়ুয়ার অভিমত।

পালবংশীয় চতুর্দশ রাজা রামপাল (১০৭৭-১১০২ খ্রিস্টাব্দ) বরেন্দ্র ভূমির কৈবর্ত বিদ্রোহ দমন করে কামরূপ পুনরধিকার করেন। কথিত আছে এই রামপাল পরশু (কুঠার) হস্তে যুদ্ধ করতেন। প্রাচ্য বিদ্যার্নব নগেন্দ্র নাথ বসু ইঙ্গিত করেছেন যে পরশু হস্তে যুদ্ধনিপুন রামপালই পরশুরাম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে (বরেন্দ্রভূমির) ক্ষত্রিয় নিধন করেন। রাম পালের পুত্র কুমার পাল তাঁর মন্ত্রী পুত্র বৈদ্য দেবকে কামরূপের কোনও অংশের রাজা করেছিলেন। এই বৈদ্য দেব পরে কামরূপে স্বাধীনতা অবলম্বন করেন। বৈদ্য দেবের পর রাজত্ব করেন বল্লভ দেব।

দ্বাদশ শতাব্দীর অবসানের সঙ্গে সঙ্গে গৌড় রাজ্যে হিন্দু রাজাদের সঙ্গে মুসলমান আধিপত্য স্থাপনের সংঘর্ষের ইতিহাস। 'নওদীয়া' বিজয়ের পরে ১২০৭ খ্রি: স্বনামধন্য ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বখ্‌তিয়ার খিলজী কামরূপের মধ্যদিয়ে তিব্বত জয়ে অগ্রসর হন এবং পথে কামরূপ রাজ্য জয়ের স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন সফল হয়নি। বাংলার শাসক গিয়াসউদ্দীন ১২২৭ খৃঃ সাদিয়া পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র তীরবর্তী অঞ্চল দখল করেন বলে অনুমান। তবে এই দখল তিনি বেশিদিন রাখতে পারেননি। পরবর্তী মুসলমান আক্রমণ ঘটে ১২৫৭ খ্রিস্টাব্দে বখ্‌তিয়ারউদ্দীন উজবক তুঘ্রিল খান কর্তৃক। তুঘ্রিল খানও এই দখল রাখতে পারেননি। কামতাপুর সৈন্যদের কাছে তাঁর পরাজয় ও মৃত্যু ঘটে। তাঁর সৈন্যদের মুষ্টিমেয় কয়েকজন পলায়নে সক্ষম হয়। আবার ১৩৩৭ খ্রি: মহম্মদ শাহ্ বহুসংখ্যক সৈন্য পর পর দু'বার কামতাপুর দখল করার জন্য পাঠান কিন্তু তিনিও এই কার্যে সফল হননি।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পূর্ব অসমে কাছাড়িদিগের আধিপত্য কালে তাঁরা দূর পশ্চিমে অর্থাৎ কামরূপেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে 'ছুটিয়া' জাতীয়েরা পূর্ব কামরূপে রাজত্ব বিস্তার করেন। বীর পাল, সোনাগিরি পাল, রত্ন পাল প্রভৃতি এই বংশের রাজাদের মধ্যে অন্যতম। 'ছুটিয়া' বংশের রাজত্বের প্রায় একই সময়ে অহোম বংশীয় আদি রাজা চুকা ফা সদলবলে আসামে প্রবেশ করেন। এবং তাঁর বংশধরেরাই পূর্ব কামরূপে প্রভুত্ব করেন।

এই সময়ে ভুঁইঞাদের শাসন সংক্রান্ত কিছু কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। বাংলার বারো ভুঁইঞার শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল বলে কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় যা থেকে অনুমিত হয় যে, কোনও বড় বীর শাসনকর্তার অভাবে এই অঞ্চলে কিছু কিছু প্রাদেশিক শাসন কর্তার উদ্ভব হয়ে থাকবে। এই বারো ভুঁইঞাদের মধ্য থেকে দুর্লভনারায়ণকে কামতার রাজা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি বড় নদী ও করতোয়ার মধ্যবর্তী ভূখণ্ডে শাসন করতেন বলে অনুমিত হয়।

কামরূপ-কামতার পরবর্তী শাসকদের ইতিহাস অনেক স্পষ্ট। এই সময়ে রাজ্যের নাম হয় কামতাপুর। কালিকাপুরাণে ৬২তম অধ্যায়ে কামাখ্যাদেবীর অপর নাম কামদা। কামদা থেকে কামদাপুর এবং লোকমুখে কামতাপুর। কামতাপুরে রাজত্ব করেন খেন্ বা খ্যান বংশের রাজারা যারা নিজেদেরকে কায়স্থ বলে দাবী করেন যদিও গবেষক পণ্ডিতগণ তা স্বীকার করেন না। কথিত আছে এই বংশের প্রথম রাজা নীলধ্বজ গরুর রাখাল ছিলেন। তাঁর ব্রাহ্মণ মালিকের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসরণ করে ঐ ব্রাহ্মণের সাহায্যে তিনি তৎকালীন রাজাকে অপসারণ করে কামতার সিংহাসন দখল করেন এবং ব্রাহ্মণকে তাঁর মন্ত্রী করেন। অবশ্য সে রাজ্যের সীমারেখা ছিল খুবই ছোট-প্রাচীন কামরূপের সামান্য অংশমাত্র। এরপরে রাজা হন তাঁর পুত্র চক্রধ্বজ। কথিত আছে কামতেশ্বর চক্রধ্বজ হস্তিনাপুর থেকে কামরূপ রাজ ভগদত্তের কবচ এনে কোচবিহার জেলার গোসানিমারিতে তা স্থাপন করে তদুপরি এক মন্দির নির্মাণ করেন। এই গোসানিমারির মন্দির আজও বিদ্যমান এবং এই গোসানিমারিতেই ছিল কামতাপুরের রাজধানী। কামতাপুরে চক্রধ্বজের পরের রাজা নীলাম্বর। নীলাম্বরের সময়ে রাজ্যের সীমারেখা বহুল পরিমাণে বিস্তৃত হয় এবং রাজ্যে রাস্তাঘাট ইত্যাদির সাহায্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়। নীলাম্বরের রাণীর সঙ্গে মন্ত্রী শশীপাত্রের পুত্রের অবৈধ সম্পর্ক গড়ে ওঠে জানতে পেরে রাজা মন্ত্রীপুত্রকে বধ করে সেই মাংস মন্ত্রীকে খাওয়ান। মন্ত্রী মনের দুঃখে রাজ সংসর্গ ত্যাগ করে গোপনে গৌড়ের নবাব হোসেন শাহের সঙ্গে যোগাযোগ করে কামতাপুর আক্রমণ করেন। মন্ত্রীর প্রতিশোধ স্পৃহা ও গৌড়ের শাসনকর্তা হোসেন শাহের সঙ্গে মিলিত হয়ে কামতা রাজ্য আক্রমণের ইতিহাস সুবিদিত। কথিত আছে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পরেও রাজাকে

পরাজিত করতে না পেরে নবাব হোসেন শাহ ১২ বছর কাল পর্যন্ত কামতা নগর অবরোধ করে থাকেন এবং অবশেষে কুট কৌশলের আশ্রয় নেন। রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে মুসলমান রমণীগণ অন্তঃপুরবাসী রানীদের সঙ্গে একবার দেখা করবে এই অনুমতি লাভ করে দোলায় বোরখা পরিহিত সশস্ত্র যোদ্ধা পাঠিয়ে দেন। দুর্গমধ্যে প্রবেশ করে সশস্ত্র যোদ্ধারা নগর অধিকার করেন এবং রাজাকে বন্দী করেন। কবি রতিরাম দাস এই ইতিহাসেরই উল্লেখ করেছেন। "এ জেলায় শেষ রাজা রাজা নীলাম্বর......সেই হাতে পুঁড়ি গেল এই পুণ্য দেশ।" হোসেন শাহ্ কর্তৃক গৌড় দখল সংঘটিত হয়েছিল ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে। সেখান থেকে হোসেন শাহ্ অসম দখলের চেষ্টা করেন এবং লাভে মূলে সব হারান। দখলীকৃত কামতা তাঁর হাত ছাড়া হয়ে যায়।

মুসলমানদের পলায়নের পরে এই ভূখণ্ডে কোনও বড় নৃ-পতির উল্লেখ পাওয়া যায় না—ছোট ছোট স্বাধীন সর্দার বা মণ্ডল এই ভূখণ্ডে শাসন করেন যাদের মধ্যে খ্যাতি লাভ করেন চন্দন ও মদন দুই ভাই। এর পরেই ঐ সর্দারদের মধ্য থেকে অভু'খান লাভ করেন তথাকথিত কোচ রাজবংশের বিশ্ব সিংহ।

এখান থেকেই শুরু হয় কোচবিহার রাজ্যের ইতিহাস বা কোচ রাজবংশের ইতিহাস। দরং রাজ বংশাবলী, অসম বুরুঞ্জি, কমরূপের 'বুরুঞ্জি' 'গুরুচরিত কথা' প্রভৃতি দলিল থেকে কোচ রাজাদের ইতিহাস পাওয়া যায়।

এইসব দলিল অনুসারে হাড়িয়া মণ্ডল (হাড়িয়া শব্দের অর্থ উত্তর-পশ্চিম কোণ) নামে একজন মেচের ঔরসে হাজো নামক এক কোচ সর্দারের দুই কন্যা হীরা ও জীরার গর্ভে জন্মলাভ করে বিশু বা বিশ্বসিংহ এবং শিশু বা শিবসিংহ ওরফে শিষ্যসিংহ। অদম্য সাহসী ও অসীম শৌর্যশালী বিশ্বসিংহ অন্যান্য ভুঁইএাদেরকে পরাভূত করে ১৫১৫ খ্রিস্টাব্দে কামতা রাজ্য দখল করেন এবং তাঁর সময়ে রাজ্যের সীমারেখা পূর্বে বড় নদী থেকে পশ্চিমে করতোয়া পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। বিশ্ব সিংহের রাজ্যাভিষেকের সময় তাঁর ভাই শিব সিংহ বা শিষ্য সিংহ মাথায় ছাতা ধারণ করেছিলেন বলে তাঁকে 'রায়কত' বা 'দুর্গাধিপতি' উপাধি দেওয়া হয়। বিশ্ব সিংহের রাজধানী হয় কুচবিহারে বা কোচবিহারে, অন্যদিকে শিষ্য সিংহ তিস্তা নদীর পশ্চিম পাড়ে বৈকুণ্ঠপুর নামক জায়গায় বসতি স্থাপন করেন।

এভাবে বিশ্বসিংহের নেতৃত্বে ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে তথাকথিত কোচ রাজত্বের সূচনা হয়। বিশ্ব সিংহের পুত্র নরনারায়ণ (১৫৩৩-৮৭) কোচ বংশের অত্যন্ত পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি তাঁর ভাই বিখ্যাত যোদ্ধা শুক্লধ্বজ বা চিলা রায় (চিলের গতিতে যুদ্ধকরতেন তাই চিলা রায়) এর সহায়তায় মণিপুর, জয়ন্তিয়া,

ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি দখল করে বিরাট রাজ্য গড়ে তোলেন। তিনি 'নারায়ণী' সেনা ও মুদ্রার প্রচলন করেন। নরনারায়ণ অপুত্রক ছিলেন। তাই চিলারায়ের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রঘুদেবকে দত্তক নেন। কিন্তু তার অল্পদিন পরেই নরনারায়নের একটি পুত্র জন্ম লাভ করে। রাজ্যপ্রাপ্তির আশায় নিরাশ হয়ে রঘুদেব রাজার শত্রুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে রাজ্য আক্রমণ করেন এবং বিফল হয়ে পলায়ন করেন। এই ঘটনার পর রঘুদেব স্বর্ণকোশী নদীর পূর্ব থেকে কামরূপ পর্যন্ত রাজত্ব করতে থাকেন। রঘুদেবের পর রাজ্যের রাজা হন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র পরীক্ষিৎ যিনি বড় যোদ্ধা হিসেবে পরিচিত। পরীক্ষিতের সময় গদাধর নদীর তীরে গিলাজোড় নামক স্থানে প্রাসাদ নির্মিত হয়। ঢাকার নবাবের সঙ্গে রাজত্ব নিয়ে বিবাদের সূত্রে দ্বিতীয় বার আগ্রার সম্রাটের নিকট যাওয়ার সময়ে পথিমধ্যে রাজমহলে (পাটনায়) তাঁর মৃত্যু হয়। শিব বংশী নরনারায়ণ পরীক্ষিৎ প্রভৃতি রাজার ইতিহাস উল্লেখিত হয়েছে রতিরাম দাসের গানে। পরবর্তীকালে (১৬০৩ খ্রি:) এই বাংলার শাসন ভার চলে যায় মুসলমান নবাবদের হাতে। এবং তারও কিছু পরে বাংলার শাসন ভার লাভ করেন মানসিংহ। রতিরামদাসের গানে সেই ইতিহাস উল্লিখিত হয়েছে।

নরনারায়ণের পরবর্তীকালের ইতিহাস নানা উত্থান-পতনে ভরা। ভাই-ভাই-এ বিবাদে রাজ্য দ্বিখণ্ডিত। এই সময়ে রাজ্যের নাম হয় কোচবিহার বা কুচবেহার রাজ্য। বহিরাক্রমণ (মুসলমান ও ভূটান দেশ থেকে), ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাহায্য প্রার্থনা এবং ফলতঃ ইংরেজদের করদ রাজ্যে পরিণত হওয়া প্রভৃতি কোচ রাজবংশের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী। এর মধ্যেই দু' একজন রাজা অত্যন্ত দক্ষতা, বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অষ্টাদশ শতকের শেষ দশক থেকে ঊনবিংশ শতকের চতুর্থ দশক পর্যন্ত মহারাজ হরেন্দ্র নারায়ণ, যাঁর সময়ে কোচবিহার রাজ্যের 'আধুনিক যুগ' শুরু বলে দাবী করা হয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাট দশক থেকে বর্তমান বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত মহারাজ নৃপেন্দ্র নারায়ণ। মহারাজ জগদীপেন্দ্র নারায়ণ ছিলেন কোচ রাজবংশের শেষ রাজা (১৯২২-৪৯)। ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি কোচবিহার স্বাধীন ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সেইসঙ্গে অবসান ঘটে বিশ্বসিংহ প্রতিষ্ঠিত কোচ রাজবংশের।

কামরূপ, কামতা তথা কোচবিহার জনপদের অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ ও অসমের রাজবংশী জনগোষ্ঠীর আদি পুরুষ 'কোচ' অর্থাৎ কোচ ও রাজবংশী এক জাতি এই মতের সমর্থনে গবেষক পণ্ডিতদের যুক্তি উপরে বর্ণিত এই কোচ রাজবংশের ইতিহাসের উপর নির্ভরশীল। মেচ সর্দার হাড়িয়া মণ্ডলের ঔরসে কোচ কন্যা হীরা ও জীরার গর্ভজাত বিশ্ব সিংহ ও শিব সিংহের প্রতিষ্ঠিত কোচ রাজ্যের অধিবাসী

তাই তারা কোচ এবং পরবর্তীকালে হিন্দুকৃত কোচ রাজবংশীতে পরিবর্তিত এই যুক্তির উপর ভিত্তি করেই সমস্ত গবেষক পণ্ডিত দাবি করেন যে কোচ ও রাজবংশী এক জাতি। অন্যদিকে রাজবংশী জনগণ নিজেদেরকে ক্ষত্রিয়োদ্ভব হিসেবে দাবি করেন এবং দাবি করেন যে কোচ ও রাজবংশী এক নয়। তাদের এই দাবির সমর্থনে যুক্তি আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই দাবির সূত্র ধরেই পরবর্তীকালে সারা উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের ইতিহাস শুরু।

কবি রতিরাম দাস তার গানে ইংরেজ শাসিত উত্তরবঙ্গের কি অবস্থা ছিল তারও কিছু নমুনা দিয়েছেন।

কোম্পানীর আমলেতে রাজা দেবী সিং।
সে সময়ে মুল্লুকেতে হৈল বার ঢিং ॥
কত যে খাজনা পাইবে তার নেকা নাই।
যত পারে তত নেয় আরো বলে চাই ॥
দেও দেও চাই চাই এই মাত্র বোল।
মাইরের চোটেতে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥

১৭৮১/৮২ খ্রিস্টাব্দে রংপুরের ইংরেজ প্রশাসক গুডল্যাণ্ড কর্তৃক নিযুক্ত ইজারাদার দেবী সিংহ ফতেপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে যে অত্যাচার চালায় উপরে তারই বর্ণনা দিয়েছেন করি রতিরাম দাস তার জাগ গানে। দেবী সিংহ নিযুক্ত প্রতিনিধি হরেরাম ছিলেন আর এক কাঠি উপরে। ১৭৮১ সালে খাজনার হার অনেক বাড়িয়ে দিয়ে তা আদায়ের জন্য প্রহার, বেত্রাঘাত ইত্যাদি ছিল নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। তাতেও খাজনা আদায় হল না। ছোটখাটো জমিদারদেরও অপমানের শেষ রইল না। জমিদারদের জমি দেবী সিংহ নাম মাত্র মূল্যে কিনে নিতে শুরু করলেন বেনামীতে। উপায়ান্তর না দেখে কৃষককুল গ্রাম ছেড়ে পালানোর চেষ্টা করল কিন্তু কোনও উপায় নেই, কারণ হরেরাম গ্রামে গ্রামে পাহারা রেখেছে। খাজনা আদায়ের সঙ্গে চলতে থাকল নারী নির্যাতন। কবির ভাষায়—

"পূর্ণ কলি অবতার দেবী সিংহ রাজা।
দেবী সিং-এর উপদ্রবে প্রজা ভাজা ভাজা ॥"

দেবী সিংহের এই অত্যাচারে জর্জরিত জমিদার ও সাধারণ প্রজারা কোনও উপায় না দেখে নীরবে সব সহ্য করতে থাকলেন। কিন্তু ফতেপুরের জমিদার শিবচন্দ্র ও মন্থনার জমিদার জয় দুর্গা চৌধুরানী এই অত্যাচারের প্রতিবাদে এগিয়ে এলেন। তাদের সেই প্রতিবাদে কর্ণপাত তো দূরের কথা দেবী সিংহ জমিদার শিবচন্দ্রকে কয়েদ করলেন। পরে অর্থ বিনিময়ে মুক্তি নিয়ে শিবচন্দ্র সমস্ত জমিদার ও প্রজাবর্গকে

সংগঠিত করে দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এ কাজে তাকে মদত দিলেন জয় দুর্গা।

"শিবচন্দ্র নন্দী কয় শুন প্রজাগণ।
রাজার তোমরা অন্ন তোমরাই ধন ॥
রঙ্গপুরে যাও সবে হাজার হাজার।
দেবী সিংহের বাড়ী নুট বাড়ী ভাঙ্গ তার ॥

শিবচন্দ্র ও জয়দুর্গার আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রজারা এগিয়ে এল তাদের সর্বশক্তি নিয়ে।

"শিবচন্দ্রের হুকুমেতে সব প্রজা ক্ষ্যাপে।
হাজার হাজার প্রজা ধায় এক ক্ষ্যাপে ॥
নাঠি নিল খন্তি নিল নিল কাচি দাও।
আপত্য করিতে আর না থাকিল কাও ॥
ঘাড়েতে বাকুয়া নিল হালের জোয়াল।
জাওলা বলিয়া সব চলিল কাঙাল ॥
চারি ভিতি হ্যাতে আইল রঙ্গপুরে প্রজা।
ভদ্রগুলা আইল কেবল দেখিবারে মজা ॥
ইটা দিয়া পাইট্‌কা দিয়া পাটকেলায় খুব।
চারি ভিতি হ্যাতে পড়ে করিয়া ঝুপ ঝুপ ॥

এবং এর ফলে

"খিরকির দুয়ার দিয়া পালাইল দেবী সিং।"

কবি বর্ণিত এই প্রজা বিদ্রোহে প্রজাদের হাতে যে সব অস্ত্রের ব্যবহার উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো মোটেই অস্ত্র নয়, কৃষকদের দৈনন্দিন কার্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং ইট পাটকেল। সংগঠিত শক্তির কাছে প্রতাপশালী ইজারাদারকেও কিভাবে হার মানতে হয় তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। কৃষক প্রজাদের এই বিদ্রোহে তথাকথিত ভদ্রলোকদের কোনও ভূমিকা নেই কারণ ভদ্রলোকদের তো দেবী-সিংহের অত্যাচারের শিকার হতে হয়নি। তাছাড়া এভাবে একরকম বিনা অস্ত্রে দেবী সিংহের মত ইজারাদারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোকে তাঁরা মজার অতিরিক্ত কিছু বলে মনে করতে পারেন নি। রংপুরের এই প্রজা বিদ্রোহই পরবর্তীকালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভিত হিসেবে কাজ করেছে। কবি রতিরাম দাস তাই অতি নিপুণভাবে এই প্রজাবিদ্রোহের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন তার কলমে এই জাগ গানের মাধ্যমে।

কবি রতিরাম দাসের পঞ্চম পালা কুলটা রমণীর উপপতির রূপ বর্ণনা। পালার নাম থেকেই স্পষ্ট যে এই পালাতে জাগ গানের প্রধান উদ্দেশ্য 'কাম' অর্থাৎ কামনার উদ্রেক প্রকাশের সুযোগ থাকবে অনেক বেশি পরিমাণে। রমণীটি কুলটা এবং সে তার উপপতির রূপ বর্ণনা করছে। স্বাভাবিক কারণেই এই পালা 'কানাই ধামালি' স্তরে থেমে নেই জাগ গানের দ্বিতীয় ভাগ 'মোটা' জাগের দিকে কয়েকধাপ এগিয়ে গেছে। এই কারণেই পালাটিতে রাধাকৃষ্ণের উল্লেখ নেই। নারী এখানে রাধার মুখোস পরে নয়, সোজাসুজি তার উপপতির (কানু, কৃষ্ণ, কানাই নয়) প্রেমে পাগল। শব্দ প্রয়োগও এখানে অনেক সহজ সরল ও ভণিতাহীন। এই পালায় সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল নায়ক-নায়িকার রূপ বর্ণনায় বিভিন্ন উপমার প্রয়োগ। উপমাগুলি নেওয়া হয়েছে একেবারে দৈনন্দিন গ্রাম্য জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে।

"আগুনের মত সোয়ামীর রূপ।" অর্থাৎ এই রমণীর স্বামীর রূপ আগুনের মত কিন্তু তবুও সেই স্বামীর প্রতি তার আকর্ষণ নেই কারণ, 'বঁধুয়া তো মোর কাল।' পরকীয়া প্রেমের পরাকাষ্ঠা। কার মন কোথায় মজে কে বলতে পারে? তাইতো এমন যে সুন্দর স্বামী সেও রমণীর বন্ধুয়ার কাছে কানি নগুলের (কড়ে আঙ্গুলের) যোগ্য নয়। বয়সে তার এই বন্ধুটি উঠতি যুবক, তার অল্প পাতলা মোচ (গোঁফ) গজিয়েছে মাত্র। এই রূপবান বন্ধুটির দেহ সৌষ্ঠব এমন যে তা দেখে নায়িকার আশ মেটে না।

জনম ভরিয়া বঁধুয়ার রূপ
দেখিছোঁ মিঠে না আশ।
দেখিতে দেখিতে তেঁওতো মিটে না
আরো বাড়ে হাভিলাষ ॥

যদি কখনো কেউ প্রেমে পড়ে একমাত্র তখনই তার পক্ষে বোঝা সম্ভব—"তেঁও তো মিটে না আশ" এবং "আরো বাড়ে হাভিলাষ" কত দূর সত্য। প্রেমাস্পদকে দেখে দেখেও সাধ মেটে না বরং দেখার হাভিলাষ (ইচ্ছা) আরও বাড়তে থাকে।

এই বন্ধুটির প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মুখ, হাত, পা, চোখ, নাক, কান, চুল, দাঁত সব কিছুর বর্ণনা রয়েছে গানটিতে। তার ভুরু (ভ্রু), বুক, বাহু, কোমর ও উরুর বর্ণনা যে উপমাগুলির সাহায্যে করা হয়েছে তা এক কথায় অপূর্ব-অতুলনীয়। কবিত্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে এই বর্ণনায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত কাব্যে সাধারণত পাওয়া যায় নায়িকার রূপবর্ণনা ; কবি রতিরাম দাস এখানে বর্ণনা করেছেন নায়কের রূপ সৌন্দর্য্য। নায়কের ভ্রু-দুটির বর্ণনা তুলনাহীন।

সরু মোটা নয় ভুরু দুটি তার
কাল পিঁপীড়ার সাইর।
কানের ছেন্দা হ্যাতে বাহির হইছে
কি মধু খাইতে তার ॥

কালো পিঁপড়ে যেমন সারি দিয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে খাদ্যদ্রব্য আহরণে যায়, ঠিক তেমনি বন্ধুয়ার ভ্রূদুটি কানের ছিদ্র থেকে কি মধু খেতে বের হয়েছে। অর্থাৎ ভ্রূ-দুটি যেন কালো পিপীলিকার সারি।

বন্ধুর বুকখানি কেমন? সব নায়িকাই যেমনটি চায় ; অর্থাৎ প্রশস্ত বক্ষ পুরুষ। এই নায়কের বক্ষদেশ মাঠের মত প্রশস্ত এবং শিলাপাটের মতো দৃঢ়। বন্ধুয়ার এই বক্ষদেশ দেখলে মহাশত্রুর মুখও শুকিয়ে যায়। "মাঠের মতন কেমন চওড়া পাটার মতন বুক।"

বন্ধুয়ার বাহু দুটি কেমন? কবির বর্ণনা—

সিদা যদি করে বাইমের মতন
মাঝেতে মাঝেতে ফুলে।
জোরেতে নগুলে টিপা যদি যায়
খাল নাহি পড়ে মূলে ॥

শাল-প্রাংশু বাহু দুটির বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি এক গ্রাম্য ছবির সাহায্য নিয়েছেন। বাইম্ মাছকে সোজা করে ধরলে যেমন শক্ত হয়ে যায় এবং বাইমের দেহের কোন কোন অংশ এমন স্ফীত হয় যে আঙ্গুলের সাহায্যে জোরে টিপলেও তাকে নমনীয় করা যায় না, বন্ধুর বাহু দুটিও তেমনি কঠিন ও শক্ত। প্রশস্ত বক্ষ ও পশ্চাদ্দেশের সঙ্গে মিলিয়ে রয়েছে তার কঙ্কের মত সরু কোমর। আবার তার উরুদ্বয় লোহার কলাগাছের মত শক্ত ও মসৃণ।

এমন যে নায়ক তাকে সম্মোহিত করার জন্য তেমনি রূপবতী নায়িকা চাই। যেমন দ্যাবা তেমনি দ্যাবি-নইলে মানাবে কি করে? কবি তাই নায়িকার রূপের বর্ণনা দিয়েছেন ঐ একই ভাবে বিভিন্ন উপমার ব্যবহার করে। কেমন রূপ এই নায়িকার? কাঞ্চা সোনা বরণ, পিঠ ভরা মিশমিশে কালো চুল, সিঁথিতে সীতাপাটি, উন্নত মসৃণ কপাল, সরু সুন্দর ভ্রূ-যুগল ইত্যাদির অধিকারীনি এই কন্যা। চোখ ও ভুরুর বর্ণনা দিয়েছেন কবি এভাবে—

কামরাজা বুঝি ভুরুর শিকলে
পাতিয়া রাখিয়া ফাঁন্দ।
উড়ন্ত নয়ান খঞ্জন দুটিরে
ধরিয়া দিয়াছে বান্ধ ॥

চোখ দুটি যেন উড়ন্ত খঞ্জন পাখি এবং সেই পাখি দুটিকে মদন রাজা ভ্রূ-শৃঙ্খলে বেঁধে রেখেছেন যেন। এর পর বর্ণনা আছে তার সুন্দর মুখ ও নাক, মুক্তার মত দাঁত, সুন্দর গলা, সুন্দর দুটি বাহু এবং হাতে সুবর্ণের কঙ্কণ ইত্যাদির। নায়িকার সুন্দর বক্ষদেশের বর্ণনা কাব্যগুণে অতুলনীয়।

গলার নীচ হ্যাতে কেরেমে উঠিছে
বুকখানি হয়া উঁচা।
সংসারের ভিতর এই বুক ছাঁচা
আর সৌগ বুঝি মিছা ॥

প্রেমিক পুরুষের কাছে নায়িকার এই উন্নত বক্ষদেশ ছাড়া সংসারে আর সবই মিথ্যা। তার বক্ষদেশের বর্ণনা করতে গিয়ে কবি সুন্দর উপমার সাহায্য নিয়েছেন।

"সব জমিদারক ভাঙ্গিয়া চুরিয়া
দেবী সিং হরেরাম।
সেইরূপ বুঝি সৌগ অঙ্গ হ্যাতে
সার নিয়া চুঁচি দুটা।
বড়ই কঠিন মাথা উচা করি
হইছে বুঝি মোটা সোটা ॥"
"একদিগে চুঁচি আর দিগে পাছা
দুজনে লইল টানি।
আছে কিনা আছে বুঝা নাহি যায়
আমার কমর খানি ॥
একদিকে যেমন মন্থনা লইল
অন্যদিকে বামনডাঙ্গা।
ফতেপুর এখন আছে কিনা আছে
সব দিকে হইছে ভাঙ্গা ॥"

ইজারাদার দেবী সিং ও তাঁর নিযুক্ত হরেরাম সমস্ত জমিদারকে ভেঙে চুরে তাদের সর্বস্ব অপহরণ করে যেমন স্ফীত, বর্দ্ধিত হয়েছেন, তেমনি সমস্ত অঙ্গকে ভেঙে চুরে তাদের সার গ্রহণ করে স্ফীত উন্নত হয়েছে নায়িকার কুচযুগ। একদিকে এই স্তনদ্বয় অন্যদিকে সুডৌল পশ্চাদ্দেশ শরীরের মধ্যদেশ থেকে সার গ্রহণ করেছে এবং তার ফলে নায়িকার কটিদেশ হয়েছে ক্ষীণ। ক্ষীণ কৃশ এই নায়িকার কটিদেশের সঙ্গে কবি তুলনা করেছেন শিবচন্দ্রের ফতেপুরের। ফতেপুরের দুই অংশ দুদিক থেকে বামনডাঙ্গা ও মন্থনায় চলে গেছে। পঞ্চসনার কাগজের গাদির রূপ নিয়েছে কটিদেশের উপরে অবস্থিত নুধি (ত্রিবলী)।

এমন যে স্তন দ্বয় তা কি কাজে লাগবে? কবির কল্পনা—

শিবচন্দ্রের হাতে যেমন হইল
সে দুটার অধঃপাত।
সেইরূপ পাপ এ দুটার বুঝি
করিবে বন্ধুয়ার হাত ॥

শিবচন্দ্রের নেতৃত্বে রঙ্গপুরের প্রজাদের হাতে দেবী সিং ও হরেরামের যে দুর্দশা হয়েছিল, সেইরূপ নায়িকার স্তনদ্বয়ের উপযুক্ত পরিচর্যা সম্ভব তার বন্ধুয়ার হাতের নিষ্পেষণে ॥

তিন-নড়ি সোনার মেখলায় ঘিরে রয়েছে নায়িকার "মদন রাজার কোট"। (নায়িকার গোপনাঙ্গ মদন রাজার কোট হিসেবে বর্ণিত)। তার উরু হতে পা-দুটি ক্রমশ কৃশ হয়ে দুটি রাজপথের রূপ নিয়েছে। কবির কথায়—চাঁদ থেকে জ্যোৎস্নার আলো নিংড়ে নিয়ে তাতে ক্ষীর ননী মিশিয়ে এবং সোনা থেকে তার রং নিংড়ে নিয়ে এই নায়িকাকে সৃষ্টি করেছেন ঈশ্বর—তাই তো তার এত রূপ।

"তাতে দিয়া মোকে গড়াইছে সখি
না হইলে এমন রূপ!"

ষষ্ঠ পালাটি সংগ্রহ করেছেন রংপুর থেকে পূর্ণেন্দু মোহন সেহানবিশ। এই পালাটিও কানাই ধামালি বিভাগের। পালার নাম—কৃষ্ণের বংশী সৃজন। রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলায় বড়াই বুড়ি এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দৌত্যকর্মে সিদ্ধহস্তা বড়াই রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে আরও প্রগাঢ় রূপ দিয়ে অধিকতর সার্থক করে তুলেছে। এই পালাটিতে বড়াই এর সেই ভূমিকায় কৃষ্ণ রাধাকে আবাহনের উদ্দেশ্যে কিভাবে বাঁশি সৃজন করে তার বর্ণনা।

কৃষ্ণের প্রেমে পাগল রাধা বড়াই এর কাছে বলে—

"হাট ঘাট ত্যজিনু বড়াই মথুরা নগর।
ছাওয়াল কানাইর গুয়া খাইয়া কি হইল ঝগর ॥"

কানাই-এর যাদুকরা পান সুপারি খেয়ে রাধার এমন দশা যে সে সব কাজকর্ম ভুলে গেছে। কামরূপে গুয়া অর্থাৎ পান সুপারিতে রয়েছে মন ভোলানি যাদু। একটি ভাওয়াইয়া গানে আছে—

একে গছের গুয়ারে কালা একে গছের পান
কি দিয়া খোয়াইলেন গুয়া ঘরে না রয় মন।

কানাইকে নিয়ে রাধার হয়েছে এমন জ্বালা।

চম্পা কলা নয় কানাই মিঠে মিঠে খাওঁ।
নেতের বস্ত্র নয় হে কানাই পিন্দিয়া ওসার চাওঁ ॥

কানাই কোন খাদ্য বস্তু বা বস্ত্র নয় যে তাকে সেইভাবে ব্যবহার করা সম্ভব। রাধার এহেন অবস্থায় বড়াই তার চিরন্তন ভূমিকা পালন করে। রাধাকে জানায় কানাই তার প্রেমে পাগল, আবার কানাইকে জানায় যে রাধা তার প্রেমে পাগল। কানাই তাই বাঁশিতে রাধাকে ডাকতে চায়। সুতরাং প্রয়োজন রাধা নামে সাধা বাঁশি। বাঁশি তৈরির জন্য কানাই সুবর্ণ কাটারি হস্তে বাঁশ কাটতে চলে। মদনকামের বাঁশ সৃজন পালা খণ্ডে তরলা বাঁশের উল্লেখ করা হয়েছে বাঁশি তৈরির প্রয়োজনে। কানাই তরলা বাঁশ কেটে বাঁশির দৈর্ঘ্যের পরিমাণ অংশ নিয়ে চলে যায় কামারের কাছে এবং কামার তাতে সাতটি ফোঁড় দিয়ে বাঁশি তৈরি করে দেয়। এই বাঁশি নিয়ে কানাই এবার—

কদম তলায় থাকি কানাই বাঁশীত দিল সান।
বুক ধরফর চন্দ্রাননীর আউলাইল পরান ॥

বাঁশির সুর শুনে রাধার মনের অবস্থার বর্ণনা—

একেতো বাঁশের বাঁশী বিন্দু গোটা গোটা।
হাতের টিপে মুখের সুরে দিলে দারুণ খোঁটা ॥
একেতো বাঁশের বাঁশী সাতখানি ফোঁড়
কেমনে জানিল বাঁশী রাধা নামটি মোর ॥

বাঁশির যাদু ভরা সুরে—

বাঁশীর সুরে শ্রীরাধিকার ঘরে না রয় হিয়া।
কোন ছলে ছাওয়াল কানাইক্ দেখিব একবার গিয়া ॥

কানাই-এর এই বাঁশি রাধাকে কখনো ঘরে থাকতে দেবে না—।

সুতরাং— ভরণ কলসীর জল ফেলিল ঢালিয়া।
ধুমার ছলে চন্দ্রাননী বিরাইল কান্দিয়া ॥
জল আনিতে যায় রাধিকা ভাবে মনে মন।
সঙ্গের সঙ্গিনী নিল সখি চারি জন ॥

পালাটি অসমাপ্ত বলে মনে হয়। কারণ রাধাকৃষ্ণের এই পালাগুলি সাধারণত রাধা কৃষ্ণের মিলন সুরে শেষ হয়। হয়ত বা আরও কয়েকটি পংক্তি ছিল যা সংগ্রাহক পুর্ণেন্দুমোহন সেহানবিশ সংগ্রহ করতে পারেননি।

জাগ গানের সাংগীতিক বিশ্লেষণ

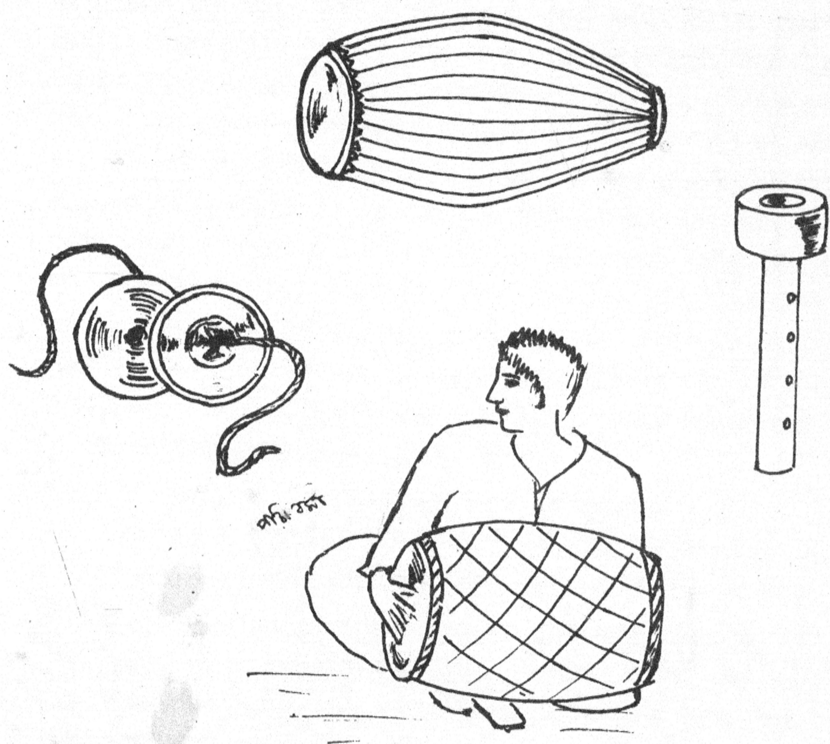
সাংগীতিক দিক থেকে জাগ গানের প্রধানত দুটি রূপ—পালা গান ও মাগনের গান (ছুট গান)। জাগ গান কামদেব পূজার সঙ্গে জড়িত। কামদেব পূজার প্রতীক রূপ বাঁশ পূজা। সুতরাং কামদেবের গান ও বাঁশ পূজার গানকে জাগ গানের দুই অঙ্গ বলা যেতে পারে। বাঁশ পূজার সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় দেখা গেছে যে মাথায় পান সুপারি চামর বাঁধা সুসজ্জিত বাঁশকে বাড়িতে পূজা দেওয়ার পরে বাড়ি থেকে বাঁশগুলি চলে যায় বাঁশের থলায়, এই 'থলা'তেই বাঁশের পূজা হয়—কামরূপী ব্রাহ্মণ পুরোহিত শিব পূজা আচার ও মন্ত্র দিয়ে পূজা করেন, হম্ (যজ্ঞ) করেন এবং এখানেই পালা গান হয়. এই পালা গানে ছোকরা, মতিহারি বা বৈরাগির বাখান (কথার প্রতিযোগিতা) অংশে কখনও বা গানের অংশে নানা অশালীন কথা ও অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার হয়। পালা গানে ক্ষুদ্র হলেও কোনও ঘটনা বা আখ্যান ভাগ সংগীত-নৃত্য-অভিনয় মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। কিন্তু মাগনের গানে সে সুযোগ নেই। যেহেতু বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাগন করা হয় পূজার অর্থ যোগানের জন্য তাই প্রতি বাড়িতে নতুন নতুন ধুয়া (ছুট্ গান) দিয়ে নাচ গান শুরু হয়। পালাগানগুলির এই ধুয়া বা ছুট্ গান পরবর্তী কালে একক ভাওয়াইয়া চট্‌কা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে বলে অনুমান করা হয়। কামদেবের মাগন আবার দু'ভাবে হয়—ছোট সরু সজ্জিত চামর বাঁধা বাঁশ হাতে নিয়ে ও বাঁশ ছাড়া। বাঁশ হাতে নিয়ে ৮/১০ জন যুবক ঢোল, করকা, জগঝম্প, কাশি, সানাই এর বাজনার তালে তালে নাচ গান

আইলো আইলো রে, খেলার গোঁসাই আইলোরে,
আইলোরে মদনের মাও মদনোক বরিয়া নেও",

অথবা "তোক বলোং ওরে বাছা মালা গিরি বর
মোর বাঁশ খেলাইতে যায় কামাখ্যা শহর"

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নাচ গান সহ বাঁশ নিয়ে মাগনকারীদের মাগনের দিনগুলিতে কিছু সাত্ত্বিক নিয়ম নিষ্ঠা পালন করতে হয় যেমন নিরামিষ আহার, নারীসঙ্গ বর্জন ইত্যাদি।

বাঁশ ছাড়া কামদেবের মাগনে একইভাবে ৮/১০ জন নিয়মনিষ্ঠাকারী ব্যক্তি (যাদের মধ্যে ২/৩ জন প্রধান ব্যক্তি থাকেন) ঢোল, করকা, জগঝম্প, কাঁশি, সানাই-এর বাজনার তালে তালে নাচ গান করে। তাদের হাতে বাঁশ বা অন্য কিছু থাকে না। তবে তারা সবাই গালে ধুলো, কালি মেখে, জরাজীর্ণ বস্ত্র, ছেঁড়া জাল ইত্যাদি পরিধান করে শিবের ভক্ত্যা হিসেবে শিবের অনুচর ভূত প্রেতাদির বেশ ধারণ করে। এদের কারও কারও কোমরে বাঁধা থাকে মইষালের ঘন্টি, বড় বড় ঘুঙুর ইত্যাদি। এদের নেতা প্রধানদের মধ্যে একজন যার হাতে থাকে সরু বাঁশের চোঙায় ভরে রাখা বেল



জাগ গানে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র।। খোল, মুখাবাঁশি, থলুয়া ঢোল ও খাপি (মন্দিরা)

কাঠের শিবলিঙ্গ। বেল-কাঠের এই শিব লিঙ্গই মদনকাম। এইরূপ বেশধারী ভক্ত্যারা মদনকাম পূজার আগে কয়েকদিন ধরে গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি বাড়ি, কখনও বা পার্শ্ববর্তী গ্রামের সম্পন্ন বাড়িতে মাগন করে বেড়ায়। এই মাগনের গান সাধারণত কোনও "ধুয়া"। গৃহস্থের বাইরের উঠোনে গিয়ে ঢোল করকার বাজনা শুরু হতেই আশ পাশের বাড়ি থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা এসে জোটে 'কান্দেবের নাচ' দেখার জন্য। গান এখানে গৌণ, নাচই প্রধান। উঠোনে গোল করে দর্শক দাঁড়িয়ে গেলে ভক্ত্যারা অর্থাৎ নাচ গানের শিল্পীরা মধ্যস্থানে নাচ গান করে। "বাণিজ বাণিজ করেন মোর প্রাণ সাধুরে" অথবা "কাল বিয়ানে রংপুর যামো কিনিয়া আনমো ছয়মানা" ইত্যাদি ধুয়া দিয়ে শুরু হয় গান। গান শুরু হয় বিলম্বিত লয়ে। ধীরে ধীরে লয় বাড়তে থাকে নাচের তালও সেভাবে পরিবর্তিত হতে থাকে। ৮ মাত্রা ও ৬ মাত্রার বিভিন্ন ঢং-এর বাজনার সাথে সাথে চলতে থাকে নানা ভঙ্গির নাচ। সানাই সুর-রক্ষা করে চলে। এই নাচ ভীষণ পরিশ্রম সাপেক্ষ। তাই সমর্থ যুবক ছাড়া এ নাচ সম্ভব নয়। এভাবে বাড়ি বাড়ি মাগন চলে। ভিন্ন গ্রামে মাগন চলতে থাকলে দলটি সেই গ্রামের কোনও গৃহস্থের বাড়িতেই রাত কাটায়। পরদিন আবার মাগন। এভাবে বাড়ি বাড়ি মাগনের শেষে পূর্ণিমার দিনে বাঁশের "থলা"তে আগমন। স্বভাবতই 'থলা'য় একটি দল নয় বেশ কয়েকটি দল আসে। সুতরাং 'থলা'তে তিন ধরণের দলের সমাগম হয়। পালা গানের দল, বাঁশ-সহ নাচ গানের দল এবং বাঁশ ছাড়া মাগনের দল। ২/৩ দিন ধরে পর্যায়ক্রমে এদের সকলের নাচ-গান পরিবেশিত হয় 'থলা'য়। প্রতিযোগিতা চলে বিভিন্ন অঙ্গের নাচ-গানের।

সুতরাং দেখা গেল যে জাগ গানের মূল পর্ব পালা গান হলেও জাগ গানের সঙ্গে বাঁশ পূজার ও কামদেবের মাগনের গান সম্বন্ধ যুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে এই জাগ গানের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য কি, এগুলি কোন্ শৈলীর অন্তর্ভুক্ত?

জাগ গান প্রাচীন কামরূপ অঞ্চলের গান ; কামরূপের আদি বাসিন্দা রাজবংশী লোকগোষ্ঠীর গান। কামরূপের ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, সেখানকার রাজবংশী জনগোষ্ঠীর জীবন দর্শন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটেছে এই গানগুলির মাধ্যমে। কামরূপ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা কামরূপী বা রাজবংশীতেই রচিত এই গান। নাচের ভঙ্গি ঐ অঞ্চলের ছোকরা নাচ ও কাচ (মুখাপরা কালী) নৃত্য। মাগনের নাচের ভঙ্গিতে হালকর্ষণ, ধান্য রোপন, ধান-কাটা ইত্যাদির অভিনয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

সামগ্রিক বিচারে তাই এই সংগীত আঞ্চলিক লোকসংগীত হিসেবে গণ্য। সব ধরনের আঞ্চলিক লোকসংগীতের মতো এই গানগুলিরও তাই কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। সুর শৈলীর এই বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে রয়েছে এখানকার নৃগোষ্ঠী, ভৌগোলিক,

প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভৃতি সব কিছুর প্রভাব। শ্রদ্ধেয় হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জবানিতে— "লোক সংগীতের সাংগীতিক ভাবানুষঙ্গের মূল কথা গলার গ্রাম্যতা ও ভঙ্গী, folk timbre ও style, লোকসংগীতের স্টাইলটা আঞ্চলিক জীবনধারা থেকে উদ্ভূত। এই আঞ্চলিকতা গড়ে উঠেছে একটা বিশেষ স্বরসমষ্টি বা ঠাঁটকে অবলম্বণ করে। তার সঙ্গে মিশেছে আঞ্চলিক বাক্‌ভঙ্গি, কণ্ঠভঙ্গি ও পারিভাষিক উচ্চারণভঙ্গি। লোক-সংগীতের সুর, স্বর ও ভঙ্গি এই তিনটিই বিভিন্ন উৎপাদনশীল শ্রম-প্রক্রিয়ায়-আবদ্ধ সমষ্টি জীবনের অভিব্যক্তি।"

স্বর্গীয় হেমাঙ্গ বিশ্বাস একটি অঞ্চলে কিভাবে তিলে তিলে একটি সাংগীতিক ভাবানুষঙ্গ স্টাইল বা শৈলী গড়ে ওঠে তা খুব সহজ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন উপরের কয়েকটি বাক্যে। এই একই সূত্র অনুসরণ করে প্রাচীন কামরূপে বর্তমান উত্তরবঙ্গ, আসাম, বাংলাদেশের অংশবিশেষ নিয়ে গড়ে ওঠা ভূখণ্ডে যে সংগীত শৈলী জন্ম নিয়েছে তার আধুনিক নাম ভাওয়াইয়া। জাগ গান এই ভাওয়াইয়া শৈলীর অন্তর্ভুক্ত এক বিশেষ আঙ্গিকের গান।

ভাওয়াইয়ার স্বর কাঠামোতে সুরটি আরোহণে খরজ বা মধ্যম (ক্বচিৎ পঞ্চম্) থেকে উত্থিত হয়ে স র ম প ধ ণ ধ ণ অথবা ম প ধ ণ ধ ণ গতিপথে এগিয়ে নানা অলংকার ও শ্রুতি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মধ্যম বা খরজে স্থায়ী হয়। তবে এই চলন সহজ সরল নয়। ভাওয়াইয়া সুরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য চলার পথে বিশেষ ধরনের "গলা ভাঙা'-র প্রয়োগ। এই বিশেষ ধরনের "গলা ভাঙা" ভাওয়াইয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য ও সম্পদ। যত বড় গায়কই হোন না কেন এই "গলা ভাঙা" আয়ত্ত করতে না পারলে তার কণ্ঠে ভাওয়াইয়ার মাধুর্য ও সুর বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠবে না। অথচ সকলে এটা আয়ত্ত করতে পারে না। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে ভাওয়াইয়া অঞ্চলের রাজবংশী, সেখানকার স্থানীয় মুসলমান, যুগী প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মানুষ যত সহজে এই গলা-ভাঙা আয়ত্ত্ব করে, অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষ অনেক চেষ্টা করেও তা পারে না। তাই মনে করা হয় যে এই "গলা-ভাঙা'র বৈশিষ্ট্য কিছুটা ভূ-প্রকৃতি জাত, কিছুটা সমাজ ব্যবস্থার স্তর জাত ও কিছুটা ethnic বা জাতিগত। এক একটি বিশেষ মানবগোষ্ঠীকে কেন্দ্র করে এক একটি সুরের ঠাট গড়ে উঠেছে। এখানকার ভূ-প্রকৃতি এমনই যে নদীগুলি অপ্রশস্ত ও অগভীর এবং সেই কারণেই পাহাড় থেকে নির্গত এই নদীগুলি খরস্রোতা। তাই এগুলি খুব ঘন ঘন এবং হটাৎ হঠাৎ বাঁক নেয়। সেই abruptness-ই ধরা পড়ে গলা ভাঙায়। এই অভিমত ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক প্রমুখ ভাওয়াইয়া বিশারদদের।

ডঃ নির্মল দাশের মতে এই ভাঙন একটি সুরভঙ্গি। এক্ষেত্রে একটি ধ্বনি শ্রুতিধ্বনি (glide) হিসেবে স্বরধ্বনির মধ্যে ঢুকে পড়ে স্বরধ্বনির অব্যাহত প্রবাহের মধ্যে একটি স্পন্দন সৃষ্টি করে; তাতে একদিকে যেমন সুরের মধ্যে বৈচিত্র্য

দেখা দেয়, অন্যদিকে তেমনি কথার মধ্যে জোর (stress) পড়ে, কথার ভাব জোরালোভাবে প্রকাশ পায়। এখানেই সুরের সঙ্গে কথার সমঝোতা, কথার উচ্চারণের সমঝোতা। ভাওয়াইয়ার ভাষা কামরূপীর শব্দমগুলীর উচ্চারণেই তাই এই গলা ভাঙার ভিত্তি কিছুটা নিহিত।

আবার রাজবংশী জনগোষ্ঠীর দৈহিক গঠন নাক, মুখগহ্বর, ঠোঁট, চোয়াল, কণ্ঠনালী ইত্যাদির অবদান এক্ষেত্রে কম নয় বলে মনে হয়। যেহেতু কণ্ঠ থেকে উৎপন্ন ধ্বনি মুখমণ্ডলে প্রবেশ করার পর দন্ত, জিহ্বা, তালু, নাসারন্ধ্র এবং ওষ্ঠের বিশেষ ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন রূপ লাভ করে, রাজবংশী গোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্য তাই এই গলা-ভাঙার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে বলে দৃঢ় বিশ্বাস।

এসব ছাড়াও সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন, অর্থনৈতিক কাঠামো শ্রম ব্যবস্থার রূপান্তর শ্রেণী বৈষম্যজাত সংঘাত এ সব কিছুরই অবদান রয়েছে এই সুর কাঠামো গঠনে।

গলা ভাঙার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভাওয়াইয়া পরিবেশনে কথার মাঝখানে বা শেষে এবং ভাওয়াইয়াতে বহুল ব্যবহৃত "অব্যয়"-এর মাঝখানে বা শেষে অতি সূক্ষ্মতা ও নিপুণতার সঙ্গে "হ্"-এর ব্যবহার উচ্চারণ ভঙ্গির বিশিষ্ট প্রকাশ।

যেমন "আরো ঠাকুর মদনকাম.
ডাইকে গঙ্গা গঙ্গা বলে
ওরে নিদান কালে গঙ্গা মাতা হে
ও মাতা রইলেন কার বা কাছে।"

গাইবার সময়ে এই কথাগুলির উচ্চারণ মোটামুটিভাবে নিম্নরূপ—

আরোহ্ ঠাহ্কুর মদনকাহ্হ্ম
ডাইকেহ্ গঙ্গাহ্হ্ গঙ্গাহ্হ্ বলে
ওরেহ্ নিহ্দাহ্ন কালে গহ্ঙ্গা মাতাহ্ হে......
ও মাতা রইলেন কাহ্র বাহ্ কাছেহ্।

লক্ষণীয় যে ও, ওরে, বা, হে, ওহে, এহে প্রভৃতি অব্যয়ের ব্যবহার মাধ্যমে ভাওয়াইয়াতে সুর সৃষ্টি এক বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করে। বিশেষ করে পালাগানগুলিতে এঁহে, ওহে ইত্যাদির ব্যবহার চমকপ্রদ।

এই গলা-ভাঙা আবার সব গানে এক রকম নয়। অপেক্ষাকৃত গম্ভীর বিলম্বিত লয়ের গান যাকে বলা হয় দরিয়া ভাওয়াইয়া-সেগুলিতে গলা-ভাঙার বিশেষত্ব বেশি। জাগ গান এই শ্রেণীতে পড়ে।

ভাওয়াইয়ার, অন্যান্য অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি হল যে অধিকাংশ ভাওয়াইয়া গান মুদারা সপ্তকের (মধ্য গ্রাম) কোমল নিখাদ(ণ)-এর উপরে ওঠে না অর্থাৎ ভাওয়াইয়াতে তার সপ্তকের কোনও স্বরের ব্যবহার নেই। উল্লেখ্য যে ভাওয়াইয়াতে কোমল রে কোমল গা, কোমল ধা, কড়ি মা ও শুদ্ধ 'নি'-এর ব্যবহার

নেই। বিশেষ করে দোতোরা নামক তার যন্ত্রের সঙ্গে যে সব ভাওয়াইয়া গাওয়া হয়, সে সব গান সপ্তকের কোমল 'ণ'-এর উপরে যায় না। কিন্তু অন্য কিছু গান আছে বিশেষ করে পালা গান যাতে দোতেরার ব্যবহার নেই সেখানে এই সুর তার সপ্তকের সা বা শুদ্ধ রে পর্যন্ত যায়। জাগ গান সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। জাগের পালাগানের গায়কি ও পরিবেশন হুবহু বিষহবার মতো। সহযোগী যন্ত্রও তাই বিষহরার মতো মুখা বাঁশি, খোল, করতাল। জাগের গান তাই বিষহরার মতোই দোতোরা যন্ত্রের ব্যবহারের সীমাবদ্ধতার দ্বারা আবদ্ধ নয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে উত্তরবঙ্গের দোতোরার বাজানোর ভঙ্গিতে অনায়াসলভ্য টিপনির (তারের উপর আঙুলের সাহায্যে টিপ) সাহায্যে কোমল "ণ"-এর উপর স্বর সৃষ্টি সম্ভব নয়। দোতোরার চারটি তারের মধ্যের দুটি তার (সুর) বাঁধা হয় 'সা' স্বরে। উপরের তারটি (জিন্) বাঁধা হয় 'মা' স্বরে এবং নীচের তার (বম্) কে নীচের (উদারা) সপ্তকের 'পা' স্বরে। এক হাতের গাদার সাহায্যে দোতোরাটি চেপে রেখে আঙ্গুলে ধরা চুট্‌কি দ্বারা আঘাত (ডাং) করা হয় স্বর সৃষ্টির জন্য। অন্য হাতের তালুতে দোতোরার মাথার দিক ধরে রেখে তিনটি আঙ্গুলের টিপনি দিয়ে রে, গা পা, ধা, ণি স্বর সৃষ্টি করা হয়। উত্তরবঙ্গের দোতোরার বাদনে মধ্যমা অঙ্গুলের টিপনি নেই, কারণ এই গানে 'রে', 'গা', ও 'ধা'-এর কোমল রূপের ব্যবহার নেই। 'জিন্' তারে আঘাতে পাওয়া যায় 'মা', আঘাতের পর তর্জনীর টিপনিতে 'পা' অনামিকার টিপনিতে ধা এবং কনিষ্ঠার টিপনিতে কোমল 'ণি'। 'সুর' তারে আঘাতে সা, তর্জনীয় টিপনিতে রে এবং অনামিকার টিপনিতে গা স্বরের উদ্ভব। হাতের অবস্থান পরিবর্তন না করে টিপনির সাহায্যে কোমল 'ণি' এর উপরের কোনও স্বর সৃষ্টি সম্ভব নয়। এখানেই দোতোরার সীমাবদ্ধতা। জাগ গানে মূল গায়ক বা গিদালের হাতে বিষহরার মতই একটি চামর থাকে। সুর অনেকটাই বিষহরার সুর—বেশ টানা টানা এবং উঠা নামার বৈশিষ্ট্যে সৌন্দর্যমণ্ডিত। যেহেতু খোলা মাঠে বা পাথারে গাওয়া হয় বহু মানুষকে শোনানোর জন্য তাই গান খুব উচ্চ গ্রামে high pitch-এ হয়। গানের তাল সাধারণত কাহারবা, দাদরা, অনেক ক্ষেত্রে তেওরা। তবে তালের চলন এমন যে কোনও তবলচির পক্ষে এই তাল স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে বাজানো সম্ভব নয়। এই গানের খোলের বাজনাও যার তার পক্ষে সম্ভব নয়। বিষহরা ও জাগ গানের খোল বাদক বা বাইন (বায়েন) ছোটবেলা থেকেই দলের সঙ্গে থেকে বাজনা শিক্ষা লাভ করে। বাজানোর ভঙ্গি মুখা বাঁশির অনেকটা সাপ খেলানো সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার পক্ষে সমীচীন হওয়া প্রয়োজন।

জাগ-গানের পালাগানের নাচ অন্যান্য পালাগানের নাচের মত ছোকরা নাচ। মেয়েবেশধারী ছেলেরা (ছোকরা) নাচে বলেই এই নাচের নাম ছোকরা নাচ।

মোটামুটি এই হল জাগ গানের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য মোটামুটিভাবে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে তিনটি গানের স্বরলিপিতে।

জাগ গানের ভাষা

উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে এক একটি জনপ্রবাহ বয়ে গেছে। তারা এখানে এসে কিছুকাল অবস্থান করে, ইতিহাসের প্রয়োজন সিদ্ধ হওয়ার পরে স্থানান্তরে যাওয়ার সময়ে এখানকার মাটিতে, জনগঠনে, সংস্কৃতিতে কিছু না কিছু অবশেষ রেখে গিয়েছে। এই অবশিষ্ট অংশই পরবর্তী প্রবাহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এখানকার মাটিতে তৈরি করেছে একটি সমন্বিত জন। ঐ সমন্বিত জনই হল উত্তরবঙ্গের বর্তমান রাজবংশী সমাজ। তারা যে জাতিরই উত্তরপুরুষ হোক না কেন, তারা আদিম অবস্থা থেকেই প্রতিবেশী অন্যান্য জনগোষ্ঠীর তুলনায় ছিল গ্রহণশীল এবং উদার মনোভাবাপন্ন। যদি তা' না হত তবে তাদের সম্ভাব্য পরিণতি হত টোটো উপজাতির মতো। গ্রহণশীল ও উদার মনোভাবাপন্ন ছিল বলেই রাজবংশীরা আর্য ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করে একটি বিকাশশীল ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছে।

ফলে, সরকারি নথিপত্রে নিজেদেরকে আর্যসম্ভূত ক্ষত্রিয় বলে চিহ্নিত করার দাবি নিয়ে তারা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন করেছে। উনিশ শতকের শেষ এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগে এই আন্দোলন যে তীব্র আকার ধারণ করেছিল সেটা তৎকালীন জনগণনা আধিকারিকদের প্রতিবেদন থেকে স্পষ্টরূপে পাওয়া যায়। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে এই আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে নেতৃত্ব দেন কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত খলিসামারি গ্রামের অধিবাসী প্রয়াত পঞ্চানন সরকার ওরফে পঞ্চানন বর্মা। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে জনগণনা আধিকারিকের নিকট যথাসময়ে রাজবংশী জাতিকে ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির দাবি পেশ করার উদ্দেশ্যে পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে ১৯১০ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে তারিখে রংপুরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে প্রস্তুত দাবিপত্রের মূল কথা ছিল এই যে, রাজবংশী ও কোচকে পৃথক পৃথকভাবে নথিভুক্ত করতে হবে এবং রাজবংশীকে ক্ষত্রিয় হিসেবে গণনা করতে হবে। ইতিপূর্বে রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতি নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা প্রস্তুত একটি ব্যবস্থাপত্রে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয়ত্ব স্বীকার করে তাদের স্বীকৃতি লাভ করেছিল। এই ব্যবস্থাপত্রের উপর ভিত্তি করে ১৯১১ সালের লোকগণনার রিপোর্টে রাজবংশীকে ক্ষত্রিয় হিসেবে উল্লেখ করা হয় যদিও রাজবংশীকে ক্ষত্রিয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দে রংপুর ক্ষত্রিয় সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে রাজবংশীদের ব্রাত্যত্ব মোচন করে উপনয়ন সংস্কার গ্রহণের প্রস্তাব নেওয়া হয় এবং এই প্রস্তাব অনুসারে ১৩১৯ বঙ্গাব্দে ২৭শে মাঘ তারিখে দিনাজপুর জেলার ডোমার থানার অন্তর্গত পেরোলবাড়ি গ্রামে ক্ষত্রিয় মহামিলন দিবস উদ্‌যাপিত হয় এবং উত্তরবঙ্গ আসামের

একুশ হাজার রাজবংশী ঐ অনুষ্ঠানে মস্তক মুণ্ডন করে ব্রাত্যত্ব মোচন করে উপনয়ন গ্রহণ করে। এরপর প্রতিবছর ২৭শে মাঘ রাজবংশীদের এই ব্রাত্যত্ব মোচন ও উপনয়ন গ্রহণ অনুষ্ঠিত হতে থাকে। আজও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ২৭শে মাঘ অতি পবিত্র দিবস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে। ১৯১৩ সালে তৎকালীন জনগণনা আধিকারিক ও-ম্যালে তাঁর রিপোর্টে রাজবংশী ও কোচকে পৃথক পৃথক জাতি হিসেবে স্বীকার করেন। উত্তরবঙ্গে বর্তমান রাজবংশী সমাজ অনুন্নত জাতির তালিকাভুক্ত (Scheduled Caste)। সম্প্রতি আসামের রাজবংশীকে আদিবাসী (Scheduled Tribe) হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অবশ্য সেখানকার রাজবংশীদের একটি অংশ এই *তালিকাভুক্তির বিরুদ্ধাচারণ করে আন্দোলন করছেন এই মর্মে যে, রাজবংশীরা* আদিবাসী নন, ক্ষত্রিয়। ১৩ই জুলাই ১৯৯৬ প্রকাশিত খবরের কাগজ থেকে দেখা যায় যে, তাদের এক বৃহৎ অংশ আদিবাসী হিসেবে অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইন্দ্রিজিৎ গুপ্তের কাছে গণডেপুটেশনে যাবেন বলে স্থির করেছেন।

রাজবংশী সমাজের ক্ষত্রিয় সমাজভুক্তির আন্দোলনের এই ইতিহাস থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, আর্যীকরণ ব্রাহ্মণীকরণের ধারায় এই গ্রহণশীল মানবগোষ্ঠী শুধু আর্যভাষা ও সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করেই সন্তুষ্ট থাকেনি, আর্যদের সমান সামাজিক মর্যাদা লাভের একটি গণ অভিপ্রায়ও তাদের ভিতরে ধীরে ধীরে প্রবল হয়ে ওঠে এবং সেই অভিপ্রায় শেষ পর্যায়ে ক্ষত্রিয়ত্ব লাভের প্রচেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করে।

এই হল রাজবংশী জনগোষ্ঠীর পরিচয়। রাজবংশীদের লোকসংগীতের কথা ও সুর সম্যকভাবে বিশ্লেষণ করলে তাদের এই পরিচয়ের বহু সূত্র ও নিদর্শন পাওয়া যেতে পারে।

আমাদের পূর্বের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়েছে যে রাজবংশীরা ভারতীয় আর্যভাষাকে গ্রহণ করেছে খ্রিস্টিয় সপ্তম শতাব্দীর আগেই। কিন্তু উচ্চারণগত আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই ভাষাকে হিউয়েন সাঙ-এর কাছে মধ্যভারতের ভাষা থেকে সামান্য পার্থক্যযুক্ত মনে হয়েছিল। এই ভাষার বৈশিষ্ট্য নিয়ে তাই একটু বিশদ আলোচনা প্রয়োজন। বিশেষ করে আমাদের উদ্দেশ্য যখন লোকসংগীত বিশ্লেষণ ও আলোচনা। কোনও অঞ্চলের লোকসংগীত রচিত হয় সেই অঞ্চলের লোক কবিদের দ্বারা সেখানকার আঞ্চলিক ভাষায়। সেই অঞ্চলের কণ্ঠভঙ্গি ও উচ্চারণের বিশিষ্টতা লোকসংগীতের সম্পদ। রাজবংশীদের ব্যবহৃত ভাষা সম্বন্ধে তাই বিশদ আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও যুক্তিযুক্ত।

উত্তরবঙ্গের অধিবাসী রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত ভাষা বা উপভাষার প্রথম উল্লেখ চোখে পড়ে জর্জ আব্রাহাম গ্রীয়ারসন-এর সমীক্ষা ‘Linguistic Survey of

India'-তে। তিনিই সর্বপ্রথম রংপুর, দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চল জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং আসামের গোয়ালপাড়া জেলার অধিবাসী রাজবংশী সমাজে ব্যবহৃত ভাষাকে একটি স্বতন্ত্র উপভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর মতে, যেহেতু প্রধানত রাজবংশীরাই এই ভাষা ব্যবহার করে তাই এটিকে রাজবংশী ভাষা বলা হয়। কিন্তু এটি আসলে বাংলারই একটি উপভাষা।

গ্রীয়ারসনের পরে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. সুকুমার সেন, ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক, ড. নির্মল দাস প্রমুখ ভাষাতত্ত্ববিদ গবেষক পণ্ডিত এই ভাষার বিভিন্ন দিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেন আঞ্চলিক বৈচিত্র্যর দিক থেকে এই ভাষাকে কামরূপী উপভাষা হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। নামকরণের দিক থেকে রাজবংশী অথবা কামরূপী কোন্‌টি বেশি যুক্তিযুক্ত হবে সেই সম্পর্কে মূল্যবান বিশ্লেষণ করেছেন ড. নির্মল দাশ। ড. দাশের অভিমত যে 'রাজবংশী' এই অভিধায় উপভাষাটির নামকরণ করলে তা অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি উভয় দোষেই দুষ্ট হবে। একদিকে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ছাড়াও অন্যান্য প্রজাতির মানুষ যথা মুসলমান, খেন, যুগী, কোচবিহারের খাগড়াবাড়ী অঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ, এমনকি রাভা, গারো প্রভৃতি আদিবাসী এই উপভাষা ব্যবহার করে থাকেন। উপভাষাটির রাজবংশী নামকরণে এঁরা সকলে বাদ পড়ে যাবেন। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ ছাড়া দক্ষিণবঙ্গেও 'রাজবংশী' নামে অনেক মানুষ আছেন—নদিয়া, ২৪ পরগনা, মেদিনীপুর, হুগলি প্রভৃতি জেলায়—যারা এই ভাষা ব্যবহার করেন না। 'রাজবংশী' অভিধায় তাই এই মানুষজন অকারণেই অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়বেন। ড. দাশ তাই এই উপভাষাকে 'কামরূপী' অভিধাই অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করেছেন। পরবর্তীকালে ড. সত্যেন্দ্রনাথ বর্মন এই উপভাষায় পি. এইচ. ডি. করার জন্য ব্যাপক সমীক্ষা করেন। ড. বর্মন 'রাজবংশী' ভাষা-ভাষী গোষ্ঠীর এক গণ্ডগ্রামের মানুষ। এই উপভাষাকে ছেলেবেলা থেকেই ব্যবহার করেছেন এবং পি. এইচ. ডি গবেষণা হিসেবে বিজ্ঞানভিত্তিক সমীক্ষা করেছেন। তাই তাঁর বিশ্লেষণ হয়েছে অনেক নিখুঁত ও বাস্তবধর্মী। এই উপভাষার নামকরণ প্রসঙ্গে ড. বর্মন, ড. নির্মল দাস-এর যুক্তি গ্রহণ করেছেন এবং কামরূপী অভিধাই অধিক যুক্তিযুক্ত বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন।

রাজবংশী উপভাষা নিয়ে বিশদ চর্চা করেছেন শ্রদ্ধেয় প্রয়াত উপেন্দ্রনাথ বর্মন এই শতাব্দীর প্রথম ভাগে। প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন এ বিষয়ে বলতে গেলে পথপ্রদর্শক। তিনি অবশ্য গ্রীয়ারসনের অনুসরণে এই ভাষাকে 'রাজবংশী' হিসেবেই নামকরণ করেছেন। আবার রাজবংশী সমাজের বেশ কিছু গবেষক-পণ্ডিত এই

ভাষাকে কামতাপুরী বা কামতাবিহারী আখ্যার পক্ষে অভিমত দিয়েছেন। রাজবংশী সমাজের একচ্ছত্র সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক নেতা যিনি ছিলেন ক্ষত্রিয় আন্দোলনের কর্ণধার এবং এই জনগোষ্ঠীর সর্বাঙ্গীণ উন্নতির একনিষ্ঠ সাধক ও পথপ্রদর্শক এবং যাঁকে বলা হয় রাজবংশী জাতির জনক সেই পঞ্চানন বর্মা এই ভাষাকে 'কামতাবিহারী' অভিধায় ভূষিত করেছেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় এক প্রবন্ধে পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবিশ যুক্তি সহকারে এই ভাষাকে 'কামতাবিহারী' নামে চিহ্নিত করাই শ্রেয় দাবি করেছেন। রাজবংশী অধ্যুষিত এই অঞ্চল কামতাপুর বা কামতা এই রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক পরিচয়ের ভিত্তিতে এখানকার ভাষা কামতাপুরী বা কামতাবিহারী এই যুক্তি অতি সম্প্রতি শ্রী ধর্মনারায়ণ বর্মা গ্রহণ করেছেন এবং *A Step of Kamata Bihari Language* গ্রন্থে এই ভাষা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অনেক গবেষক পণ্ডিত এই ভাষাকে অত্যন্ত অযৌক্তিক ভাবে অবজ্ঞাভরে 'বাহে' ভাষা বলেছেন। তাঁদের এই অভিমত-এর সূত্র অবশ্য সেই গ্রীয়ারসন যিনি দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলের রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত ভাষার একটি আঞ্চলিক বিভাষার উল্লেখ করে তাকে 'বাহে উপভাষা' নামে চিহ্নিত করেছেন। পরবর্তী পণ্ডিতগণ গ্রীয়ারসন উল্লিখিত তরাই অঞ্চলের মুষ্টিমেয় কিছু লোকের ভাষা (৪৭৪৩৫ জন)* এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে উত্তরবঙ্গের সুবৃহৎ রাজবংশী গোষ্ঠীর (৩৫০৯১৭১ জন) ভাষাকে বিনা বুদ্ধি বিচারেই 'বাহে' বলে অভিহিত করেছেন। একটি ক্ষুদ্র অংশের নামানুসারে সমগ্রের নামকরণে যে সমস্যার উদ্ভব হওয়া উচিত এখানে ঠিক তাই হয়েছে। তাছাড়া তথ্যগত ত্রুটির বিচারও তাঁরা করেন নি বা করতে পারেন নি কারণ রাজবংশী গোষ্ঠীর মানুষ বা ভাষার সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা অতি সামান্য।

দার্জিলিং-এর তরাই অঞ্চলের রাজবংশীদের ভাষার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের রাজবংশীদের ভাষার কিছু পরিমাণ স্বাতন্ত্র্য আছে একথা সত্য। এই স্বাতন্ত্র্য কিন্তু যে কোন ভাষার আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের অঙ্গ মাত্র। এই আঞ্চলিক বৈচিত্র্যের জন্য একটি স্বতন্ত্র উপভাষার/বিভাষার পরিকল্পনা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাছাড়া নামকরণের যুক্তিও প্রমাদপূর্ণ। 'বাহে' শব্দটি রাজবংশী ভাষায় একটি সম্বোধন পদ। পিতৃস্থানীয় মাতৃস্থানীয়েরা পুত্রস্থানীয় ও কন্যাস্থানীয়াদের স্নেহবশত সম্বোধন করার সময় এবং অনুরূপভাবে পুত্রস্থানীয় কন্যাস্থানীয়ারা পিতৃস্থানীয়-

(* গ্রীয়ারসনের সমীক্ষার সময় দার্জিলিং-এর রাজবংশীর সংখ্যা)।

মাতৃস্থানীয়াদের সম্বোধন করার সময় এই পদটি ব্যবহার করে। তুলনীয় বাংলা সম্বোধন পদ 'বাবাহে'। অর্থাৎ বাংলা সম্বোধন পদ 'বাবাহে' থেকে 'বাহে' শব্দটি নিষ্পন্ন। 'বাহে' সম্বোধন পদটি ব্যবহার করে বলেই তরাই অঞ্চলের রাজবংশীদের 'বাহে' আখ্যা দেওয়া যেমন অযৌক্তিক তাদের ব্যবহৃত ভাষাকেও তেমনি 'বাহে' নাম দেওয়া অযৌক্তিক। উল্লেখ করা যেতে পারে যে পিতৃস্থানীয় মাতৃস্থানীয়ারা অনেক সময়ে 'বাহে'র পরিবর্তে 'বাউ'/'বাও' অথবা 'বাপই' পদটি ব্যবহার করেন। এই 'বাপই' বাফে শব্দরূপে ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। উত্তরবঙ্গের বিভাষা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় পরিতোষ দত্ত লিখেছেন যে তাদের মেখলিগঞ্জের বাড়িতে মুসলিম ঘরের কাজ করা মেয়ে তারা বিবি তাঁকে ডাকত 'বাউ' বলে।

গ্রীয়ারসনের পক্ষে এই ভ্রান্তির সম্ভাব্য কারণ এই যে তিনি মূলত বিভিন্ন স্তরের সরকারি কর্মচারীদের সাহায্যে তাঁর সমীক্ষার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। সেই সময়ে উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের মধ্যে সরকারি চাকুরিয়া ছিল না বললেই চলে। তাই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত কোন বাঙালি তাঁকে এই ভাষা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করেছিলেন, যিনি তরাই অঞ্চলের এই মানুষদের মুখে 'বাহে' শব্দটির ব্যবহার লক্ষ্য করে তাদের 'বাহে' বলে ভুল করেছিলেন। গ্রীয়ারসনের রিপোর্ট থেকে দেখা যায় যে জলপাইগুড়ি জেলার এই তথ্য সরবরাহকারী ছিলেন বাবু মুরলীধর রায় চৌধুরী এবং তরাই অঞ্চলের তথ্যদাতা ছিলেন বাবু প্রসন্নচন্দ্র দত্ত। পূর্ববঙ্গের বাবুশ্রেণীর এই মানুষেরা গরিব নিরক্ষর রাজবংশী গ্রামবাসীদের ঘৃণা ও অবজ্ঞার চোখে দেখতেন এবং অতি স্বাভাবিক কারণেই তাদের ভাষাকে হেয় প্রতিপন্ন করার সুযোগের সদ্ব্যবহার তারা করেছিলেন এই ধরনের ভুল তথ্য সরবরাহ করে। বাবু প্রসন্ন চন্দ্র দত্ত যে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন সেটা খুব পরিষ্কার। তরাই অঞ্চলের তথাকথিত 'বাহে' উপভাষার গান হিসেবে তার দেওয়া গ্রীয়ারসনের উল্লিখিত গানটি প্রকৃতপক্ষে জলপাইগুড়ির চোরচুন্নির গান—এবং তার কথাও জলপাইগুড়ি অঞ্চলের কথা বা বাণী-তরাই অঞ্চলের নয়। গানের প্রথম চরণ উল্লেখেই বিষয়টি পরিষ্কার হয় ঃ

চোরা যা যা যা যা চুরি করিবা
ঘরের আগা পাছা দিয়া, কতই ধান আছে পাকিয়া,
জমির ধান পাকিয়া আছে রং রং করিয়া
থরায় ঘুটিকে চাউল আছেরে চোরা,
অবলকার হোবে, ছুয়া কি খাবে বিহানে উঠিয়া।

তাদের এই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য পরবর্তীকালের গবেষকগণ কর্তৃক ভুল তথ্য পরিবেশনের ফলে সমগ্র উত্তরবঙ্গে রাজবংশী-অরাজবংশী গোষ্ঠীর মানুষজনের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

এবারে বিবেচনা করা যাক উত্তরবঙ্গের মানুষ বিশেষ করে গ্রামের মানুষ যারা বাইরের প্রভাবে প্রভাবিত হন নি তাঁরা এই ভাষাকে কী বলেন। এই সূত্রে ১৯৮০ সালের ২৪শে অক্টোবর গণশক্তি পত্রিকায় প্রকাশিত কোচবিহার জেলার শ্রী দীনেশ ডাকুয়া তাঁর লেখা 'রাজবংশী ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে' এই বিষয়ে রাজবংশী মানসিকতার আলোচনা করেছেন। বাস্তব অবস্থার উল্লেখ করে তিনি বলেছেন—উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় পুরাতন অধিবাসী রাজবংশী ভাষাভাষী হিন্দু ও মুসলমানেরা নিজেদের 'দেশী' বলে জানতেন অন্যদিকে 'ভাটি' অর্থাৎ দক্ষিণবঙ্গ থেকে চাকরি বা ব্যবসা করার জন্য যে সমস্ত বাঙালি উত্তরবঙ্গে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন তাদের বলা হত 'ভাটিয়া'। 'দেশী' মানুষের ভাষা তাই তাদের কথ্য ভাষাকে রাজবংশীরা সাধারণভাবে বলতেন 'দেশী' ভাষা।

'বাহে' প্রসঙ্গে শ্রী ডাকুয়া প্রকৃত তথ্য উল্লেখ করে বলেছেন যে, একমাত্র পুত্রকন্যা স্থানীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে অপত্যার্থে অথবা পিতৃমাতৃস্থানীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্মানার্থে এই 'বাহে' সম্বোধনটির ব্যবহার হবে এবং তদনুরূপ ক্রিয়ায় সম্মানসূচক রূপ ব্যবহৃত হবে। রাজবংশী ব্যাকরণের এই নিয়ম মেনে না চললে, (যা রাজবংশী ছাড়া অন্যদের মেনে চলা কঠিন) হরেক রকমের বিপত্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। নিজের দেখা এক ঘটণার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে এই বিপত্তির ব্যাখ্যাও তিনি করেছেন। ঘটনাটি এই রূপ ঃ শাক নিয়ে যাচ্ছেন এরকম এক রাজবংশী মহিলাকে দেখে এক অ-রাজবংশী ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করছেন, 'এ বাহে শাক বেচবা নাকি?' মহিলা উত্তর না দিয়ে হনহন করে এগিয়ে যাওয়ায় ঐ ভদ্রলোক একই ভাবে আরও দু'বার ডাকার পর অত্যন্ত রাগত সুরে মহিলা উত্তর দিচ্ছেন—'ড্যাকের না জানেন তায় ড্যাকান ক্যানে অমন করি?' অর্থাৎ ডাকতে না জানলে ওভাবে ডাকছেন কেন? মহিলার আহত হওয়ার কারণ এই যে 'বাহে' সম্বোধনের মাধ্যমে যে সম্মান তাকে দেখানোর কথা তা না করে ভদ্রলোক তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত ক্রিয়ার প্রয়োগ করেছেন। মহিলা খুব সসম্মানে সাড়া দিতেন যদি ভদ্রলোক রাজবংশী ব্যাকরণ অনুসরণ করে জিজ্ঞেস করতেন, ' কি বাহে, শাক বেচাইবেন নাকি?' এ-প্রসঙ্গে শ্রী ডাকুয়া আরও বলেছেন, 'স্থানকাল পাত্র না বুঝে একটি সুন্দর ও সম্মানজনক শব্দের অপব্যবহারের ফলে হাটে মাঠে ঘাটে অনেক ঝগড়াঝাটি ও বিশ্রী কাণ্ড হতে দেখেছি যা অপব্যবহারকারীর নিতান্ত অজ্ঞতার ফল, কখনই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত নয়!'

একটি জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী অধিবাসীদের মধ্যে পারস্পরিক আদানপ্রদান, সামাজিক জীবনে পারস্পরিক বিনিময় এবং ঘনিষ্ঠ সংযোগের অভাবে একটি প্রচলিত ভাষার বিভিন্ন আঞ্চলিক রূপ বা উপভাষার উদ্ভব ঘটে। ভাষাতাত্ত্বিক অটো য়েস্‌পারসন *(Mankind : Nation and Individual)*-এর মতে ভাষা থেকে উপভাষার জন্মের কারণ '...not purely physical but want of communication for whatever reason ... এবং ... linguistic unity depends always on intercourse on a community of life ...' সি. এফ. হ্‌ফেট *(Introduction to Linguistics,* Lesson 5, 'Dialects') স্বীকার করেছেন ভাষার রূপ এবং ধ্বনিগত একরূপতার মূলে বাচকগোষ্ঠীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সান্নিধ্যের গুরুত্বকে। আবার একটা অঞ্চল রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে গেলে এবং বিভাজিত প্রত্যেকটা অংশে পৃথক পৃথক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে একটা অখণ্ড বাক্‌ সম্প্রদায় সঙ্গতকারণেই বিভক্ত হয়ে যায়। পরিণতিতে এইভাবে বিভাজিত বাক্‌-সম্প্রদায় বিভিন্ন অংশের ব্যবহারে একই ভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে পৃথক পৃথক চরিত্র অর্জন করতে থাকে। এ বিষয়ে ভাষাতত্ত্ববিদ্‌ লেনার্ড ব্লুমফিলড্‌ *(Language)*-এর অভিমত 'It is contained that under wider conditions a new political boundary led in less than fifty years to some linguistic differences.' আবার একই শাসনব্যবস্থা বা সরকারের অধীনস্থ অঞ্চলে ভাষার দিক থেকে একধরনের সামান্যতা বজায় থাকে। লেনার্ড ব্লুমফিল্‌ডের মতে—'Apparently common government and religion and especially the custom of inter-marriage within the political unit led to relative uniformity of speech.' রাজবংশী গোষ্ঠীর উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনায় দেখা গেছে যে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগে দ্রাবিড় বা পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়রা এবং খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতক বা তারও কিছু পরে তিব্বত-ব্রহ্মভাষী মঙ্গোলিয়ান নৃগোষ্ঠীর একটা শাখা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে এবং কালক্রমে একটি অখণ্ড মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে আর্যীকরণের সম্মুখীন হয়। আর্যীকরণের এই ধারায় এই সমন্বিত মানবগোষ্ঠী তাদের পূর্বতন ধর্মবিশ্বাস পরিত্যাগ করে আর্যসুলভ ধর্ম, আচার এবং বিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে যেমন গ্রহণ করেছে, তেমনি ভাষার ক্ষেত্রেও তাদের পূর্বতন ভাষার পরিবর্তে ভারতীয় আর্য ভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছে। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর মন্তব্য অনুসরণ করে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো গেছে যে খ্রিস্টপর সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই এই মানবগোষ্ঠী, সাম্প্রতিক রাজবংশীদের পূর্বপুরুষরা মধ্য ভারতীয়

আর্যভাষার তৃতীয় স্তরের ভাষা মাগধী অপভ্রংশকে নিজেদের ভাষা হিসেবে গ্রহণ করে। অবশ্য তাদের ব্যবহারে ধ্বনিগত ও রূপগত দিক থেকে মাগধী অপভ্রংশ একটি স্বতন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করে যা মাগধী অপভ্রংশেরই একটি আঞ্চলিক রূপ। এই গ্রহণ বর্জনের কাজ যে অনেক আগেই শুরু হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় রাজবংশীদের ভাষায় মধ্যভারতীয় আর্যের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন কিছু বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি থেকে। বাংলা ভাষা বিভিন্ন অঞ্চলে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং স্বাতন্ত্র্য নিয়ে যেভাবে বিবর্তিত হয়েছে রাজবংশীদের পূর্বপুরুষদের দ্বারা অধিগৃহীত আর্য ভাষাটাও সেই একই নিয়মে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু তার এই বিবর্তন রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতার জন্য মধ্যবাংলা পর্যন্ত এসে থেমে গেছে। উনিশ শতকে বাংলার রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কলকাতার গুরুত্ব অসাধারণভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় কলকাতা এবং তার সন্নিহিত অঞ্চলের একাধিক উপভাষার বৈশিষ্ট্যকে আত্মস্থ করে জন্ম নিয়েছে শিষ্ট বা সাহিত্যিক বাংলা, যা তার নিজস্বগুণে সমগ্র বঙ্গদেশের শিষ্ট সমাজের ভাষা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে। অন্য দিকে বঙ্গদেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক গুরুত্ব কমে যাওয়ার ফলে সেই অঞ্চলের অধিবাসী রাজবংশীদের ভাষার গুরুত্বও কমে গেছে এবং বিবর্তনের পথে তা আর বেশিদূর যেতে পারে নি। ফলে বাংলার মধ্যযুগীয় বৈশিষ্ট্য এই অঞ্চলের ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য রয়ে গেছে।

গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলার কিছু অংশ প্রাচীন কামরূপের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে সেখানকার অধিবাসী রাজবংশীদের ভাষা ছিল কামরূপী। অহোম রাজবংশ অধিকৃত পূর্ব অসমের সঙ্গে গোয়ালপাড়া-কামরূপ অঞ্চলের ভাষাগত ঐক্য কোনদিনই স্থাপিত হয়নি। Linguistic Survey of India-তে গ্রীয়ারসন এই অনৈক্যের কথা উল্লেখ করেছেন। অসমীয়া ভাষার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গে গ্রীয়ারসনের বক্তব্য—'North Bengal and Assam did not get their language from Bengal proper but directly from the West. Magadhi Apabhransa, in fact, may be considered as spreading out east-wards and south-wards in three directions. To the North-east it developed into Northern Bengali and Assamese, to the south into Oriya and between the two into Bengali.' এই পার্থক্যের ভিত্তিতে আসামের প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ বাণীকান্ত কাকতি *(Assamese its Formation & Development)* গোয়ালপাড়া ও কামরূপের ভাষাকে 'Western Assamese' বলেছেন। উপেন্দ্রনাথ গোস্বামীও *(A Study on Kamrupi)* এই পার্থক্য স্বীকার করেছেন এবং Western Assamese-কে 'কামরূপী' বলে চিহ্নিত করেছেন। অর্থাৎ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি,

গোয়ালপাড়া, কামরূপ, রংপুর, দিনাজপুর প্রভৃতি জনপদ, যে কোন একটি রাজনৈতিক সত্তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকলে (বঙ্গদেশ, অসম, পাকিস্তান যাই হোক না কেন) এই অঞ্চলের ভাষার বিবর্তন অনেক গতি লাভ করত। সেটা ঘটেনি বলেই এই বিস্তৃত অঞ্চলের ভাষার মধ্যে আজও মধ্যবাংলার লক্ষণ প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

এক্ষণে রাজবংশী বা কামরূপী উপভাষার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করা যেতে পারে। মূলত তিনটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শিষ্ট বাংলার সঙ্গে কামরূপীর এই পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়—(১) ধ্বনিগত, (২) রূপগত এবং (৩) পদবিন্যাসগত। ড. নির্মলেন্দু ভৌমিকের মতানুসারে—উপভাষা সম্পর্কে আলোচনা প্রধানত ধ্বনির উচ্চারণ বিশেষত্বকে নির্দেশ এবং মূল ভাষার রূপের বিকৃতি নিরূপণ করা—যার মধ্যে মিশে থাকে কিছু আঞ্চলিক বিশেষত্ব।

ধ্বনিতত্ত্বের দিক থেকে উত্তরবঙ্গের উপভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করার মতো। রূপতত্ত্বের দিক থেকে চলিত বাংলার রূপের বিকৃতি বা রূপান্তর প্রধান। যে সব অনুসর্গ প্রাচীন ও মধ্যযুগে ব্যবহৃত হত, আধুনিক বাংলায় আর ব্যবহৃত হয় না ; কিংবা কারক বিভক্তির যে সব রূপ কথ্যভাষায় এখন অচল বা কবিতাতেই কেবল সচল ; যেসব বাক্যরীতি ও বাগধারা, অব্যয় এখনও সাধু বাংলায় পাওয়া গেলেও চলিত ভাষায় মেলে না, সেইগুলোই এই কামরূপী উপভাষাতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা ভাষার সঙ্গে এই উপভাষার যোগাযোগ বেশ ঘনিষ্ঠ। ড. ভৌমিকের মতে এই উপভাষার মাধ্যমেই বাংলা ভাষার ইতিহাস ও গতি পরিবর্তনের স্তরগুলিকে স্পষ্টরূপে অনুধাবন করা যায়।

অব্যয়, শব্দ ও বাগ্‌ধারার বিশিষ্ট ও ব্যাপক ব্যবহার এই উপভাষার এক বিশেষত্ব, ধ্বন্যাত্মক শব্দের অতি ব্যবহার আর একটি বিশেষত্ব। ধ্বন্যাত্মক শব্দে অনুস্বার যোগ করার প্রবণতা, পরিচিত কিছু কিছু তৎসম ও তদ্ভব শব্দের অর্থের পরিবর্তন প্রভৃতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। উপভাষার শব্দ-সম্ভারের অধিকাংশই অর্ধ-তৎসম ও তদ্ভব ; কিছু দেশী ও আরবি-ফারসী, ও হিন্দী শব্দ। এর সঙ্গেই রয়েছে কিছু বোড়ো শব্দের সমাহার।

ধ্বনিগত স্বাতন্ত্র্য ঃ

(১) স্বরধ্বনির বিবর্তনে বাঙালি অপিনিহিতি এবং অভিশ্রুতির স্তর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় সীমিত সংখ্যক ক্ষেত্রে অপিনিহিতি ঘটলেও এই উপভাষার নিয়মিত ধ্বনি বৈশিষ্ট্য নয়। অভিশ্রুতিও এই ভাষায়

বিরল। অর্থাৎ পূর্বস্তরের স্বরধ্বনিসমূহ এই উপভাষায় অপরিবর্তিতই থেকে গেছে। যেমন—সংস্কৃত কল্যে, প্রাকৃত কল্লিং, প্রাচীন ও মধ্য বাংলা কালি, বঙ্গালী কাইল, রাঢ়ী কাল কিন্তু উত্তরবঙ্গের উপভাষায় কালি।

(২) স্বর এবং ব্যঞ্জনধ্বনি (phoneme) সংখ্যাগত দিক থেকে সমান হলেও কামরূপীতে তার বিস্তারণ (distribution) শিষ্ট বাংলার অনুরূপ নয়। /র/এবং/ল/ এই ধ্বনি দুটি শিষ্ট বাংলায় শব্দের আদ্য, মধ্য এবং অন্ত্য (Initial, medial, final) এই তিন অবস্থানেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কামরূপীতে শব্দের আদ্য অবস্থানে এই ধ্বনি দুটি সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। এক্ষেত্রে মূল শব্দের আদিতে /র/ থাকলে তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনিটি /অ/ এর এবং /ন/ ধ্বনিটি /ল/ এর প্রতিনিধিত্ব করে। উদাহারণ—

শিষ্ট বাংলা	**কামরূপী**
রাজ্য	আইজ্য
রাক্ষস	আইক্খস
লাল	নাল
লজ্জা	নইজ্জা
রস	অশ

র কে 'অ' উচ্চারণ নিয়ে একটা বহুল প্রচলিত রসিকতা আছে—আজা আজা তোমার কপালত্ ক্যানে অক্তো, নোয়ায় আনী নোয়ায় ওটা অঙ্ অঙ্।

অনেক সময়ে আবার 'অ'-এর উচ্চারণ হয় 'র'-এর মতো। এই নিয়েও একটি বহুল প্রচলিত রসিকতা আছে।

আম ঠাকুরের বারি গেনু রাম খাবার রাশে। সেও রাম রাগালত রাদা কাচা রাদা পাকা।

(৩) রাঢ়ী ও বাঙালিতে /র/ এবং /ড়/ এই দুটি ধ্বনিরই ব্যবহার আছে—কিন্তু কামরূপীতে /ড়/ এবং /র/ এর উচ্চারণ এক।

বাড়ী → বারি
গাড়ী → গারি
সড়ক → শরোক
বড → বরো

(৪) 'এ' স্বরের উচ্চারণ অধিকাংশ সময়েই 'অ্যা' হয়।

দেবেন → দ্যাবেন, মেঘ → ম্যাগ ইত্যাদি।

(৫) কখনও 'এ' হয়ে যায় 'ই' এবং 'ও'-কার হয়ে যায় 'উ'-কার। (স্বরসঙ্গতি)।

শিবেন → শিবিন কোকিল → কুকিলা,

নৃপেন → নিপিন (নিরপিন) ইত্যাদি।

অনেক সময়ে 'আ' → 'ও'-তে রূপান্তরিত — দুয়ার → দুয়োর

ধ্বনি রূপান্তরের অন্যান্য রূপগুলি হল—

(৬) **সমীভবন**—

প্রগত	পরাগত
↓	↓
আত্মা → আত্‌তা	ধর্ম → ধমমো
পদ্ম → পদ্‌দো	খরচা → খচচা
বাক্য → বাইক্‌কো	ভর্তি → ভত্‌তি
রাজ্য → আইজ্‌জো	ঘরজামাই → ঘরজাঙোই

স্বর সমীভবন—

চাকরি → চাকিরি, নাতনি → নাতিনি

(৭) **বিষমীভবন**—

লালসা → ন্যালোচ

শরীর → শরীল

জরুর (জরুরী) → জরুল।

(৮) **বিপর্যাস**—

জ্যোৎস্না → জোনাক

বুগচা (তুর্কী) → বোচকা

বক্‌স (ইং) → বাশ্‌কো

মাংস → মশোঙ্‌।

মহাপ্রাণ ধ্বনির বিপর্যাস—

গোবিষ্ঠা → ঘইশা (ঘুঁটে)

মহিশ → ভইশ।

(৯) **ঘোষীভবন**—

কাক → কাগ → কাগা।   শকুন → শগুন

সকল → শগুল

(১০) **অঘোষীভবন—**

রাগ → আক্।　　　　যোগ → জোক

খরাব → খারাপ।　　　　গুলাব → গোলাপ

বিষুব → বিশুমা　　　　চক্ষু → চোখ → চৌখ

(১১) **মহাপ্রাণীভবন—**

বুভুক্ষা → ভোক, শুষ্ক → শুকান্ স্তম্ভ → থাম

স্তবক → থোকা, পুচ্ছ → ফিচা, বর্কর → ভোকরা (পাঁঠা)

বাসা → ভাশা, ভেলা → ঢ্যাল

যখন → ঝ্যাখোন, জ্যালা → ঝ্যালা, যত → ঝতো

যেমন → ঝ্যামোন, যে → ঝে, ঝায়

(১২) **অল্পপ্রাণীভবন—**

মাঘমাস → মাগমাস, ব্যাঘ্র → বাঘ → বাগ, লাঠি → নাটি,

গুষ্ঠী → গুশটি, কথা → কতা, সাথে → সাতে, মাথা → মাতা,

বাছা → বাচা, মেঝে → মাজিয়া, দুধ → দুদ, আঁধার → আন্দার,

শৃঙ্খল → শিকোল, শোভা → শোবা।

(১৩) **নাসিক্যীভবন—**

হংস → হাঁশ

পঙ্ক → পাঁক → প্যাঁক

পেচক → প্যাঁচা

(১৪) **মুর্ধন্যীভবন—**

দক্ষিণ → ডাইন, তির্যক → ট্যারা

দংশক → ডাঁশ, দাড়িম্ব → ডালিম, দণ্ড → ডন্‌ডো

দণ্ডবৎ → ডন্‌ডবত্, তকলি → টাকুরি,

দ্বি-অর্ধ → দেড় → ড্যাব।

রূপতত্ত্বগত পার্থক্য ঃ

এই উপভাষায় শব্দের গঠন এবং রূপান্তরের উপাদানগুলিকে মোটামুটিভাবে দু'ভাগে ভাগ করা চলে—(১) প্রত্যয় (কৃৎ ও তদ্ধিত) এবং (২) বিভক্তি (শব্দ ও ক্রিয়া বিভক্তি)।

ধাতুর সঙ্গে কৃৎ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষ্য, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য এবং বিশেষণ পদ গঠন করে। উদাহরণ—

আই → ঝার্ + আই = ঝারাই, মারা + আই = মারাই,
নর্ + আই = নরাই (লড়াই),

আইত → শ্যাব্ + আইত = শ্যাবাইত

আনি → ফির্ + আনি = ফিরানি, ঘুর্ + আনি = ঘুরানি।

আইয়া → দ্যাখ্ + আইয়া = দ্যাখাইয়া, ধো + আইয়া = ধোয়াইয়া।

আরু → জুঝ্ + আরু = জুঝারু, ডুব + আরু = ডুবারু

ইয়া → ব্যাচা + ইয়া = ব্যাচাইয়া, চরা + ইয়া = চরাইয়া

উরা → হাগ + উরা = হাগুরা, মুত + উরা = মুতুরা

ওয়াল → গার + ওয়াল = গারোয়াল, ঘাট + ওয়াল = ঘাটোয়াল

তি → উঠ্ + তি = উঠতি, কম্ + তি = কমতি

রি → ঘ্যাঙা + রি = ঘ্যাঙারি, ডোডা + রি = ডোডারি,
শোশা + রি = শোশারি

ই → ন্যাদা + ই = ন্যাদাই, গুরা + ই = গুরাই, গোছা + ই = গোছাই

তদ্ধিত প্রত্যয় বিশেষ্য ও বিশেষণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বিশেষ্য, বিশেষণ বা নামধাতু গঠন করে।

আ → পশ্চিম + আ = পশ্চিমা, ভাটি + আ = ভাটিয়া,
হলদি + আ = হলদিয়া।

আতি → চাউল + আতি = চাউলাতি, হাকিম + আতি = হাকিমাতি

আনি → ঠ্যাঙ + আনি = ঠ্যাঙানি, নাক + আনি = নাকানি

আর → বাদি + আর = বাদিয়ার, মুচি + আর = মুচিয়ার

আরু → বাঘ + আরু = বাঘারু, বুধ + আরু = বুধারু ইত্যাদি।

ফারসী প্রত্যয় ঃ

খোর্ → হারাম + খোর = হারামখোর, চশোম্ + খোর =
চশোমখোর, ঘুষ + খোর = ঘুষখোর

দার → চকি + দার = চকিদার, বাজনা + দার = বাজনাদার,
গায়ন + দার = গায়নদার।

দেশী প্রত্যয় ঃ

কাটা → চ্যাদেরা + কাটা = চ্যাদেরাকাটা

পরা → নাদান্ + পরা = নাদানপরা, খাণ্ডাইয়া + পরা = খাণ্ডাইয়াপরা।

নাগা → শোরপোটা + নাগা, চ্যামুরা + নাগা, ঘিন্ + নাগা

বারি → গরু + বারি, থান্ + বারি, পাতার + বারি

মুয়া → মাইয়া + মুয়া, বিলাই + মুয়া, আন্দার + মুয়া

হাটি → ধান্ + হাটি, কাউর + হাটি, গুয়া + হাটি।

উপসর্গ ঃ

নি → নি + লাজ, নি + ময়া, নি + পুত্তিরি

অ → অ + কুমারী

বি → বি + ধুয়া, বি + পরিত

স > শ → স + ধুয়া = সধোয়া, শধোয়া, শ + বালোক = শাবালোক।

হা → হা + ভাতিয়া = হাভাতিয়া।

বিশেষ্যর রূপভেদ ঃ

কামরূপীতে কারক, বিভক্তি ও বচন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে লিঙ্গ ভেদে বিশেষ্যের রূপভেদ ঘটে।

কর্তৃকারক → শূন্য '(০)' ও 'এ' বিভক্তি যোগে—

গরু ধান খায়য়া গেইচে।

হাশে ধান খায়য়া গেইচে।

কর্মকারক ও সম্প্রদান কারক স্বরান্ত পদে 'ক্' এবং ব্যঞ্জনান্ত পদে 'ওক্' যোগে—

জোনাকুক্ খাবার দ্যাকাও।

অবোক্ চুন দিয়া আইসোঙ্।

কখনও কর্মকারকে শূন্য বিভক্তি হয়—মুই ভাত খাইম।

করণকারক → দ্বারা, দিয়া যোগে—

মূল পদে ষষ্ঠীর 'র' এর সঙ্গে 'দারা'

মূল পদে কর্মের 'ক্', 'ওক্' এর সঙ্গে 'দিয়া'

মূল পদে স্বতন্ত্র বিভক্তি ছাড়া—'দিয়া' যোগে

উদাহরণ ঃ মোর দারা হিল্লা কাম হইবে না।

মোক দিয়া হিল্লা কাম হইবে না।

দাও দিয়া বাশ কাটি।

গরু দিয়া হাল বই।

অপাদান → হ্যাতে, থাকি যোগে

দ্যাওয়া হ্যাতে বশ্‌সোন পরে (আকাশ থেকে বৃষ্টি পড়ে)

গরুবারি হ্যাতে চ্যাংরাটাক ড্যাকে আন্।

গছ্ থাকি ফল পরে।

সম্বন্ধ পদ → শিষ্ট বাংলার মতো 'র', 'এর', যোগে।

বাবার টাকা হারে গেইচে।

গছের ঠ্যালোত্ পখির ভাশা।

অধিকরণ → 'ত্', 'ওত্', 'টে', 'ঠে', যোগে।

গছোৎ পাখি থাকে। নরেনেরটে টাকা আছে।

নদিত্ মাছ্ আছে। জলে জলে ভাশি ব্যারাই।

অধিকরণে শূন্য (০) বিভক্তি — বারি বারি ঘুরি ব্যারাই।

বচন ঃ

কামরূপীতে একবচন টা, খান দিয়ে এবং বহু বচন লা, গুলা/গিলা, ঘর দিয়ে হয়।

	একবচন		বহুবচন
উদা ঃ	চ্যাংরাটা	→	চ্যাংরাগুলা
	কাটারিখান্	→	কাটারিগুলা
	নরেন	→	নরেনের ঘর
	নাউয়া	→	নাউয়ার ঘর
	বাপোই	→	বাপোইঘর

কোনও কোনও ক্ষেত্রে মূল পদের দ্বিত্ব ঘটিয়ে বহুবচন করা হয়।

কায় (কে) → কায় কায় (কে কে), কি → কি কি

কোন → কোন কোন, জায় (যে, যিনি) → জায় জায় (যে যে, যিনি যিনি)

ঝায় (,,) → ঝায় ঝায় (,,)

লিঙ্গ পরিবর্তন ঃ লিঙ্গ পরিবর্তনে আ → ই তে

উ → ই তে, এবং নি, আনি যোগ করে

ব্যাটা → ব্যাটি।	পাগলা → পাগলি।
বুরা → বুরি।	ভোন্দা → ভুন্দি।
চাকোর → চাকোরানি।	ন্যাতোর → ন্যাতোরানি।
মিতোর → মিতোরানি।	বৈশাখু → বৈশাখি।
কালটু → কাল্‌টি	নাউয়া → নাউয়ানি।
নাল্‌চিয়া → নালচিয়ানি	চোর → চুরনি।
ধওলা → ধউলি।	ধাগ্‌রা → ধাগ্‌রি।
জোনাকু → জোনাকি	

সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ যোগে লিঙ্গ পরিবর্তন ঃ

গাবুরু → কইনা।	দাদা → ভাউজি।
গোলাম → বান্দি।	ভাতার → মাইয়া।

শোয়ামি → বনুশ। আজু (ঠাকুরদা, দাদু) → আবো (ঠাকুরমা, দিদিমা)

কিছু শব্দের পুংলিঙ্গে রূপ নেই ঃ

বৈরাতি, বিধুয়া, শধোয়া, পোয়াতি, ভুকানি, বোকালি, চাউলাতি, মোলাতি।

চ্যাংরা (ছেলে) বিশেষ্যের কারক বিভক্তি বচনের রূপ নিচে দেওয়া হল।

কারক বিভক্তি	**পুং/স্ত্রী**	**একবচন**	**বহুবচন**
কর্তৃকারক	চ্যাংবাটা/চ্যাংরিটা	গান করে।	চ্যাংরাগুলা গান করে।
কর্ম, সম্প্রদান	চ্যাংরাটাক/চ্যাংরিটাক	গান করির কন।	চ্যাংরাগুলাক গান করির কন।
করণ	চ্যাংরাটাক/চ্যাংরিটাক	দিয়া গান হইবে না	চ্যাংরাগুলাক্ দিয়া গান হইবে না।
অপাদান	চ্যাংবাটার/চ্যাংরিটার	থাকি গানের খাতা নিয়া নেও।	চ্যাংরাগুলার থাকি গানের খাতা নিয়া নেও।
সম্বন্ধপদ	চ্যাংরাটার/চ্যাংরিটার	গান ভাল না লাগে।	চ্যাংরাগুলার গান ভাল না নাগে।
অধিকরণ	চ্যাংরাটারটে/চ্যাংরিটারটে	গান হইবে না।	চ্যাংরাগুলারটে গান হইবে না।

কামরূপীতে নিশ্চায়র্থক 'ই', 'এ' তে পরিণত হয়।

যেমন ঃ আমার → মোর, তোমার → তোর

আমারই → মোরে, তোমারই → তোরে

সর্বনাম ঃ	একবচন	বহুবচন
	মুই (আমি)	আমরা/হামরা (আমরা)
	তুই (তুমি)	তোমরা (তোমরা, আপনারা)
	উয়ায় (সে)	উমরা (তারা, তাঁরা)

ক্রিয়া-বিশেষণের রূপ ঃ

কাল ব্যাপক ঃ অ্যালায়, অ্যালা (এখন), শ্যালায়, শ্যালা (তখন), জ্যালা (যখন), কোন্ ব্যালা (কখন), আজি (আজ), কালি (কাল), উদিনকা (পরশু, ঐদিন), আগোত (আগে), পাছোত (পাছে), পচ করি (তাড়াতাড়ি), দিনাও (দিনেই), শদায় (সদা), নগোতে (সম্প্রতি), আজিকাল (আজকাল), ইত্যাদি।

স্থান সূচক ঃ এটে, এইটে (এখানে) ; ওটে, ওইটে, সেইটে (সেখানে) ; কোটে (কোথায়), জেটে (যেখানে) ; সেটে (সেখানে) ; এততি (এদিকে), ওততি (ঐদিকে), শেত্তি (সেদিকে), ঝিত্তি (যেদিকে), ঝিদি (যেদিকে), ভিতরত, ভিতিরা (ভেতরে), বায়রাত বায়রা (বাইরে), মইদ্দোত (মধ্যে), আগোত, পাছোত্ ইত্যাদি।

পদ্ধতি জ্ঞাপক ঃ অ্যাঙ্ করি (এমন করি), ক্যাঙ্ করি (কেমন করে), ঝ্যাঙ্ করি (যেমন করে), শ্যাঙ্ করি, অঙ করি (তেমন করে) ইত্যাদি।

পরিমাণ গত ঃ অলোপ (অল্প), ব্যাশি ; অ্যাতোলা, অ্যাতুলা (এতগুলো), কতোলা (কতগুলো), জতোলা (যতগুলো), অ্যাকনা (একটুকু), অ্যাতোটা (এত পরিমাণ)।

সম্মতি বা অসম্মতিসূচক ঃ হয় (হ্যাঁ), হয় হয় (হ্যাঁ হ্যাঁ), নোয়ায়, নোহায় (না, নয়) অ্যাকেবারে (একেবারে), শইত্যে শইত্যে (সত্যে সত্যে)

হেতু বা কারণাত্মক ঃ ক্যানে (কেন), ক্যাঙ্ করি (কিভাবে), কিবাদে (কিসের জন্য), এইবাদে (এই জন্য), সেইবাদে (সেইজন্য) ইত্যাদি।

যৌগিক ঃ হেটে-হোটে, এটে-ওটে (এখানে সেখানে) ; জ্যালায়-শ্যালায় (যখন তখন) ; ইত্তি-উত্তি, হিত্তি-হুততি (এদিক-ওদিক) ; শউগ্ শমায় (সর্বদাই), জিদি-শিদি (যেদিক সেদিক), জ্যামোন ত্যামোন ইত্যাদি।

'মুই' সর্বনামটির কারক, বিভক্তি বচন রূপ দেওয়া হল বোঝার সুবিধের জন্য।

মুই

	একবচন	বহুবচন	দ্বিত্বপ্রাপ্ত বহুবচন
কর্তৃ	মুই	আমরা/হামরা	হামরালা, হামরাগুলা
কর্ম	মোক্	আমাক্/হামাক্	হামরালাক্, হামরাগুলাক্
করণ	মোক্ দিয়া, মোর দারা,	আমাক্/হামাক্ দিয়া/দারা,	হামারগুলাক্ দিয়া/দারা
সম্প্রদান	মোক্	আমাক্/হামাক্	হামারগুলাক্, হামারলাক্
অপাদান	মোরটে হ্যাতে/থাকি,	হামারটে হ্যাতে/থাকি	হামারলারটে হ্যাতে/থাকি
সম্বন্ধ	মোর	হামার	হামরালার, হামারগুলার
অধিকরণ	মোরটে	হামারটে	হামরালারটে, হামারগুলারটে

একইভাবে 'তুই' (তুমি), উয়ায়, তায় (সে ইয়ায় (এ), কায় (কে), জায় (যে) প্রভৃতির রূপ দেখানো যায়।

ক্রিয়ার রূপভেদ ঃ

'কর' ধাতু

	বর্তমান কাল সাধারণ		ঘটমান বর্তমান		পুরাঘটিত বর্তমান	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
উঃপুঃ	করঙ্	করি	কইর্বার ধরছঙ্ " ধইরছঙ্	কইরবার ধরছি	করচুঙ/ কইর্ছোঙ	কইরছি
মঃপূঃ	কর, করিস	করো, করেন	কইর্বার ধরছিস্	কইর্বার ধইরছেন	কইর্ছিস্	কইর্ছেন
প্রঃপূঃ	করে	করে	কইরবার ধইর্ছে	কইর্বার ধইরছে	কইর্ছে	কইর্ছে

	অতীত কাল		(সম্ভাব্য অতীত)	
			একবচন	বহুবচন
উঃপুঃ	করনু/করলুঙ/করিনু	কইরলোঙ/করিলোঙ্	করনু হয়/করলুঙ্ হয়	কইরলোঙ হয়
মঃপূঃ	করলু/করিলু	কইরলেন/করিলেন	করলু হয়/করিলু হয়	কইর্লেন হয
প্রঃপূঃ	করিল/কইরলেক/ করিলেক	করিল/কইরলেক/ করিলেন	কইরলেন হয়/ করিলেন হয় করিল্ হয়	কইরলেক হয়/ করিলেন হয করিল্ হয়

ভবিষ্যৎ কাল

উঃপূঃ	করিম্	করমো/করোমো
মঃপূঃ	করবু/করিবু	কইরবেন/করিবেন
প্রঃপূঃ	কইরবে/করিবে	কইরবে/করিবে

অনুজ্ঞা

	বর্তমান অনুজ্ঞা (Imperative)		ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা (Future Imperative)	
	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
মঃপুঃ	তুই করেক তোমরা করেন	তোমরা করেন	তুই করিস তোমরা করেন কইরবেন/করিবেন	তোমরা করেন/কইরবেন/ করিবেন
প্রথমপুঃ	উয়ায় করুক	উমরা করুক	উয়ায কইরবে/ করিবে	উমরা কইরবে/ করিবে

ভবিষ্যৎ → করতে হবে (will have to do)-এর রূপ

	একবচন	বহুবচন
উঃ পুঃ	মোর করা খাইবে	আমারগুলার করা খাইবে
মঃ পুঃ	তোমাব করা খাইবে	তোমারগুলার করা খাইবে
প্রথম পুঃ	উমার করা খাইবে	উমারগুলার কর. খাইবে

'খাইবে'র স্থানে 'নাইগবে' অর্থাৎ 'করা খাইবে'র জায়গায় 'কবা নাইগবে'ও ব্যবহৃত হয়।

শিষ্ট বাংলায় বচন (Number) ক্রিয়ার রূপকে প্রভাবিত করে না। কিন্তু কামরূপীতে বচন ভেদে ক্রিয়ার রূপভেদ ঘটে।

শিষ্ট বাংলা	কামরূপী
আমি যাই	মুই জাঙ্/জাওঁ
আমরা যাই	আমরা/হামরা জাই
তুমি যাও	তুই জাইস
তোমরা যাও	তোমরা জান
আপনারা যান	" ... ইত্যাদি।

আবার শিষ্ট বাংলায় যে পরিবেশে সম্বন্ধবাচক কর্তা ব্যবহৃত হয়, কামরূপীতে সেই পরিবেশে কর্মবাচক কর্তা ব্যবহৃত হয়।

শিষ্ট বাংলা	কামরূপী
আমার দুধ ভালো লাগে	মোক্ দুধ ভাল্ নাগে।
আমার ক্ষিদে পেয়েছে	মোক্ ভোক নাগিচে।
আমার ঘুম পেয়েছে	মোক্ নিন ধরিচে।
এসব কথা আপনাদের ভালো লাগবে না।	এইলা/হিল্লা কতা তোমাক্ ভাল না লাগিবে।

শিষ্ট বাংলায় নঞর্থক অব্যয় বাক্যে সমাপিকা ক্রিয়ার পরে সংস্থাপিত হয়। কামরূপীতে এই সূত্রটি ক্ষেত্র বিশেষে রক্ষিত হলেও এই উপভাষার সাধারণ প্রবণতা হল নঞর্থক অব্যয়টিকে সমাপিকা ক্রিয়ার আগে স্থাপন করা।

শিষ্ট বাংলা	কামরূপী
আমি সভায় বেশি কথা বলি না।	মুই সভাত্ ব্যাশি কতা না কঙ্।
তুমি বাড়ী যেও না।	তুই বারি না যাইস্।
আপনি এভাবে কথা বলবেন না।	তোমরা হেমোন করি কতা না কন্।
তিনি কিন্তু আজ কিছুই বলবেন না।	উমরা কিন্তুক আজি কিছুই না কইবে।

কামরূপী শব্দ ভাণ্ডার ঃ

কামরূপী উপভাষায় প্রচলিত শব্দগুলিকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়।

(১) তৎসম, (২) অর্দ্ধতৎসম, (৩) তদ্ভব, (৪) দেশী এবং বিদেশী।

তৎসম—ঈষৎ বিকৃত উচ্চারণযুক্ত এই উপভাষায় কিছু শব্দকে তৎসম শব্দের তালিকায় রাখা যেতে পারে।

অঙ্কো, অঙ্শো, অন্তোর, অবোতার, অবোস্থা, কাতোর, কারোণ, তুশ্টো, ধ্যান, দান, নিশা, বৈরাগি, ভান্ডো, মিনোতি ... ইত্যাদি।

অর্দ্ধতৎসম—সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে সরাসরিভাবে প্রায় কোনো শব্দই এই ভাষায় গৃহীত হয়নি। তাই অর্ধতৎসম শব্দের সংখ্যা এই ভাষায় খুবই স্বল্প। যেমন—

অক্তো, অগগ্যান, আক্কোরোশ, কইনা, কান্দোন, চইত্, গাইরস্থো, গোন্ধো, ঘিত্তো, তান, নিঠুর, নিন্দালু, নইজ্জা, পরবাশ, পরভাত্, পরাণ, পশান, বইশ্টোম, কেশ্ট, নিমন্তন, মইদ্দো, মন্তোর, শ্যাবা, শোত (স্রোত) ইত্যাদি।

তদ্ভব—এই উপভাষায় শব্দভাণ্ডারের একটি বড় অংশ হল তদ্ভব শব্দ। আই (মা), ইটা (এইটা), এইটে (এখানে), কই, গাছ, অকুমারী, আও (কথা), এততি (এদিকে), ইল্শা (ইলিশ), অকাম (অকাজ), আটিয়া (বীজযুক্ত কলা), অ্যাকনা (এইটুকু), গ্যাদেরা (নোংরা), অখুটা (কুকাঠ), আগিনা (উঠান), গাভিন (গর্ভবতী), ঘ্যাগা (গলাফুলা রোগী), আটো (সরু), ওরোশ (ছারপোকা), কাশুলা (কাশির রোগী), আন্দুনি (রাঁধুনি), ওশার (চওড়া), খলাই (মাছ রাখার বাঁশের তৈরি সরু মুখযুক্ত পাত্র), ঘোঙোর (ঘোমটা), চাইলোন (পূজোর উপাচার—বাতি, ধান, কলা ইত্যাদি রাখার বাঁশের তৈরি পাত্র), চকোয়া (পাখির নাম), চুয়া (কুয়ো), ছ্যাপ (থুথু), ছোরানি (চাবি), জেদু (যদি), জুই (আগুন), ঝরি (বৃষ্টি), টারি (পাড়া), ট্যাঙা (টক), ঢ্যাল্ (ঢিল), ঢোঙা (কলাগাছের খোল দিয়ে তৈরি পূজার নৈবেদ্য নিবেদনে ব্যবহৃত পাত্র), দাও (দা), দাতুয়া (উঁচু দাতের), দাদুয়া (চর্মরোগ দাদে ভরা), ধওলা (সাদা), ধুমা (ধোঁয়া), নাউয়া (নাপিত), নাল্ (লাল), নেটু (লেজ), পঙোর (সাঁতার), পিছিলা (পিচ্ছল), ফারা (ছেঁড়া), বইন (বোন), বাই (বোন), বাউদিয়া (ভবঘুরে), বাঙোর

(বেঁটে), বিত্তিরি (আউশধান), বুকানি (মহিলাদের বুক ঢাকার জন্য ব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ড), ভইচাল (ভূমিকম্প), ভাউজ (বৌদি), ভোক (খিদে), মইলা (ময়লা), মনভোলা (মনকে বুলিয়ে দেয় যে), মাইয়া (স্ত্রী, পত্নী) মানশি (মানুষ), শই (সখী), শন (শ্রাবন মাস), শম (সোমবার), শিকিয়া (ঘরের চালের সঙ্গে দড়ি দিয়ে আটকানো মাটির পাত্র ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখার জন্য দড়ি দিয়ে তৈরি ফাঁস যুক্ত বস্তু), শশুরি (শাশুড়ী), শিতাপাড়া (খুব যত্ন করে সিঁথি কাটা), হাগুরা (বার বার পায়খানা করতে অভ্যস্ত রোগগ্রস্ত মানুষ), হাটুয়া (হাট বাজার করে যে), হোলোক-শোলোক (ইতস্তত), ফরফরা (চাঞ্চল্যে ছটফট করে বেড়ানো)... ইত্যাদি আরও অসংখ্য শব্দ।

দেশি শব্দ—প্রাগার্য যুগে ভারতে প্রচলিত দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক ইত্যাদি গোষ্ঠীর ভাষা থেকে অনেক শব্দ আর্য ভাষীদের দ্বারা গৃহীত হয়ে কালক্রমে এই উপভাষায় প্রবেশ করে। এই শব্দগুলির মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দ। অঘা (দুর্বল/অপদার্থ), অচোদা (অর্থহীন), আচা (শুঁয়াপোকা), আচাভুয়া (অদ্ভুত), আউঙ্‌বাউঙ্ (অসংলগ্ন), আজারি (খালি), আলাঙ-নাথাঙ্ বা থাঙ্‌নাথাঙ (ছলাকলাদির ব্যবহার), উমানি (ছোট মাছি), উড্‌ডা (ভবঘুরে), কচুয়া (কচুতে ভরা), কশটিয়া (কৃপণ), কাউরহাটি (গোলমাল), ক্যাচাল/কাচাল (গণ্ডগোল, বিবাদ), ক্যাচের ম্যাচের (গোলমাল যুক্ত শব্দ), কোচা (ধুতির কোচা), খম্‌খমা (পুরুষ্ট), খির্‌খিরা (ঘন), খোঙ্‌খোঙা (ফাঁপা), গিশ্‌শি (সবলে), গুক্‌টিয়া (একা থাকায় অভ্যস্ত), গ্যাল্‌গ্যালা (নরম), গ্যাললেস (তরল পদার্থ পড়ে যাওয়ার পদ্ধতি/শব্দ), গুলগুলা (নরম), চকোল-বকোল (শিশুর হৃষ্টপুষ্টতা, তরতাজা অবস্থা), চ্যাট (পুরুষাঙ্গ), জুলজুলা (নির্বোধের মত), জ্যালজ্যালা (পাতলা), জ্যাঙজ্যাঙা (ফাঁক যুক্ত), ঝমঝমা (ঝমঝম সজোর শব্দে), টারুয়া (হাড়), টাশ্ (অবাক), টিকা (নিতম্ব), ঠ্যাঙ্ (পা), ঢাঙা (লম্বা), ত্যাতেলা (অতি নরম), ত্যানা/ন্যাচরা (ন্যাকরা), থ্যারথ্যারা (কুশ্রী), থ্যাত্‌লা (থেতল যাওয়া), নারিয়া (নেড়া), নরি (কঞ্চি, লাঠি), নেরুয়া (বাঁহাতি), নেরা হাত (বাম হাত), পারা (পুরুষ মহিষ), পারি (স্ত্রী মহিষ), পুক্‌টি/পুট্‌কি (পাছা, নিতম্ব), প্যাতোল (মেটে), ফলফলা (সাদা পরিষ্কার), ফ্যাদিলি (ফেদলা পারে যে অর্থাৎ বেশি কথা বলে যে), বয়া (খারাপ), বারুন (ঝাঁটা), ভুকি (মুষ্ট্যাঘাত), ভোদাই (বোকা), বুচি (বোঁচা নাকের মহিলা), মাঙ্ (যোনিদ্বার), মাদি (স্ত্রী হাতী), মারোয়া (উৎসবাদিতে দাঁড় করানো কলা গাছ), মারেয়া (পূজার অনুষ্ঠানকর্তা), শিদোল (শুকনা মাছ থেকে তৈরি খাদ্য বস্তু), শাঙ্‌না (উপপতি, দ্বিতীয়/তৃতীয় বিবাহের পতি), শ্যালশ্যালা (পাতলা নরম), হুদুম (উলঙ্গ), হোল (পুরুষাঙ্গের বীচি), ফ্যার্‌ফ্যারা (রস যুক্ত হওয়া), ত্যালত্যালা (নরম), তরতরা (চাঞ্চল্য দেখানো), ভক্‌ভকা (সজোরে বেরিয়ে আসা), ভ্যারভ্যারা

(নরম কাঁদাযুক্ত হওয়া), ব্যারব্যারা (বির বির করে অনবরত কথা বলা), হনহনা (দ্রুতগতিতে হনহন করে হাঁটা), গিরগিরা (ঘন), চুলবুলা (চঞ্চলা, অনেকসময়ে উদ্ভিন্ন যৌবনা অর্থে ব্যবহৃত), ভ্যাদভ্যাদা (বকর বকর করা), ম্যালম্যালা (ছাগলের মত ম্যালম্যাল করা) ... ইত্যাদি শব্দ।

বিদেশী শব্দ—শিষ্ট বাংলার মতোই এই উপভাষায় আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ এবং কিছু সংখ্যক বিকৃত উচ্চারণ যুক্ত ইংরাজি শব্দ প্রচলিত। এ ছাড়া কোচ-রাভা এবং বোড়ো-প্রতিবেশী এই দুটি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দীর্ঘদিন সহাবস্থান জনিত কারণে কিছু শব্দ কোচ-রাভা এবং বোড়ো ভাষা থেকে এই ভাষায় অনুপ্রবেশ করেছে।

ফারসী শব্দ—অন্‌দোর, আওয়াজ, আইন, আশ্‌কারা, আরাম, কমবক্‌তা, কাকা, কাকি, কামাই, জমি, তোশোক, নিশান, পাইকার, পাজি, পশোম, শানাই, বনদোর ... ইত্যাদি।

আরবী শব্দ—আক্‌কেল, আহাম্‌মোক, জরুল, নজোর, জবাই, খয়রাত, দুনিয়া, শৈল্‌তা, ফাজিল, ফৌজদারি ... ইত্যাদি।

পর্তুগীজ শব্দ—আনারস, বালটিঙ্‌, মশ্‌করা, মিশ্‌তিরি, বয়াম, ছাবোন, চাবুক ... ইত্যাদি।

ইংরাজী শব্দ—আপীল, ইনচি, ডাবোল, ডাইরিয়া, গিলাশ (গ্লাস), প্যাছেন্‌দার (প্যাসেঞ্জার), ইস্‌কুল (স্কুল), অ্যাল্‌ (রেলগাড়ি), টাইল্‌ (স্টাইল), পেলেট্‌ (প্লেট), ছিলোট (স্লেট), পেনচুল (পেন্সিল), ক্যাপ্‌টিন, ইপোট (রিপোর্ট), এডিও (রেডিও), ছেকেটারী (সেক্রেটারী), পেছিডেন (প্রেসিডেন্ট), এডি (রেডি), মিটিঙ্‌, বাললি (বার্লি), পাশপোট (পাশপোর্ট), ডাইবার (ড্রাইভার) ... ইত্যাদি।

বোড়ো শব্দ—আউ আউ (না না), আয়লা ঝায়লা (এলোমেলো), ব্যাঙা (তালা), বোকালি (বাচ্চার দেখভাল করে যে), বাদা (সুপারি বা কলার ছরা), বোকোনা (তল্পি বাঁধা), পাটা/পাটি (ছাগল), ভোন্‌দা/ভুনদি (বিড়াল), দলোঙ্‌ (সেতু), দাফ্‌না (পাখীর পাখা, মানুষের দুই বাহুর গোড়ার অংশ), ঢেম্‌শি (একজাতীয় শাক), ডাব্‌রি (পাথার বাড়ী), গ্যাদেরা (অপরিষ্কার), হাঙ্‌রা (বাঁশের বেড়া), হাফা (বনবিড়াল), নাফা (একজাতীয় শাক), কুশিয়ার/কুশারী (আখ), পাকরা-চিতিয়া/চিতিয়াপাকেরা (রং বেরং), থুরি (বাঁশের চোঙা), উয়া (খড়ের ঘরের চালে সংযুক্ত বাঁশ বিশেষ), উকুনদি (বন্ধ্যা ছাগল), জামপোই (প্রচুর পরিমাণ), গিরি (গৃহস্থ) ইত্যাদি।

কোচ-রাভা—আঙ্‌শাঙ্‌ (উল্টোপাল্টা), কামি (বাঁশের বাখারি), গাব (রং), গাবার (কিনার), ছাম্‌ (উদ্‌খুল, ধান থেকে চাল তৈরির কঠোর যন্ত্র), গাইন্‌ (মুষল, ছাম-এ রাখা ধানে আঘাত করার জন্য কাঠের তৈরি দণ্ড যার মাথা লোহার পাত দিয়ে

মোড়ানো), দাগিলা (কাঁথা), ব্যাদা (মাটি থেকে জাবুরা (আবর্জনা) পৃথক করার জন্য বাঁশের লম্বা দাঁত যুক্ত কাষ্ঠনির্মিত কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্র)/হাচচিনি (ঐ একই কাজে একই ধরণের ছোট যন্ত্র)। ['ব্যাদা' বড় তাই হালের মতো গরু/মোষ টানে, হাচচিনি' ছোট তাই কৃষক দু হাতে টেনেই এই কাজ করে।] বুরুঙ্ (মাছ ধরার জন্য বাঁশের তৈরি যন্ত্র), ধোর্কা (মাছ ধরার জন্য বাঁশের তৈরি লম্বা যন্ত্র), শোত্তানো (আদরের স্পর্শ), চরু (উরু), চাঙ্রা (বাঁশের তৈর উঁচু বসার/শোয়ার স্থান), ছিলছিলা (মসৃণ), জাকনা (আবর্জনা), জাবুরা (সরু ছোট বস্তুর আবর্জনা), টুটি (গলা), টাকোয়া (ছোট ছোট শামুক), ব্যাদেলেঙ্ (জল জোঁক), ভুতি (খড়ের তৈরি আগুন জ্বালিয়ে রাখার লম্বা ধরনের বস্তু), হাউরিয়া (ভূমিহীন, সহায় সম্বলহীন), টোপলা (তল্পি), ছ্যাঙ্ছ্যাঙা (অতি ঠাণ্ডা), শ্যাও (নিচু, ঢালু), বনু (ভগ্নীপতি), শাগাই (আত্মীয় স্বজন) ... ইত্যাদি।

এ ছাড়াও কিছু ভাববোধক অব্যয়ের ব্যবহার এই ভাষার একটি প্রধান বিশেষত্ব। যেমন ঃ হায়, হোর, আরে, ও, এই, অকি/ওকি, গে, হাগে, ঐনা, শাবাশ, আইয়ো, আচ্ছা, বেইশ্ বেইশ, হায় হায়, ধেইত্, হ্যা হ্যা, ওরে, ওহোরে, আহা, ওহো ... ইত্যাদি।

দেখা যায় যে কামরূপী ভাষার ব্যবহার সাহিত্য ও কাব্যে তেমন নেই। সাহিত্যে ও কাব্যে ব্যবহৃত হওয়ার উপযোগী বিবর্তন এই ভাষায় আসে নি। প্রাচীন ও মধ্য বাঙ্লার প্রভুত বৈশিষ্ট্য তাই কামরূপী কথ্য ভাষায় লক্ষ্যণীয়ভাবে আজও বিদ্যমান। কিন্তু এই ভাষায় বিবর্তন একেবারেই ঘটেনি অর্থাৎ ভাষাটি পুরোপুরি অবিমিশ্র রয়েছে একথাও ঠিক নয়। ষোড়শ শতাব্দী থেকেই বাইরে থেকে কিছু সংখ্যক মানুষের এই জনপদে আগমন ঘটে যারা এদের তুলনায় শিক্ষা দীক্ষা, বিচার বুদ্ধি ও অর্থনৈতিক মানদণ্ডে এগিয়ে ছিলেন এবং স্বভাবতই তাদের মুখের ভাষার প্রভাব স্বল্প হলেও এর উপরে পড়েছে। তাছাড়া বাংলার পূর্বাংশ (পূর্ববঙ্গ), দক্ষিণবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব অঞ্চলের জনগণের সঙ্গে এই অঞ্চলের জনগণের সংযোগ বাড়ে—বাঙালি ও রাঢ়ী ভাষার প্রভাব কামরূপীর উপর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। বিশেষ করে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে উত্তরবঙ্গে চা বাগানের প্রবর্তন, তামাক চাষ, পাট চাষ ও ব্যবসার ব্যাপক প্রসারসাধনে বাঙালি ও রাঢ়ী ভাষী বহু মানুষ জীবিকার উদ্দেশ্যে উত্তরবঙ্গে আগমন করেন এবং অতি স্বাভাবিক কারণেই তাদের ভাষার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের কামরূপী ভাষার কিছুটা সংমিশ্রণ ঘটে। বাইরে থেকে আগত এই মানুষজনকেই উত্তরবঙ্গের জনগোষ্ঠী 'ভাটিয়া' নামে অভিহিত করেছে। ভাষার মিশ্রণের এই গতি দ্রুততর হয় ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গ বিভাগের ফলশ্রুতিতে। পূর্ববঙ্গ (বর্তমান

বাংলাদেশ) থেকে অসংখ্য হিন্দু শরণার্থী (রিফিউজি) উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এসে বসবাস শুরু করে। অতীতে যারা উত্তরবঙ্গে এসেছিলেন তাদের সঙ্গে এদের পার্থক্য এই যে এঁরা রাজনৈতিক নীতির শিকার হয়ে এই অঞ্চলে আসতে বাধ্য হয়েছেন, ইচ্ছে করে জীবিকার সন্ধানে আসেন নি। তাছাড়া এদের সংখ্যাও অনেক—তাই শুধু অর্থনৈতিক ক্রিয়াস্থল নয়, ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র নয়—গ্রামগঞ্জের আনাচে কানাচে ঘটে তাদের আগমন। কামরূপী কথ্য ভাষায় তাই মিশ্রণ ঘটে ব্যাপক হারে।

যেহেতু গদ্য সাহিত্য, রম্যরচনা, প্রবন্ধ ইত্যাদি এই ভাষায় তেমনভাবে বিকাশ লাভ করেনি এবং ভাষার বিবর্তনও তদুপযোগি হয়ে ওঠে নি, কথ্য ভাষার রূপই এখানকার গীতিকাব্যে স্থান পেয়েছে। উত্তরবঙ্গের এই গীতিকাব্য রূপ পরিগ্রহ করেছে এখানকার লোকসংগীত ভাওয়াইয়া চটকার মাধ্যমে। এই কাব্যাংশের লিখিত রূপ নেই—। মুখে মুখে রচিত ও গীত হয়ে গুড় তাল লয়ের মিশ্রণে সমগ্র জনজীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এই গীতিকাব্য। এখানে ভাওয়াইয়া চটকায় ব্যবহৃত কামরূপী ভাষার কাব্যরূপের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনাই হবে প্রাসঙ্গিক।

সব দেশের কবিতা-গীতির মতো উত্তরবঙ্গের লোকসংগীতেও নিজস্ব ভাষা প্রাত্যহিক জীবনের ভাষা থেকে খানিকটা পৃথক ও স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্যমূলক বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় ও নমুনা এখানে দেওয়া হলো।

ড. নির্মলেন্দু ভৌমিক 'প্রান্ত-উত্তরবঙ্গের উপভাষা'তে এই ভাষার কাব্যরূপের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। ড. নির্মল দাশের বিশ্লেষণও এ ব্যাপারে অত্যন্ত সহায়ক।

(১) সুরের খাতিরে হলন্ত শব্দ স্বরান্ত হয়ে যায়। হলন্ত শব্দ স্বরান্ত হবার সময়ে 'আ' কার 'ও' কারে পরিণত হয়। অন্ত্য-স্বরাগম এর উদাহরণ—যেমন→ মাছ → মাছো, হাট → হাটো, বাপ → বাপো, মা → মাও, ধিক → ধিকো, পাঁচ → পাঁচো, ছয় → ছয়ো, পথ্ → পথো ; যথা—'আইলো বান্দো কইন্যা জলোরে ছ্যাকো'।

(২) কিছু শব্দের (যার মধ্যে অধিকাংশই তৎসম শব্দ) কাব্যিক বিকৃতি বা পরিবর্তন ঘটে। মধ্য স্বরাগম-এর মাধ্যমে এই বিকৃতির উদাহরণ—

মৃত্তিকা → মিত্তিঙ্গা ; বসুমতী মা → বসোমতি মাও ; পাগলা → পাগেলা ; যৌবন → জৈবন ; বিদেশ → বৈদেশ/বৈদাশ ; ভানু-ভাস্কর → ভানু ভাশঙ্কর ; চন্দ্র-দিবাকর → চন্দ্র দিবাঙ্কর ; চিরদিন → চিরয়দিন ; অভাগিনী নারী → অবাগোনি নারী ; শাঁখা → শাঙ্খা পাখা → পাঙ্খা ; মায়া → ময়া, ময়হা ; পীরিতি → পীরিত ;

পাখী → পঙ্খী ; আঁখি → আঙ্খি ; পালঙ্ক → পালঙ, নিরালা → নিরাল ; আঁচল → আঞ্চল ; মলিন → মৈলান ; দুঃখ → দুক্‌খ ; মাজা-ঘষা → মাঙ্গা-ঘষা ; নামে → নাম্ভে ; যেন → ঝোনে ; গৌরব → গৈরব ; সেইও → স্যাও ; মউর/ময়ুর মইওর ; রৌদ → রৈদ ; মরিচ → মরুচ ... ইত্যাদি।

(৩) উপপদ তৎপুরুষ সমাস ও বহুব্রীহি সমাসের প্রতি বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায় কাব্যের ভাষায়।

তৎপুরুষ সমাস

তৃতীয় তৎ → উপায় বান্দা, সোনা বান্দা ইত্যাদি

চতুর্থী তৎ → ভাতার জাঙালী → ভাতদেওয়ার নিমিত্ত জাঙালী (গরবিনী)

৪ মী তৎ → অনজাতি → অন্য থেকে জাত

৭ মী তৎ →পানিয়া ভাসা, বালা ভাসা, মাথা ঘষা ইত্যাদি।

উপপদ তৎপুরুষ → শিতাপাড়া → শিতা (সিঁথি) পাট করে যে ; মাথা-শুলা মাথায় শুল (ব্যথা ধরিয়ে দেয় যে/যা) ; ডাংঢারা/ডাংধরা → ডাং (দণ্ড) ধরে যে ; ধান-ভূকা → ধান ভানে যে ; ঘোড়া চড়া → ঘোড়ায় চড়ে যে ; শুয়োর চড়া → শূয়ার চরায় যে ; ভার-উবা → ভার উদ্বহন করে যে ; বাইগন-বেচা → বেগুন বেচে যে ; ময়হা ছাড়া → মায়া ছাড়া → মায়া ছাড়ে যে ; ঢেংপারী → ঢং দেখায় যে স্ত্রীলোক ; মন-ভোলা → মন ভোলায় যে ; বাও-খোয়া → বাইরের বাতাস খেয়ে বেড়ায় যে অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা। মোহিনী-লাগা → মায়া লাগায় যে ; পরখাওয়া → পরের খায় যে ; দশাপারা → দুঃখ দূর্দশায় পড়েছে যে।

নঞ-তৎপুরুষ ঃ → নি-বংশিয়া।

অলুক তৎপুরুষ ঃ → ছামে-কুটা চিড়া মুড়ি → ছাম (উদুখল)

কর্মধারায় সমাস ঃ দেউনিয়া-ভাতার/দেওয়ানি-ভাতার → দেউনিয়া (গৃহকর্তা) স্থানীয় যে ভাতার। শ্যাম-বন্দুয়া → যে শ্যাম সেই বন্ধু।

মধ্য পদলোপী সমাস ঃ → গাবুরাড়ি/গাভুরাড়ি → গাবুর (যৌবনকালের) রাঁড়ী (বিধবা)। জনম-ঢ্যানা → জনম (জীবনব্যাপী) ঢ্যানা (অবিবাহিত) তরঙ-নদী → তরঙ্গ সঙ্কুল নদী।

উপমান কর্মধারয় ঃ → পানিয়া-দই → জোলো দই ; বাবরি-ছাটা → বাবরির মতো ছাঁটা চুল ; ছাতু-ছান → ছাতুর মতো গুঁড়ো : বোয়ালি-পেটি → বোয়াল মাছের মতো পেট ; খলাই-পেটি → খলাই (লম্বা গোল সরু মুখ যুক্ত বাঁশ নির্মিত মাছ-ধরে রাখার পাত্র) এর মত পেট যার।

বহুব্রীহি সমাস ঃ → মাইয়া-মরা → মাইয়া (পত্নী) মরেছে যার ; দো-ভাতারি → দো (দুই) স্বামী যার ; সোয়ামী হারা → সোয়ামী (স্বামী) মরেছে যার ; খোপানাশি লাস্যময় খোঁপা যার ; বশ-গরা → বশ (বয়স) গড়িয়ে গেছে যার ; খোপাচুলি → খোঁপা বাঁধা চুল যার ; আধা-বয়শী → বয়স অর্ধেক হয়েছে যার ; উচল-দাতি → উচল (উঁচু) দাঁত যার ; মাথা-ডংরা → বড়সড় মাথা যার ; ভাতার-শুয়াতি → স্বামী সোহাগি ; পেট-ডাংরা → বড়সড় পেট যার ; নিলাজ → লজ্জা নাই যার ; চ্যাট-ডাংরা → বড়সড় পুরুষাঙ্গ যার ; নাড়ু পানিয়া → নাড়িতে পানি যার (রুগ্ন অসুস্থ) ; গোয়া-ডাংরি → বড়সড় জননেন্দ্রিয় যার ; শাঙ্না-ভাতারি → শাঙ্না (উপপতি) পতি যার ; মৈশাল-ভাতারি → মৈশাল (মহিষ রক্ষক) স্বামী যার।

(৪) শব্দের দ্বিরুক্ত প্রয়োগ (শব্দদ্বৈত) ও তার প্রাচুর্য এই উপভাষা কথ্য ও কাব্যে একটি উল্লেখযোগ্য বিশেষত্ব।

ক) **বহুবচন বোঝাতে**—গঙ্গাধরের পারে পারে কদম শারি শারি (সারি সারি) ; হাপা হাপা (বড় বড়) নাফা শাক ঢ্যাপা ঢ্যাপা কুশি/পাত ; শোবোদে (শব্দে অর্থাৎ লোক মুখে) শুনিচুং গে ফেন্নি, ঢেল ঢেল (অনেক) তোর ভাইও গে ; বরের ঘরের বৈরাতি ধুমা ধুমা কোটি (বড় বড় কোমর), ন্যাম ন্যাম দাড়ি ভক্রম দাস (লম্বা লম্বা দাড়ি) ; ধৈ ধৈ বালি ; নরম নরম ডাঙা (ডাঁটা)

খ) **পৌনঃপুন্য বোঝাতে**—পব্বতেরো কোলে কোলে হেঁটা উচল (উঁচু নিচু) ;
(হেটা-নীচা)

শদায় শদায় যাঙ নদীর ঘাটে ; বাঁশের আরায় আরায় ; ঠমকে ঠমকে/থমকে থমকে হাটোঙ্ ;

সম্পূর্ণতা বোঝাতে—দ্বন্দ্ব 'সমাসের' অর্থজ্ঞাপক ঃ সাউদ-সদাগর ; ক্ষার পানি ; জাম-জাবুরা ; অং-তামশা (রং-তামাশা) ; শাক-পাতা ; ভয়-শরম ; নইজ্যা-শরম ; বান-বাইশ্যা (বন্যা বর্ষা) ; ঠ্যাঙ-পাও ; দ্যাও-দেবতা ; ঘট-গছা ; হাল-গিরস্তি ; উরাং-বাইরাং, (ঘর বাহির করা, উতলা হওয়া)।

একার্থক সহচর শব্দ ঃ গোসা-ব্যাজার (গোঁসা করা) ; ভয়-হাতাশ ; ঘাটা-পথ ; মাইর-ডাঙ্গা (মারা ভাঙ্গা) ; বাইজ্-বাজন (বাজনা-বাদ্য) ; ধারা-চাটি (বাঁশের তৈরি চাটাই) ; বারুন-ঝাটা (বর্ধনিক ও ঝাঁটা) ; শ্যাবা-পূজা (সেবা-পূজা) ; শাগাই-শোদর (আত্মীয় স্বজন) ; অরণ-জঙোল (অরণ্য-জঙ্গল) ; জিউপরাণ ; জমি-জাগা (জায়গা জমি)

অনুচর শব্দ ঃ ম্যাঘ-ম্যাঘালি (মেঘ); শয়-সম্পত্তি (সহায়-সম্পত্তি); পজ্জা-পালি (প্রজা ইত্যাদি); পকি-পয়াল (পাখী ইত্যাদি); ছাওয়া-ছোটো (ছেলেমেয়ে ইত্যাদি); কামাই-কাজ; মাড়-মাকতাই (ভাতের মাড় ইত্যাদি); শিদল-শানা (শুকনো মাছ থেকে তৈরি খাদ্য শিদল ইত্যাদি); পাত-পটুয়া (কলার পাতা জিনিশ পাতি (জিনিশপত্র); ভার-ভারটি (ভার, পুঁটলি ইত্যাদি); আশ-পরশী (পাড়া পরশি); মানা চিনা (মানস কামনা); খবর-উদ্দিশ; ভোজ-ভ্যাণ্ডেরা; চিনা-জানা (পরিচিত)।

প্রতিচর শব্দ ঃ দিনে-আইতে (দিনরাত্রে); মিছায়-ছাচায় (সত্যমিথ্যায়); **বিকার শব্দ** ঃ চিকন-চাকন; খাটোখুটো (ছোটোখাটো); খ্যাড়েখড়িতে (কাঠ ও খড়ে); ত্যালে-তুলে (তেল ইত্যাদিতে)।

অনুকার ও ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঃ পাক-শাক করা (রান্নাবান্না করা); ঝোলে ঝোসে (প্রচুর ঝোল সহ) আথারি-পাথারি (দিকে দিকে); জই-জোগার (জোকার) (উলুধ্বনি); ধৈ-ধামাইল (রঙ্গ কৌতুক); ঘর গিরস্থি; গপ্‌পো-শপ্‌পো ইত্যাদি।

সাদৃশ্য বা ঈষদ্‌ভাব বোঝাতে ঃ নুল-নুলা (নুলোর মত দুর্বল); শিন শিনা (শীর্ণ); খাটাউ-খাটাউ (কড়া কড়া) কথা; ন্যাড়েত্‌-ব্যাড়েত্‌ (নড়বড়ে) শির-শিরায় (শির শির করে); গলগলা (বেশী সেদ্ধ) ভাত;

ব্যাতিহার বোঝাতে ঃ মোচরা-মুচরি; জরপেটা-জড়পেটি (জড়াজড়ি) ফাশার ফুশুর (কানাঘুষো) রাওয়া-রাওয়ি (কথাবার্তা); কুষ্টা-কুষ্টি করা (ব্যঙ্গ বিদ্রূপ); ক্যান্টা-ক্যান্টি ইত্যাদি।

অসমাপিকা ক্রিয়ার দ্বিত্ব প্রয়োগ সম্পূর্ণতা বোঝাতে ঃ ঝারিয়া ঝারিয়া বান্দা (ঝেড়ে মেরে বাঁধা); নুকিয়া খুশিয়া (লুকিয়ে লুকিয়ে); হালিয়া-হুলিয়া (হেলে হেলে পড়ে); এছিয়া-বেছিয়া (বাছ-বিচার করে); ইনিয়া-বিনিয়া (ইনিয়ে বিনিয়ে); নিজিরি-নিজিরি (নির্ঝরের মতো পড়া);

(গ) **অনুকার ধ্বনির শব্দদ্বৈত—বিশেষণ** ঃ ঝকর-ঝকর (ঝগড়ার মতো কথা বলা); ছ্বন-ছ্বনা (পূর্ণ অর্থে) প্রয়োগ → ছ্বনছ্বনা ধার (ছুঁরির ধার) অথবা ছ্বনছ্বনা গাবুর (পূর্ণ যুবতী); ছিল ছিলা (চকচকে) গাও (গা); টিঙ টিঙা আগাল (সরু ও সূক্ষ্ম অগ্রভাগ); শ্যাম-শ্যাম ঝরি (অল্প অল্প বৃষ্টি); ধওলা চকচকা (ধবধবে ফরসা); টিলটিলা পাণি (পরিষ্কার জল); টঙ্‌ টঙা উচা (উঁচু লম্বা); কাঁউ-কাঁউয়া (অত্যুষ্ণ); ছিলছিলা (সম্পূর্ণ)

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ঃ থাং-নাথাং (অবহেলা করা) ; দোগদোগানো বা ডোগডোগানো (মাথা নাড়া) ; হাকাশ-পাকাশ (প্রাণ ধুকধুক করা) ফল্‌ফলা (সাদা ধবধবে, খুশিতে ভরা), প্রয়োগে → মনটা ফল্‌ফলা হইচে ; চল্‌চলা পুঁটি মাছ ; ঢলঢলা কচুর পাত ; গোর গোরা পাগার (অতি গভীর পুকুর) ; ঝ্যাঙ্‌ ঝ্যাঙা (ফাঁক ফাঁক গাঁথুনি) ; কুম্‌কমা ভারী (বিশেষ রূপে ভারী (ওজন যুক্ত) ছ্যাঙ ছ্যাঙা (খুব ঠাণ্ডা) ; হ্যাটেঙ্‌ ট্যাঙ্‌রা (উঁচু নিচু), হ্যাদেল্‌-দ্যাল্‌ (ঢিলে-ঢালা) ; উনি ঝুনি (ছোটধরনের) ইত্যাদি খোঁপার নাম ;

ক্রিয়া বিশেষণ ঃ কোরোত্‌-কোরোত্‌—কোরোত্‌-কারাত (কড় কড় শব্দ) ; কিন্‌ কিঁনা (কিন কিন-শব্দে শানাই বাজা) ; পাটাউ-পাটাউ (পট পট করে কাঁটা বেধানো) ; টাপুস-টুপুস (টপ টপ করে জল পড়া) ; নাটাউ নাটাউ (লম্বা লম্বা পা ফেলে চলা) ; ঘোকর-ঘোকর (ঘোকর ঘোকর শব্দ) প্রয়োগ দুই ঠ্যাঙ ব্যাদরেয়া (দুই পা ফাঁক করে) ঘোকর ঘোকর নাগানু (ঘোকর ঘোকর শব্দে ধানের চারা রোপন করছি) অর্থে ; টঙ্‌ টঙ্‌ (টং টং শব্দে কাড়ার বাজন) ; হিরহির গির গির (ঢোল, করকা, কাড়া ইত্যাদির একই সাথে বাজনার শব্দ) ; ঠস্‌ ঠসা/টস্‌টসা (রসে ভরপুর), প্রয়োগ ঃ → মাগীর মূলার নাখান ঠসঠসা দেঁহা (মাঘ মাসিয়া মূলোর মতো টস্‌ টস্‌ করে দেহ) ; টোরোত টোরোত (হুঁকার শব্দ) ; ঝাপুর ঝুপুর গাছ ; ভুশুং ভাশাক (এলোমেলো হয়ে থাকা) ; ভেরভেরা (কর্দমাক্ত), চিলাং ঝাটাং (এলোমেলো), উলুক-ভুলুক (ইতস্তত করা, বিচলিত হওয়া) ; হোলোক্‌-শোলোক্‌ (ইতস্তত করা) ; উশাংশাং (উসখুস করা) ; উরাং বাইরাং (উড়ু উড়ু মন) ; ন্যারেত ব্যারেত (নড়বড়ে) ; চিলাং ঝাটাং/তাড়াং ঝাটাং (বাঁকা ও জীর্ণ) ; হির-হির গির-গির (মেঘের গর্জন) ; অ্যাঙ্গা প্যাঙ্গা (ঘ্যানর ঘ্যানর) ; নিদান-সুদান (বিপদ-আপদ) ; নটর-পটর (যেমন তেমন) ; হোরোন-ফোরোন (নানারকম মশলা) ; আওদা-পাতালি (এলো পাতারি)

ডাম-ডুমা-ডুম (মশার পেটের শব্দ) ; ফুর্‌-রুৎ (পাখী উড়ছে শব্দ) ; ভ্যার-ভ্যার-ভ্যাট্‌-টেস (কোন্‌ কিছু পড়ার আওয়াজ)।

নামধাতু ঃ ঝনঝনায় (শির শির করে) ; ফনফনায় (বনবন করে চলে যায়) ; ধরফরায় (বুক ধরফর করে) ; টিকটিকায় (কথাটা মনে খচ্‌খচ করে) ;

(ঘ) শব্দ-দ্বিরুক্ত করার সময় দুটি জোড়া-শব্দের মাঝখানে কি, রে, আর, গে প্রভৃতি অব্যয় পদের ব্যবহার। ভ্যাটটেস্‌-কি-ভুটটুস ; হিররিম কি হাররাম ; টুপ্পুস কি টাপ্পাস/টিপ্পিস কি টাপ্পাস, সারি গে সারি ; খরি রে খুটা ; নাতারি রে পাতারি।

অন্য শব্দের প্রয়োগে ঃ শাক খায় শুকাতি খায় (শাক শুকাতি) ময় দিনু মশলা দিনু (ময়-মশলা)।

(ঙ) **কাব্যে সংখ্যাবাচক বিশেষণ ঃ** একো (এক), দুইয়ো/দোনো (দুইও), তিনো (তিন), চাইরো (চার, পঞ্চ (পাঁচ), ছয়ও (ছয়), সাতো (সাত), অষ্ট (আট), নও (নয়), পোন্দোরো (পনের), শোতোরো (সতের), একইশ (একুশ), তিরিশ (ত্রিশ), বিশ (কুড়ি)সশ/শও (একশ), লইক্ষ (লক্ষ) ; অর্ধেক (আধা) ড্যাড়, (দেড়), পোনে (পৌনে) ; পইলা (পয়লা) তারিখ ; ঢ্যাল/ভ্যাল/ঢ্যাইললা/ভাইললা (অনেক), অলপ্‌ (অল্প), চিরিৎ (অল্প তরল পদার্থ), ফাইক (বেশি)।

কর্তৃকারকে 'এ' বিভক্তির প্রয়োগ কাব্যে প্রায়শঃই লক্ষ্যণীয় ঃ

রোজায় ঝারে, বৈদ্যে ঝারে ঢ্যাকিয়ার আগাল দিয়া ; ভাতারে ধরিয়া মারে। কাব্যের ভাষায় একই সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে ক-যোগ করা হয়ে থাকে কর্মকারকে। যথা ঃ— মোক্‌ নারীক্‌ ফ্যালেয়া ক্যানে হলু দ্যাশান্তরী।

তোক্‌ মইষালক বান্দি থুইম মাথার ক্যাশো দিয়া।

কিন্তু বিশেষণের সঙ্গে ব্যবহারের অন্য নিয়ম—

মুই অভাগীক্‌ ফ্যালেয়া ক্যানে হলু দ্যাশান্তরী।

করণ কারকে 'এ' বিভক্তির ব্যবহার নিম্নরূপ—

খোপোতে নাইরে কইতর কি করে তার খোপে, যে নারীর সোয়ামী নাইরে
কি করে তার রূপে অথবা বছর (বতর) গেইলে কি করিবে চাষে।

করণ ও অধিকরণ কারকের মেশামেশি শিষ্ট বাংলার মতো

সেও ধান মোর গেইল বানায় (বানে) খায়য়া ; অদিয়ায় অদিয়ায় যান রে বন্ধু
ডারা না হন পার।

ষষ্ঠী বিভক্তির স্থলে দ্বিতীয়া ও চতুর্থীর 'ক' এর বহুল প্রয়োগ ঃ—
না নাগে **মোক** জল টোপা নথ, না নাগে মোক নাকের ফুল,
না নাগে মোক তিষ্যা ভোক (ক্ষুধাতৃষ্ণা)।
হাত ধরোঙ্‌ তোক পাও ধরোঙ।

কাব্যে ষষ্ঠী বিভক্তির অকারণ প্রয়োগ ঃ

আছে তো ডালিমের ফল ; সুন্দর নারীর জবানের মিঠা যদি কারে আও/রাও (কথা) ; তোক পিন্দাইম মুই রঙচঙের পাটানি (গামছা বা তোয়ালের মতো সাদা পরিধেয় বস্ত্র) : দুই গালের মুই চুমা খাওঁ ; দিনে দিনে খসিয়া পড়িবে রঙিয়া দালানের বাড়ী (মাটি) ;

অনেক সময়ে কাব্যে ষষ্ঠী বিভক্তির 'র' এর উত্তর 'এ' যুক্ত হয়।

সোনার লাঙল, উপারে (রূপা) ফাল ; এলুয়া কাশিয়ারে ফুল নদী হইচে কানাই হুলাস্থল ; হাতত দিলেক হাতেরে বান্দন ; মধুরে না ভরোতেরে ডালো না ভাঙ্গিয়া পরে ; মরিয়া কোলারে স্বামী, চিতুল বয়সে হনু আরি ; না বাজান মইষাল তোমার খুটারে দোতোরা ;

দ্বিতীয় বিভক্তিতে যেমন একই সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনামের সঙ্গে 'ক' যুক্ত হয়, ষষ্ঠী বিভক্তিতে তেমনি একই সঙ্গে বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনামের সঙ্গে 'র' ব্যবহৃত হয়, যথা ঃ

এ্যালা সেনে বুঝিম রে তোর বাউদিয়ার মন ; মোর নারীর ট্যারিয়া শিতা, মোর ঢ্যানাটার কপাল পোড়া।

এই উপভাষায় অধিকরণে সাধারণতঃ ত্, ওত্ ব্যবহৃত হয়। যথা ঃ

কপালত্ (কপালে), জ্যাবত্ (পকেটে), গাড়ীত্ (গাড়ীতে), বাড়ীত্ (বাড়িতে), মাটিত্ (মাটিতে) ইত্যাদি।

কিন্তু কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রে এবং কখনও কখনও কাব্যে 'এ', 'য়ে' ব্যবহার দেখা যায় যথা ঃ গুয়ার গোড়ে গোড়ে নাগোয়া দিছে পানোরে ; তেতিলিরো গোড়েরে ধান চাইরটা শুকানু রে।

(৬) প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলায় ব্যবহৃত হত, অথচ সাধু ও চলিত বাংলায় এখন আর ব্যবহৃত হয় না, এমন কয়েকটি অনুসর্গকে এই উপভাষায় জীবন্ত দেখা যায় ;

যেমন ঃ মোরটে হাতে/হ্যাতে (আমার কাছ থেকে) ; হাট হাতে (হাট থেকে)। এ ধরনের অন্যান্য উপসর্গ হল—

আগত্/আগে—মোর ঢ্যানাটার দুক্কের (দুঃখের) কতা তোরে আগত্ কওঁ।

আড়/আড়া—বাঁশের আড়ে আড়ে। কলার আড়ায় আড়ায় ;

আবান—তুই আবানে (তুই বিনা) ;

কাইন্টা (উপকণ্ঠ)—বাড়ীর কাইণ্টাত (বাড়ীর ধারে), জমিনের কইণ্টাত (জমির ধারে, কোণে)

গোড়—কলার গোড়ে গোড়ে

টে, ঠে—উয়ারটে, মোরটে, বাবার টে, (তার কাছে, আমার কাছে, বাবার কাছে ইত্যাদি)

থাকি—কত্‌খান থাকি ড্যাকেবার নাগছি (কতক্ষণ থেকে ডাকছি)

তানে—আম-কাটোল খাবার তানে বাড়াইলো পীরিত ;

তি-ত্তি-ঠে (স্থান)—কুত্তি (কোথায়), হিত্তি (এইদিকে), ওত্তি (ঐদিকে), কোন্‌ঠে (কোথায়)

তে/থেকে—ভালো তে ভাল আছে দ্যাশ ঘুরিলে দ্যাখা যায়।

নগত (লগ্ন/সঙ্গে)—ফাকসুর নগত কায়োয় না পারিবে ;

নাগি, নাগিয়া < জন্যে—কনেকো (খানেকো) দয়া নাই তোর মাহুতক্‌ নাগিয়া রে।

(ফারসী) বগল—গাও হাকাইবে বগলত্‌ বসিয়া (পাশে বসে পাখায় হাওয়া করবে)।

(আরবী) বদল—নদীরো বদলেরে বাড়ীতে ধোন গাওরে ;

ভিতি < দিকে—ব্যালার ভিতি চায়যা দ্যাখো (সূর্যের/সময়ের দিকে চেয়ে দেখ)

(৭) কাব্য ও কথ্য ভাষা-দু'দিক থেকেই গুণবাচক বা অবস্থাবাচক কিছু বিশেষণ লক্ষ্য করা যায়।

স্থান বা বাড়ী সংক্রান্ত ঃ নিধুয়া পাতার (বিস্তীর্ণ জনমানবশূন্য প্রান্তর) ; ফুল বিন্দাবন (সুন্দর বৃন্দাবন) ; নাল বাজারের চ্যাঙরা বন্ধু (প্রেমে জীবনকে রঙীন করে এমন প্রেমিক)।

নদী ও ঘাট সংক্রান্ত ঃ উজান নদী, ক্ষীরল নদী, চিরল নদী, হীরা নদী, তুফান-দরিয়া, আগইম দরিয়া ইত্যাদি।

গাছ-পালা-ফুল-ফল সংক্রান্ত ঃ খেইলকদম, হেলানী-কদম, হেকেরা ডালিম, শাল্মলী-শিমিলা, অখুটা-শিমিলা, চন্দন-বৃক্ষ, তরলা বাঁশ, বিরু বাঁশ, জোড় শিমলা ইত্যাদি।

বস্ত্র-অলঙ্কারাদি দ্রব্য সংক্রান্ত ঃ কাউয়া রঙী শাড়ী, গহুর রঙী শাড়ী, লক্ষ্মীবিলাসী শাড়ী, সরু শাঙ্কা, ঢালুয়া খোঁপা, টেরিয়া খোঁপা, হ্যাদেল-দ্যাল খোঁপা, নাসের খোঁপা, উনিঝুনি খোঁপা, গুঞ্জরি ভোমরা খোঁপা, হীরামন বাঁশি, ছিরি আংটি, শ্যামলাই ধুতি, শ্যামলাই গামছা, মনিরাজ পাগড়ি, হেমতালের লাঠি, নাসের কাকোই, অঙ্গিয়া ছাতি।

নিসর্গ জগৎ সংক্রান্ত ঃ মলেয়া বাও/মলেয়ায় তলায় বাও (মলয় বাতাস), পুবাল বাতাস, পছিয়া বাও, শুন দুপুর/শুন দুপর, নিশিপহর, কালা ম্যাঘা, নদীর বসন্তকাল, রিমিঝিমি ঝরি, চিকন বালা, ধই ধই বালা,

ইতর প্রাণী সংক্রান্ত ঃ শ্বেত কাউয়া, জল-শুয়া, কাজল-ভোমরা, গুঞ্জরি ভোমরা, চন্দন-কুরশা,

বিবিধ বস্ত্র সংক্রান্ত ঃ নিদারুণ কতা, কাঞ্চা সোনা, ধিকি ধিকি আগুন, নবীন বাটার পান, কামরাঙার পাটি, আঞ্চলের সোনা,

মানব দেহ ও মন সংক্রান্ত ঃ চিতুল বস (যৌবন কাল), কটুর হিয়া, চিক্কিৎ হাসি, মিষ্টি কতা, অশের/রসের গালা, কোঁকড়া চুল, মটুক চুল, মনশুয়া, চ্যাংরা কাল, নিদান কাল, চিকন কালা, নৌতন চ্যাংরি, নয়া নওদারী, বাবুরি ছাঁটা, দারুনো বিধি, সোন্দা জল, ধাগেড়া (কামুক ব্যক্তি), ধাগিড়ী (কামুক স্ত্রীলোক), গালার কাটি, কোলার মাইয়া (আদরের স্ত্রী), সোনার যৈবন ... ইত্যাদি।

(৮) কাব্যরূপের একটা বড় বৈশিষ্ট্য অব্যয়ের ব্যাপক ও বিচিত্র প্রয়োগ ঃ

সুরের প্রয়োজনে—আজি, এ, ঐনা, এইনা, ওই, ও, অকি, ওকি, মরিবে, ও মরি, কি ও হোরে, কিবা, গে, না, ভালা, রে, কি ওহো, আরো কিন্তুক, নাতেন কি, না ক্যানে ইত্যাদি।

(৯) কাব্যে প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরকে বিচিত্র নাম ধরে সম্বোধনের বিশেষত্ব ঃ

অসের ঢ্যানা, কবিরাজ, কালা,গাবুরা, গুণের বন্ধুয়া, চিকন কালা, চ্যাংরা বন্ধু, পতিধন, প্রাণো কলা, প্রাণপতি, প্রাণের শুয়া, পরাণের নাম, বইদো, বাউদিয়া, বাপোই, বাপোই চ্যাংরা, ভাবের বন্ধু, সোনারে বন্ধু, সোয়ামী ধন ইত্যাদি,

জাতি ও পেশার উল্লেখ করেও সম্বোধন মেলে—

সিপাই, পাইকার, বানিয়া, তেওয়ারি,পছিমা বন্ধু ইত্যাদি

প্রেমিকাকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে পাই

কইন্যা, কইনা, চ্যাংরি, মাই, সুন্দরী ... ইত্যাদি

(১০) এই উপভাষায় কাব্যে ব্যবহৃত কিছু গালি গালাজের ব্যবহার ও বিশিষ্ট অর্থে কিছু শব্দের প্রয়োগ ঃ

কমবক্তা → অপদার্থ (স্ত্রীং কমবক্তি)

কাঙ্গাভাঙ্গা → কাঁধ ভাঙ্গা যার,

খালাই পেটী → মাছ রাখার বাঁশ নির্মিত লম্বা পাত্রের (খোলের মতো) মত পেট যার,

গাবুর মরা → যৌবন কালেই যে পুরুষ মরেছে,

ছাইপড়া → মুখে বা দেহে ছাই পড়েছে যায়,

জরমঠেঙ্গুয়া → আজন্ম খোঁড়া,

জারুয়া গোলাম → জারজ গোলাম,

ঝালাপড়ী → অতিমাত্রায় কথা বলে অপরের কান ঝালাপালা করে যে,

দো-ভাতারির বেটা/বেটি → যে পুরুষ বা নারীর মায়ের দু'জন ভাতার বা স্বামী তার বেটা/বেটি,

দশাপড়া → দুঃখ দুর্দশায় পড়েছে যে পুরুষ,

নাঙ্-ভাতারি → উপপতিতে আসক্তা নারী,

পানীয়া মড়া → রুগ্নতা ও অসুস্থতার জন্য যে পুরুষের দেহে পানী বা জল লেগে গেছে,

বাবুরি ছাঁটা → বাবরি করে যে পুরুষের চুল ছাঁটা,

ভাতার-জাঁকালি → স্বামীকে নিয়ে জাঁক বা গর্ব করে যে রমণী,

ভাতার শুয়াতি → স্বামীর আদরের স্ত্রী যে,

ভাতার খাকি → স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী যে

হাবাংমুখী → হাভাতে

সাত-ভাতারি → সাতজন স্বামী যার অর্থাৎ দুশ্চরিত্রা।

বিশিষ্ট অর্থে শব্দের প্রয়োগ ঃ

বসন্তকাল → যৌবনকাল, নিদান-বিপদের দিন, চিকন-সুন্দর ;

দুই যৈবন → দুই স্তন, নিধুয়া পাথার → জনমানবশূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর ;

হালুয়া → যে হাল বয় কিন্তু অনেক সময়ে 'স্বামী' অর্থে ব্যবহৃত।

অকুমারী → কুমারী ; গুণ → অপগুণ, যথা → তোর জ্যামন গুণ, আন্দা শাকত দিলু নুন ;

ভক্তি → শ্রদ্ধা অর্থে কিন্তু অধিকাংশ সময়ে 'পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করা' অর্থে ব্যবহৃত।

নারী → অধিকাংশ সময়ে বধু অর্থে ;

নাইওর → বিবাহিতা নারীর পিত্রালয় গমন ;

দেবী → দুর্গাদেবীকেই বোঝায় ;

ঘর → অধিকাংশ সময়েই বাড়ি অর্থে ;

শাক → যে কোন ব্যঞ্জন ;

সরু → সুন্দর অর্থে ;

মানত-মানা → মনস্কামনা পূরণার্থে প্রার্থনা ;

নওদারী → বউ ;

নৌতন → অল্পবয়সের ; যথা—নৌতন চ্যাংরি, নৌতন পীরিতি।

বাউদিয়া → কখনও অবৈধ প্রেমিক অর্থে, কিন্তু অধিকাংশ সময়ে অকর্মণ্য, বেকার প্রেমিক পুরুষ হিসেবে।

গুয়াকাটা → বিবাহ স্থির করা (পান সুপারির অনুষ্ঠান) ;

ব্যাচে খাওয়া → বিবাহ দেওয়া ;

দ্যাও ধরা → দেবতার ভর করা ;

(১১) প্রত্যেক দেশের কবিতার ভাষার একটি অনুবাদ ও পরিবেশ থাকে। এই অঞ্চলের লোক কাব্যের ভাষাগত পরিবেশে দেখা যায় কয়েকটি নদী যথা ঃ— তিস্তা, তোরসা, ধরলা, মানসাই, গঙ্গাধর প্রভৃতি ; কিছু ইতর প্রাণীর নাম—কোরা, বগা, তোতা, ময়না, শুয়া, বগেন্দ, বালুটিটি প্রভৃতি ; কয়েকটি তরুলতার নাম—বটবৃক্ষ, পাকুড়ি, কাশিয়া, এলুয়া, মানা (মানকচ) প্রভৃতি।

বাংলার অন্যান্য লোকসংগীতের মতো উত্তরবঙ্গের লোকসংগীতেও সুরের সঙ্গে কথার একটা নিবিড় সমঝোতা আছে। এজন্য কথার ভাব সুরের ধ্বনিত রসের মধ্য দিয়ে ভিন্নতর ভাষিক মাত্রা লাভ করে। গানের কথারূপের মধ্যে যে আবেগ নিহিত থাকে সুর সেটাকেই শ্রোতার মনের মধ্যে সঞ্চার করে দেয়। কখনো কখনো শ্রোতার মনের মধ্যে সঞ্চার করার চেয়েও বড় হয়ে ওঠে মন থেকে আবেগকে মুক্তি দেওয়ার একতরফা চেষ্টা। ড. নির্মল দাশের কথায়—'এ ক্ষেত্রে গানের কথার মধ্যে যে-সব ধ্বনির উপকরণ আছে, বিশেষত স্বরধ্বনির উপকরণ, সুর সেই উপকরণগুলিকেই অবলম্বন/বিলম্বন/প্রলম্বনের মধ্য দিয়ে শ্রুতিগ্রাহ্য করে তোলে। তার ফলে একটা আবেগময় ধ্বনিমণ্ডল গড়ে ওঠে। এই ধ্বনিমণ্ডল সৃষ্টিই হচ্ছে ভাওয়াইয়ার বাঙ্ময় অনুশীলন, যাকে এক অর্থে সাঙ্গীতিক বিভাষা (sub-dialect) বলে চিহ্নিত করা যেতে পারে। সুতরাং ভাওয়াইয়ার ভাষাতাত্ত্বিক পরিচয় হচ্ছে, এই গান কামরূপী ভাষার সাঙ্গীতিক বিভাষা।'

(১২) গানধর্ম পদ্য ধর্ম-এর দিক থেকে লক্ষ্য করা যায় যে উত্তরবঙ্গের লোক-সংগীতের বাণীরূপে গানধর্ম পালিত হলেও পদ্যধর্ম সর্বত্র সর্বদা পালিত হয় নি। কোথাও কোথাও ছান্দসিক শর্ত নিপুণভাবে পালিত হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় ছন্দের নিয়মকানুনের দিকে গীতিকারের সযত্ন দৃষ্টি নেই ; মধ্য বা অন্ত্য অনুপ্রাস যদি ঘটেও থাকে তাতে কোনও ছান্দসিক তৎপরতা নেই। আবাসউদ্দীনের বিখ্যাত গান একটি বড় উদাহরণ—

ওকি গাড়িয়াল ভাই, কতোয় রব আমি পন্থের দিকে চায়া রে ॥
যেদিন গাড়িয়াল উজান যায়, নারীর মন মোর ঝুরিয়া রয় রে ;
ওকি গাড়িয়াল ভাই হাকাও গাড়ি তুই চিলমারির বন্দরে রে ॥

উত্তরবঙ্গের লোকসংগীতের সাঙ্গীতিক রূপায়ণের ক্ষেত্রে তাই সুরের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত এবং সুরের প্রকৃতিই শেষ পর্যন্ত লোকসংগীতের শব্দমণ্ডলকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, অর্থাৎ সেই সব শব্দই প্রাধান্য পেয়েছে যাতে সুর বিন্যাসের সাপেক্ষতা বেশি।

জাগ গানের স্বরলিপি—১

| -া -া গ গ | প প প প | ম ম প প | গ ম গ গ | র র র স | স স স স |
| ০ ০ অ কি | ফা ০ গু ন | মা ০ সে ব | তি ০ গু ণ | বে ০ ০ স্থা | লা ০ ০ ০ |

| -া -া গ গ | ম ম প প | প প প প | প প ধ ধ | ধ ধ প প | গ ম ম ম | প প প প | ম ম ম ম |
| ০ ০ ও রে | চৈ ০ ত্র ০ | বৈ ০ শা খ | এ ই দু ই | মা ০ সে ০ | শ রী ০ ল | হ ই ল কা | লা ০ ০ ০ |

| ম ম ম ম | ম ম ণ্ ণ্ | ণ্ স স স | স স স স | গ গ গ গ | গ গ প প | ম ম প প | গ গ ম গ |
| ০ ০ ০ ০ | ০ ০ জ্যৈ ষ্ঠ | মা সে ০ ব | মি ০ ষ্ট ০ | ফ ০ ল ০ | শ্যা ০ মা স | বা ০ ড়ি ০ | আ ০ না ০ |

| র র স স | স স স স | -া -া -া -া | -া -া -া -া | -া গ গ গ | ম প প প | প ধ প ম | গ গ গ গ |
| র স কা ০ | টো ০ ০ ল | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ভা লো রে | এ এ এ এ | এ এ এ এ | এ এ এ এ |

| প প প প | ম ম প প | গ গ ম ম | ম ম ম প | ম ম ম গ | গ গ র র | স স স স |
| রা ০ ম ০ | বা ০ ম ০ | রা ০ ম ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | হ ০ রি ০ | হে ০ ০ ০ |

| স স স স | ম ম প প | ম ম গ গ | প ধ ণ ণ | ণ ণ ধ ধ | ধ ধ প ধ | প প প প |
| ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ভা ০ লো ০ | বে ০ ০ ০ | ০ ০ আ বে | রা ০ ম ০ |

| প প প প | প প প প | প ম ম ম | -া -া -া -া | ম ম স র | ম ম ম ম | গ গ ম ম | ম গ গ র | র গ গ গ |
| না ০ রা ০ | য ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ণ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ বা ম | ভ ০ জি ০ | লে ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ |

| গ গ র র | স স স স | প প প প | ণ ণ ণ র্স | ণ ণ ধ ধ | প প প | -া -া -া -া | -া -া গ গ | প প প প |
| হ ০ বে ০ | হে ০ ০ ০ | আ ০ রে ০ | দু ০ স্ ক | নি ০ বা ০ | র ০ ০ ণ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ অ কি | ফা ০ গু ন |

| ্গ গ ম | প প প | প ণ ণ | ধ প প | ম গ গ | প প প | ম প প | গ গ গ | র ম ম | গ গ গ | গ গ গ |
| ০ বু ড়া | ক ০ ০ | ০ ০ য় | বু ড়ি ০ | রে ০ ০ | ছো ০ ট | বৌ এ র | মু খে ০ | তে হা ০ | সি ০ ০ | ০ ০ ০ |

| গ গ গ | গ গ গ | গ গ গ | ম প প | প প প | প প প | প ধ ধ | ধ ধ ধ | প ধ ধ | প ম ম |
| ০ ০ ০ | ০ ০ ০ | ও রে ০ | ক পা ০ | লো ত্ সেন্ | দু রে র | ফো টা ০ | বো চা ০ | না ক ত্ | নো লো ০ |

| গ গ গ | গ ম ম | প ণ ণ | ধ প প | ম প প | গ গ গ | র র ম | গ গ গ | গ গ গ | গ গ গ |
| তো ০ র | ও ০ ০ | রে ০ ০ | উ চা ০ | দাঁ ত ত্ | না গা ই | চে ০ নি | শি ০ ০ | ০ ০ ০ | ০ ০ ০ |

| গ গ গ | গ্‌ গ গ | ম ম ম | প প প | ধ ণ ণ | ধ ধ ধ | প ধ ধ | প প প | গ ম ম | প প প |
| এ ই যে | পী রি ত | র ত ন | পী রি ত | য ত ন | পী রি ত | গা লা র | হা ০ র | বু ড়া ০ | ক ০ ০ |

| প ণ ণ | ধ প প | ম গ গ | প প প | ম প প | গ গ গ | র ম ম | গ গ গ |
| ০ ০ য় | বু ড়ি ০ | রে ০ ০ | ছো ০ ট | বৌ এ র | মু খো ০ | তে হা ০ | সি ০ ০ |

[পরের অন্তরা একই সুরে]

জাগ গানের স্বরলিপি—২

স স	র র র র	র ম গ গ	র র গ গ	র র র র	ম ম ম ম	গ র গ গ	স র র গ	গ গ গ গ
আ জি	দে ০ ০ ০	ব ০ ০ ০	দে ০ ০ ০	ব ০ ০ ০	কা ০ ০ ০	ম ০ ০ ০	দে ০ ০ ব	০ ০ ০ ০

গ গ র র	স স স স	-া -া -া -া	-া -া ম প	প গ ম ম	ম প ধ প	ধ ধ ধ ᵍধ	ধ প প ধ
০ ০ ০ ০	০ হে ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ দে ব	০ দে ব ০	০ কা ম ০	দে ব হে ০	০ ০ ঠা কু

প প ম প	প ণ ধ ণ	প প প প	প প প প	প ণ ধ প	প প ধ ণধ	প ধ প ম
র ম দ ন	কা ০ ০ ০	০ ০ ম ০	০ ০ ভ ক্তি	ভ ০ রে ০	০ যে জন	পু ০ জে ০

ম ম ম ম	ম ম ম ম	ম ম ᵍম গ	গ র স স	র র গম মগ	র -া -া -া	-া -া স স	র র র র	র ম গ গ
০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ পু রা	য় ম ন স	কা ০ ০ ম	হে ০ ০ ০	০ ০ আ জি	দে ০ ০ ০	ব ০ ০ ০

[পরের অন্তরাগুলি একই সুরে]

স স র র	র র র ম	ম ম গ গ	র গ র স	স র র র	ম গ গ গ	গ গ গ গ
রা ম রে ০	রা ০ ০ ম	০ রে হ ০	রি ০ ০ ০	রাম সে না ০	রা ০ য় ০	০ ০ ০ ০

র র র র	প প প ধ	-া প -া ম	-া ম গ -া	র গ র স	স র ম ম	গ র র র
০ ০ ণ ০	এই বার মো রে	০ ০ ০ ক	০ রো দ ০	য়া ০ ০ ০	ঠা কুর ম ০	দ ন কা ০

গ গ গ র	র র র স	-া -া -া -া	-া -া -া -া	র র র র	র ম গ গ
০ ০ ০ ০	ম ০ ০ হে	০ ০ ০ ০	০ ০ আ জি	দে ০ ০ ০	ব ০ ০ ০

জাগ গানের স্বরলিপি—৩

মা -া -া -া	প -া ণ ধা	প ম -া -া	মা -া -া -া	প প প -া	প -া -া ণ	ধ প -া -া
রা ম রে ০	রা ম রে ০	হ রি হে ০	রা ম সে ০	না রা য় ০	০ ০ ০ ণ	০ ০ ০ ০
প -া ণ -া	ধ প -া ম	ম গ স র	-া ম -া -া	-া -া -া -া	-া -া গ র	
এ ই বা র	মো রে ০ ০	ক রো ০ দ	যা হে ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ ঐ না	
ম -া গ ম	র গ র -া	স -া -া -া	-া -া প প	ণ -া র্স র্স	ণ -া ধ -া	
ঠা ০ কু র	ম ০ দ ন	কা ০ ০ ম	০ ০ আ রে	ঠা ০ কু র	ম ০ দ ন	
পা -া -া -া	-া ম প মগ	-া গ -া ম	প -া ধ প	ম প -া -া	-া ম -া -া	
কা ০ ০ ম	০ ডা ই কে	০ গ ঙ্ গা	গ ঙ্ গা ০	ব লে ০ ০	০ ও রে ০	
ম প ধ প	প -া প ধপম	প -া ম গ	র গ -া -া	-া গ -া -া	ম -া মপ ম	
নি দা ০ ন	কা ০ লে ০	গ ০ ঙ্ গা	মা তা ০ ০	ও মা তা ০	ব ই লেনকার কা	
গ -া -া -া	-া -া গ ম	প ধণ -া ধ	প -া -া ম	প প ম প		
ছে ০ ০ ০	০ ০ ভা লো	বে০ ০ ০	০ ০ ০ ০	আয় মোর হরি		
গ ম -া প	-া ম গ -া	ম র -া -া	স -া -া -া	ম প ম -া	-া -া গ -া	
আ য় মো ০	০ ০ র ০	০ হ রি ০	হে ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	

-া -া প -া	ণ -া র্স ণ	ধ প -া -া	-া গ ম -া	প -া -া -া	প -া -া -া
০ ০ আ রে	মো ব মি ল	নে আ য ০	০ জা গে র	দ ০ ০ ল	আ ০ মা র
ণ -া -া র্স	ণ ধ -া -া	প -া -া প	ম -া প -া	-া -া ম প	ম ০ গ ০
বা ন ০ দি	হ ইল ঠ ০	ক ০ ০ ন	দ ০ লে ০	০ মা নু ষ	মে ০ লে ০
র -া -া -া	র -া -া -া	-া ০ ম -া	ম -া গ -া	র -া গ -া	র -া স -া
না ০ ০ ০	আ ০ ০ হে	০ ০ মু ল	বা ০ ই ন	পা ০ লি ০	আ ০ মা ব
-া -া স প	ম গ -া -া	র -া -া -া			
০ ০ স রে	এ ক ধা ০	রা ০ ০ ০			
-া -া ধ -া	ধ -া প -া	ধা -া র্স ণ	ধ -া -া -া	র্স ণ -া -া	ণ -া র্স -া
০ ০ দো য়া	বি র না ই	ভ ং গি ০	মা ০ ০ ০	ডা ই না ০	চ্যা ং রা ০
ণ ধ -া -া	প -া -া -া	-া -া পধ প	ম পম ম -া	ম -া গ -া	র -া গ -া
ক ম্ ব ক	তা ০ ০ ০	০ ০ হায় রে	০ ০ ডাই না	পা লি দে খে	ভু ন্দি বিলা ইর
র -া স -া	-া -া প ম	গ র -া -া			
ম ০ তো ০	০ ০ জুলজুল করি	য়া ০ ০ ০			

[এই অংশ তাল ছাড়া টানা সুরে]

[প প -া ধণ ধ ধ ধণ ধণ ...... ধণ ধণ ধ -া -া -া]
[হির্ দ্যাখ্, ধাম্ ধামা ধাম্ .... ধা ...... ম্]

[এই অংশ আবৃত্তির ঢঙে]

-া স -া -া	স র ম -া	ম গ -া -া	র গ র স	স -া -া -া	-া -া প -া
০ এইযে ০	প্র থ মে উ	ঠি য়া ০ ০	০ ০ নি লাম	হে ০ ০ ০	০ ০ ঐ না
	ণ ০ র্স ণ	ধ -া প -া	প -া -া -া	গ ম -া -া	প -া -া -া
	ম ০ দ ন	কা ০ মে র	না ০ ০ ম	জা গে র ০	দ ০ ল ০

[পরবর্তী অংশ একই সুর]

-া প -া -া	-া -া প ণ	ধ প -া -া	ম -া -া -া	গ র গ রস
০ হা য় রে	০ ০ গা জা	কো টে ০ ০	ভা ০ ০ ঙ্	বু ০ ড়া ০
স স র -া	ম -া -া -া	প ম -া -া	-া -া -া -া	
০ চা লি ত্	ব ০ সি ০	য়া ০ ০ c	০ ০ ০ ০	
-া -া গ -া	র স -া -া	র ম গ -া	গ -া র -া	
০ ০ আ গ	ত্ মু ই ০	গা ন্ জা ০	খা ০ ই ম্	
র -া -া -া	-া -া -া -া	ম -া -া -া	গ র গ -া	
০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০	পা ০ ছ ত্	এ ক টা ০	

| ম -া গ -া | র গ -া -া | র -া -া -া | স -া -া -া |
| আ চ্ ছ ০ | খা ও য়া ০ | দে ০ ০ ০ | ০ ০ ন ০ |

| স -া | র -া -া | র গ -া | ম প -া | ধ -া -া | ধ ণ ধ |
| এই যে | রা ম ০ | রে রা ০ | ম বে ০ | হ রি ০ | রা ম সে |

| ণ ধ -া | ধ -া -া | -া -া -া | ধ ণ ধ | ধ ণ ধ |
| না রা ০ | য় ০ ০ | ণ ০ ০ | এই বা র | মো রে ০ |

| ধ র্স ণ | ণ ধ -া | ধ র্স -া | ণ ধ -া | ধ -া -া |
| ক রো ০ | দ য়া ০ | ঠা কু র | ম দ ন | কা ০ ম |

| ধ ণ ষ | -া -া -া |
| ও হে ০ | ০ ০ ০ |

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

কোচবিহারের ইতিহাস—খাঁ চৌধুরী আমানতুল্ল্যা

উত্তরবঙ্গের ইতিহাস—সুকুমার দাস

কামতা রাজ্যে পৌন্ড্র ক্ষত্রিয়—পতিরাম সিংহ

The Rajbanshis of North Bengal—Charu Chandra Sanyal.

Linguistic Survey of India—G. A. Grierson.

প্রান্ত উত্তরবঙ্গের উপভাষা—নির্মলেন্দু ভৌমিক

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের কথ্যভাষা—সত্যেন্দ্র নাথ বর্মন (অপ্রকাশিত)

A step of Kamtabihari language—Dharmanarayan Barma

উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ—নির্মলকুমার দাশ

Journal of the Asiatic Society—January, 1838.

রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস—উপেন্দ্রনাথ বর্মন

মধুপর্ণী—উত্তরবঙ্গ বিশেষ সংখ্যা

রংপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা—বিভিন্ন সংখ্যা (১৯১৩-১৯১৯).

Gender and genre in the Floklore of Middle India

—Joyee B. Flueckiger